শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

॥ ১৮১৮—১৯১৮ ॥

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯ ॥

উৎসর্গ

বাংলার শিশু-সাহিত্যে পূর্বসূরিগণ স্মরণে—

ভূমিকা

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি, বাংলার বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত একশ' এক বৎসরকালের সাহিত্য—শিশুপাঠ্য সাহিত্য। এই কালটি বাংলায় ইংরেজ আমলের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় এবং ক্রমে তার প্রসার ঘটে। শিশুশিক্ষা ও শিশু-সাহিত্যে নিবিড় সম্পর্ক। ফলে, দ্বিতীয় দশকেই বাংলার শিশু-সাহিত্যেরও গোড়া পত্তন হয়। স্বভাবতই তার ভাব ও আদর্শ ছিল ইংরেজী। পরবর্তীকালেও এই প্রভাব থেকে তা মুক্ত হতে পারে না। আলোচ্য শতাব্দীকাল ধরে বাংলার শিশু-সাহিত্য কি ভাবে গঠিত, সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়েছে, এই মহৎ কর্মে বাঙালী ও ইংরেজ মনীষিগণের কিরূপ নিষ্ঠা ও প্রযত্ন ছিল, এই গ্রন্থে সে বিষয়ই আলোচনা করে ধারাবাহিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সময়ে সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের প্রধান বাহন পত্রিকা ও গ্রন্থ। বিগত সময়েও অন্যরূপ ছিল না। আধুনিক বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি এই শতাব্দীকালের সাহিত্য। আমাদের এ কথার পক্ষে যুক্তিও এই গ্রন্থে আছে। বস্তু ও চিন্তাজগতে কোনও কিছুর উদ্ভব ঘটে সামান্য অবস্থা থেকে। সেকালের ও একালের বাঙলা শিশু-সাহিত্য পর্যালোচনা করে বিশ্বাস করা কঠিন যে, আধুনিক কালের শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রারম্ভে ছিল এমন তুচ্ছতা, এমন শ্রীহীনতা। কিন্তু বিবর্তনের রীতিই এই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই এই সাহিত্যের পূর্ণ রূপ ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। কোনও দেশের সাহিত্য যেমন সে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচায়ক, শিশু-সাহিত্যও তদ্রূপ। বস্তুত শিশু-সাহিত্য মনোজগতের কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফল নয়, সে দেশেরই জাতীয় সাহিত্যের একটি অংশমাত্র।

বাংলার প্রাচীন রূপকথা ও ছড়াগুলিকে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সমগ্র রূপকথা ও ছড়াকে শিশু-সাহিত্য বলা চলে না। প্রাচীন

রূপকথা ও ছড়া বাংলার অগাধ লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত। এই সাহিত্যের রচনা ও প্রচার হয় মুখে মুখে এবং রচয়িতাও অজ্ঞাত। এই রত্নসম্ভার থেকে শিশুচিত্তের উপযোগী কতকগুলি ছড়া ও রূপকথা সংকলন করে কোনও কোনও শিশু-সাহিত্য রচয়িতা এই সময়ের মধ্যে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে তারও আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক, এই দুই সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। প্রাচীন সাহিত্য একান্তই স্বদেশী।

উনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য অনুবাদপ্রধান। কেবল ইংরেজী নয়, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী, ফরাসী ও ফারসি থেকেও বহু রচনা বাঙলায় তর্জমা করা হয়। মৌলিক রচনাবলীরও অনেকের বিষয়বস্তু ইংরেজী থেকে সংগৃহীত, ভাবও ইংরেজী, ভাষাও ইংরেজী ঘেঁষা। শেষোক্ত রচনাগুলি প্রধানত সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে প্রকাশিত শিশু-সাহিত্যে ছিল পাঠ্যপুস্তকের নীরসতা ও গুরুতা। সাহিত্যিক রসসৃজনের পরিবর্তে সেগুলিতে শিক্ষাদানের আগ্রহ প্রকট। এই অবস্থার মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-রস পরিবেশনের কিছু ব্যবস্থা করেন। কেবল গদ্যেরই এমন অবস্থা ছিল না, কবিতাকাননও ছিল শ্রীহীন ও শূন্য। যে অল্প সংখ্যক কবিতাপুষ্প পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, সেগুলির অধিকাংশই ছিল নীতি-গন্ধী। এই সকল কারণে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশকাল শিশু-সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল—নীতি ও শিক্ষাপ্রচার।

অবশেষে ১৮৯২ খৃস্টাব্দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধানের পর বাংলার শিশু-সাহিত্যে নবযুগোদয় হয়। পত্রিকা-গ্রন্থে তার তরুণালোক প্রতিভাত হতে থাকে। এই কর্মে যিনি পথিকৃৎ তিনি পাঠ্যপুস্তকের নিগড়ের বাইরে শিশু-সাহিত্যের ধারা বইয়ে দিলেও, সাময়িক পত্রিকাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। যে গ্রন্থ-সাহায্যে মহৎ কর্মটি সাধিত হয়, সে গ্রন্থ ছিল নানাজনের বিবিধবিষয়ক রচনাসমৃদ্ধ। 'হাসি ও খেলা' নামক এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি শিশুমহলে সাহিত্যরস পরিবেশন ও আনন্দ দান করে। অতঃপর এর আদর্শ গ্রহণ না করলেও নানাজনের গল্প, উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা, ছড়া ও নাটকাদি প্রকাশিত হয়ে শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। এগুলির কতক শাশ্বতসৃষ্টি। আলোচ্য শতাব্দীকাল মধ্যে বালক-বালিকাপাঠ্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ও আমাদের জ্ঞাত সকল সাময়িক পত্রিকা এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু শিশু-সাহিত্যের সংজ্ঞায় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকায় অশেষ বিতর্ক সৃষ্টি ও সময়ে সময়ে অশোভন মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকেই শিশু-সাহিত্য বলার পক্ষে। আবার, এদের মধ্যে বয়স বিভাগ করে এই সাহিত্যেও কেউ কেউ শ্রেণী-বিভাগের পক্ষপাতী। এ ক্ষেত্রে আমাদের কথা এই যে, যে শিশুর অক্ষরপরিচয় ঘটেছে এবং নিজেই সহজগ্রন্থ পাঠে সক্ষম, আর যে শিশু অক্ষরপরিচয়ের নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছয় নি, যার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটে, এই দুই প্রকার শিশুর সাহিত্যকে বিভক্ত করলে ভুল হয় এমন কথা বলা যায় না। কারণ, উভয়ের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিতে তারতম্য থাকারই কথা। অপর দিকে, আট নয় বৎসর ও চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিতে পার্থক্যও অনেক। সেজন্য এদের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকে সমপর্যায়ভুক্ত করার মধ্যেও সঙ্গতি থাকে না। এ কারণ, চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্যকে কেউ কেউ কিশোরসাহিত্য বলেন। বস্তুত এই বয়সের পাঠক-পাঠিকা ন্যূনবয়স্ক বালক-বালিকাগণের মতো রূপকথা, ছড়া ও জীবজগতের গল্পে তৃপ্ত হয় না। অথচ পরিণতমন পাঠকগণোদ্দেশ্যে রচিত উপন্যাস, গল্প-কবিতাদির যথোচিত রসগ্রহণেও এরা অক্ষম। এই সকল কারণে বালক-বালিকাগণের জন্য রচিত তাবৎ সাহিত্যেই আমরা শ্রেণী-বিভাগের পক্ষে নই।

প্রাচীন বাংলার রূপকথা ও ছড়ার উদ্ভব-প্রসার লোকমুখে। সেকালে এই সাহিত্যের শ্রোতা ছিল, পাঠক ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আমলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শিশু-সাহিত্য লিখিত, গ্রন্থে পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। ফলে পাঠকমহল সৃষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থে বিগত শতাব্দীকালে বাংলার লিখিত শিশু-সাহিত্যেরই উদ্ভব ও বিবর্তনধারা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি। এই সময়ের পরবর্তীকালের সাহিত্য আমাদের আলোচ্য নয়। তা ভবিষ্যৎ কর্মীর অপেক্ষায় আছে।

প্রসঙ্গত এখানে 'শিশু-সাহিত্যিক' শব্দটির উল্লেখ না করে থাকা যায় না। শব্দটির ব্যাকরণসম্মত অর্থ কি? যিনি শিশুগণের জন্য সাহিত্য রচনা করেন তাঁকেই বলা যায় কি? তাহলে যিনি সাবালকগণের জন্য সাহিত্য রচনা করে থাকেন তাঁকে কি বলবো? শিশু-সাহিত্যিক শব্দটির

রূপকথা ও ছড়া বাংলার অগাধ লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত। এই সাহিত্যের রচনা ও প্রচার হয় মুখে মুখে এবং রচয়িতাও অজ্ঞাত। এই রত্নসম্ভার থেকে শিশুচিত্তের উপযোগী কতকগুলি ছড়া ও রূপকথা সংকলন করে কোনও কোনও শিশু-সাহিত্য রচয়িতা এই সময়ের মধ্যে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে তারও আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক, এই দুই সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। প্রাচীন সাহিত্য একান্তই স্বদেশী।

উনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য অনুবাদপ্রধান। কেবল ইংরেজী নয়, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী, ফরাসী ও ফারসি থেকেও বহু রচনা বাঙলায় তর্জমা করা হয়। মৌলিক রচনাবলীরও অনেকের বিষয়বস্তু ইংরেজী থেকে সংগৃহীত, ভাবও ইংরেজী, ভাষাও ইংরেজী ঘেঁষা। শেষোক্ত রচনাগুলি প্রধানত সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে প্রকাশিত শিশু-সাহিত্যে ছিল পাঠ্যপুস্তকের নীরসতা ও গুরুতা। সাহিত্যিক রসসৃজনের পরিবর্তে সেগুলিতে শিক্ষাদানের আগ্রহ প্রকট। এই অবস্থার মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-রস পরিবেশনের কিছু ব্যবস্থা করেন। কেবল গদ্যেরই এমন অবস্থা ছিল না, কবিতাকাননও ছিল শ্রীহীন ও শূন্য। যে অল্প সংখ্যক কবিতাপুষ্প পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, সেগুলির অধিকাংশই ছিল নীতি-গন্ধী। এই সকল কারণে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশকাল শিশু-সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল—নীতি ও শিক্ষাপ্রচার।

অবশেষে ১৮৯২ খৃস্টাব্দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধানের পর বাংলার শিশু-সাহিত্যে নবযুগোদয় হয়। পত্রিকা-গ্রন্থে তার তরুণালোক প্রতিভাত হতে থাকে। এই কর্মে যিনি পথিকৃৎ তিনি পাঠ্যপুস্তকের নিগড়ের বাইরে শিশু-সাহিত্যের ধারা বইয়ে দিলেও, সাময়িক পত্রিকাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। যে গ্রন্থ-সাহায্যে মহৎ কর্মটি সাধিত হয়, সে গ্রন্থ ছিল নানাজনের বিবিধবিষয়ক রচনাসমৃদ্ধ। 'হাসি ও খেলা' নামক এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি শিশুমহলে সাহিত্যরস পরিবেশন ও আনন্দ দান করে। অতঃপর এর আদর্শ গ্রহণ না করলেও নানাজনের গল্প, উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা, ছড়া ও নাটকাদি প্রকাশিত হয়ে শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। এগুলির কতক শাশ্বতসৃষ্টি। আলোচ্য শতাব্দীকাল মধ্যে বালক-বালিকাপাঠ্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ও আমাদের জ্ঞাত সকল সাময়িক পত্রিকা এই গ্রন্থের আলোচনার বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু শিশু-সাহিত্যের সংজ্ঞায় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকায় অশেষ বিতর্ক সৃষ্টি ও সময়ে সময়ে অশোভন মন্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকেই শিশু-সাহিত্য বলার পক্ষে। আবার, এদের মধ্যে বয়স বিভাগ করে এই সাহিত্যেও কেউ কেউ শ্রেণী-বিভাগের পক্ষপাতী। এ ক্ষেত্রে আমাদের কথা এই যে, যে শিশুর অক্ষরপরিচয় ঘটেছে এবং নিজেই সহজগ্রন্থ পাঠে সক্ষম, আর যে শিশু অক্ষরপরিচয়ের নির্দিষ্ট বয়সে পৌছয় নি, যার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটে, এই দুই প্রকার শিশুর সাহিত্যকে বিভক্ত করলে ভুল হয় এমন কথা বলা যায় না। কারণ, উভয়ের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিতে তারতম্য থাকারই কথা। অপর দিকে, আট নয় বৎসর ও চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিতে পার্থক্যও অনেক। সেজন্য এদের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যকে সমপর্যায়ভুক্ত করার মধ্যেও সঙ্গতি থাকে না। এ কারণ, চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্যকে কেউ কেউ কিশোরসাহিত্য বলেন। বস্তুত এই বয়সের পাঠক-পাঠিকা ন্যূনবয়স্ক বালক-বালিকাগণের মতো রূপকথা, ছড়া ও জীবজগতের গল্পে তৃপ্ত হয় না। অথচ পরিণতমন পাঠকগণোদ্দেশ্যে রচিত উপন্যাস, গল্প-কবিতাদির যথোচিত রসগ্রহণেও এরা অক্ষম। এই সকল কারণে বালক-বালিকাগণের জন্য রচিত তাবৎ সাহিত্যেই আমরা শ্রেণী-বিভাগের পক্ষে নই।

প্রাচীন বাংলার রূপকথা ও ছড়ার উদ্ভব-প্রসার লোকমুখে। সেকালে এই সাহিত্যের শ্রোতা ছিল, পাঠক ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আমলে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শিশু-সাহিত্য লিখিত, গ্রন্থে পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। ফলে পাঠকমহল সৃষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থে বিগত শতাব্দীকালে বাংলার লিখিত শিশু-সাহিত্যেরই উদ্ভব ও বিবর্তনধারা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি। এই সময়ের পরবর্তীকালের সাহিত্য আমাদের আলোচ্য নয়। তা ভবিষ্যৎ কর্মীর অপেক্ষায় আছে।

প্রসঙ্গত এখানে 'শিশু-সাহিত্যিক' শব্দটির উল্লেখ না করে থাকা যায় না। শব্দটির ব্যাকরণসম্মত অর্থ কি? যিনি শিশুগণের জন্য সাহিত্য রচনা করেন তাঁকেই বলা যায় কি? তাহলে যিনি সাবালকগণের জন্য সাহিত্য রচনা করে থাকেন তাঁকে কি বলবো? শিশু-সাহিত্যিক শব্দটির

ব্যবহারেও সাহিত্যিকের প্রতি যথোচিত মর্যাদার অভাব ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়, যদিও বহু মহাজন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাহিত্য রচনা করে গেছেন। আর, যাঁরা কেবল এই সাহিত্য-রচনায় জীবনপাত করে গেলেন, তাঁদের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ও যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষও ছিলেন, যে গুণ অধিকাংশেই নেই। সৌভাগ্যবশত অধুনা লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় সরকারও এই সাহিত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করতে সচেষ্ট। কিন্তু পুরস্কারদানের ফলে শিশু-সাহিত্য রচয়িতামহলে যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার ঘটেছে অবস্থা দৃষ্টে তা বলা যায় না। কারণটি অনুসন্ধানযোগ্য। তবে কথা এই, সাহিত্য-সৃষ্টি প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্যকালের শিশু-সাহিত্যকে আমরা 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' ও 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গ' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছি। গ্রন্থের অতি অল্পকাল পূর্বেই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায়, প্রথমে পত্রিকার আলোচনা করা হয়েছে। পত্রিকা-প্রসঙ্গও আবার শতকানুসারে ঊনবিংশ ও বিংশ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থ-প্রসঙ্গকেও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্যানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অনাবশ্যকবোধে পাদটীকা ও উদ্ধৃতি শেষে পত্রাঙ্কাদি দিয়ে সহজ বিষয়কে জটিল করা সমীচীন মনে করি নি।

বাংলার আধুনিক শিশু-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস এই প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হোল। সেজন্য গ্রন্থখানিকে ত্রুটিশূন্য করতে পারা যায় নি। পথিকৃতের কর্ম দুরূহ। কর্মপথে আমাকে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে। 'শিশু-সাহিত্য আবার কি? এর ইতিহাসই বা কি থাকতে পারে?' এই তাচ্ছিল্য মনোভাবের ফলে বিগত শতাব্দীর ও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেরও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুগ্রন্থের নাম কেবল বৃটিশ মিউজিয়ামের ও ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকায় পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থগুলির অধিকাংশই নাগালের বাইরে। আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটিকে সাধুবাদ জানাই যে, তাঁরা অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বাংলার বালক-বালিকাপাঠ্য বহু পত্রিকা ও গ্রন্থ তাঁদের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষা করছেন। তাঁদের সহযোগিতার অভাব ঘটলে বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হোত। আশঙ্কা ছিল, বাঙলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত অংশের ইতিহাস যদি বা কোনক্রমে রচনায় সমর্থ হই, প্রকাশকের অভাবে

পাণ্ডুলিপিখানি আমার ঘরেই দিনে দিনে জীর্ণ হবে। কিন্তু বিদ্যোদয় লাইব্রেরির সুধী ও সহৃদয় কর্তৃপক্ষ আমার আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করলেন।

পাণ্ডুলিপি রচনাকালে বহু সজ্জনের উৎসাহবাক্যে শক্তি লাভ করেছি। এখানে তাঁদের সকলের নাম প্রকাশের স্থান থাকলে সুখ বোধ করতাম। তার অভাবে তাঁদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্য উপায় আমার নেই। কিন্তু যে দুজনের ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য তাঁদের নামোল্লেখ না করলে ঋণের সঙ্গে অন্যায় যুক্ত হবে। তাঁদের একজন হলেন, আমার দীর্ঘকালের সুহৃৎ ইতিহাস-বেত্তা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, অন্যজন সাংবাদিক-সাহিত্যিক স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত অরুণ রায়। শ্রীযুক্ত বাগল গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠ করে তাঁর ১৯৫৮ খৃস্টাব্দের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা'য় ইংরেজ আমলের বাংলার মৌলিক ছোটগল্পে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম অক্ষয়কীর্তি বিষয়ে আমার বক্তব্য বিদ্বজ্জন সভায় উপস্থাপিত করে আমাকে বহু মান দিয়েছেন। এই গ্রন্থের নামকরণের জন্যও তিনি দায়ী। আরও নানাভাবে তিনি আমার সহায় ছিলেন। আর, শ্রীযুক্ত রায় 'পত্রিকা-প্রসঙ্গে'র উনবিংশ শতকের অধিকাংশ ও 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গের' কিয়দংশ "স্বাধীনতা"র 'রবিবারের পাতায়' সাগ্রহে প্রকাশের ব্যবস্থা করে গ্রন্থখানির বিষয় দু'বৎসর পূর্বেই পাঠক-সাধারণে প্রচার করেন।

এখন সুধীজনের কাছে গ্রন্থখানি আদৃত হোলে আমার শ্রম সার্থক হবে এবং নিজকে কৃতার্থ মনে করবো।

কলিকাতা | **খগেন্দ্রনাথ মিত্র**

ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

॥ সূচীপত্র

পত্রিকা-প্রসঙ্গ ॥

॥ গ্রন্থ-প্রসঙ্গ ॥

বাংলার শিশু-সাহিত্য

॥ ১৮১৮—১৯১৮ ॥

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

॥ পত্রিকা-প্রসঙ্গ ॥

উনবিংশ শতাব্দী

॥ ১৮১৮ খৃঃ অঃ—১৯০০ খৃঃ অঃ ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে আজ অবধি আমাদের বাংলা দেশে শিশুপাঠ্য (বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী পাঠ্য) নানা ধরনের বাংলা সাময়িক পত্রের প্রকাশ ঘটেছে। সংখ্যায় সেগুলি পঞ্চাশের নিচে হবে না। এই সকল পত্রিকার অধিকাংশেরই জন্ম খাস কলকাতা শহর। তবে কোনও কোনটির জন্ম শহরতলী বা কোনও মফঃস্বল শহরে। প্রাপ্তবয়স্কগণের পত্রিকার মতোই শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাও মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে মাসিকের সংখ্যাই অধিক। সাপ্তাহিকের সংখ্যা অনেক কম ; পাক্ষিকের সংখ্যা আরও কম এবং দৈনিক মাত্র একখানি। কিন্তু আমরা যতটা জানি, তাদের প্রায় সকলেরই মৃত্যু ঘটেছে অতি শৈশবে। যে কয়খানি আজও জীবিত সে কয়খানির মধ্যে 'মৌচাক'কেই প্রৌঢ়া বলা যায় যদি আটত্রিশ বৎসর বয়সটাকে প্রৌঢ়ত্বের সীমাভুক্ত করতে কারও আপত্তি না থাকে। এই হিসাবে উক্ত পত্রিকাখানি আর সকল জীবিত শিশুপাঠ্য পত্রিকার অগ্রজা।

এই সকল পত্রিকা কেবল বয়স্কগণের প্রচেষ্টা ও উদ্যমে প্রকাশিত হয় নি, কোনও কোনও পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছে শিশুদেরই উদ্যম ও প্রচেষ্টায়। এটা কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীর বাঙলা শিশুপাঠ্য পত্রিকা-জগতের ঘটনা নয়, উনবিংশ শতাব্দীরও শেষার্ধের প্রথম দিকে দুটি

কিশোরের প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে একখানি শিশুপাঠ্য বাঙলা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাখানি সম্পাদনও করতেন তাঁরা দুজনে। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'বিদ্যাদর্পণ'।

১ ॥ এই বিদ্যাদর্পণের পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন কর্তৃক 'দিগ্দর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মারশ্ম্যান। পত্রিকাটির নামপৃষ্ঠায় 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' লিখিত থাকায় কেবল যুবকগণের জন্যই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হোত, এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মাত্র যুবকগণকে উপদেশদানে শিক্ষিত করার কি কারণ থাকতে পারে? সাধারণত শিশু ও কিশোরবয়স্কগণের শিক্ষার জন্য পত্রিকাস্থ বিষয়গুলির উপদেশদানের প্রয়োজন হয়। পরবর্তী সময়ে বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকাগুলিতে এবম্বিধ বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। সেজন্য 'দিগ্দর্শন'কে আমরা কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষে। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটিও ছাত্রগণের শিক্ষার উপযোগী বিবেচনা করে এর বহুখণ্ড ক্রয় ও ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করেন। এইখানিই বাংলার প্রথম কিশোরপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা বলে আমরা মনে করি।

পত্রিকাখানি সম্ভবত সচিত্র ছিল না। মুদ্রিত পাঠের মধ্যে বা পৃথকভাবে সংলগ্ন কোনও চিত্রের সন্ধান আমরা এতে পাই নি। এতে ভূগোল-বৃত্তান্ত, কৃষিকথা, প্রাণিতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভৌগোলিক আবিষ্কার-কাহিনী (কলম্বাসের) ও ইতিহাস লিখিত আছে। ভারত ও বঙ্গদেশের কথাও আছে।

তখন বাঙলা গদ্যেরও শৈশব। তবুও এই পত্রিকা বেশ সহজ ভাষায় লেখা হয়। পত্রিকাস্থ রচনার একটু নমুনা পাঠে তা বোঝা যায়। চুম্বকপাথর সম্বন্ধে বর্ণনা :

> অনুমান হয় পাঁচশত বৎসর গত হইল চুম্বকপাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে ঘষিলে সে লৌহের ঘৃষ্ট দিগ্ সর্ব্বদা উত্তর কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ভাগে থাকে।

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং কর্ম্ম হইয়াছে সেং কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমাংশ করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্

ক না

চীন দেশের মহাপ্রাচীর সম্বন্ধে লেখা আছে 'চীন দেশের মহাপ্রাচীর বিষয়ে' :

> এই প্রাচীর চীন দেশের সকল হইতে আশ্চর্য্য এবং প্রায় পৃথিবীর মধ্যেই আশ্চর্য্য, ঐ প্রাচীর দ্বারা তাতার দেশ হইতে সে দিকে চীন দেশের রক্ষা হয়।

পত্রিকাখানির দশম ভাগ থেকে 'হিন্দুস্থানের ইতিহাস' আরম্ভ। তার প্রারম্ভে লেখা আছে :

> গজনেনের বাদশাহ মহমুদ কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান জয় করা অবধি মুসলমানদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া ইংলণ্ডীয়দের রাজ্যস্থাপন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের ইতিহাস।

পুস্তকের শেষে শব্দার্থ— অভিধান— দেওয়া থাকতো।

এই পত্রিকায় সুকুমারমতি ছাত্রগণকে বিজ্ঞান ও ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এর ভাষা লক্ষ্য করবার মতো। অনেক বাক্যশেষে পূর্ণ যতিচিহ্ন নেই।

২॥ এই পত্রিকার চার বৎসর পরে ১৮২২ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বয়ং কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 'পশ্বাবলী' নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। সোসাইটি ১৮১৭ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টায় বাংলা দেশে যে শিক্ষার বিস্তার ঘটে একথা আজ আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শিশু-সাহিত্য এঁদেরই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সম্বন্ধে অন্যত্র গ্রন্থ-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

'পশ্বাবলী'কে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের পত্রের কাহিনী ইংরেজীতে সংগ্রহ করেন পাদ্রি লসন্। সেগুলিকে বাঙলায় অনুবাদ করেন ডবলু. এইচ. পীয়ারস্। লসনের মৃত্যুর পর হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলী' পরিচালন করেছিলেন। তৎপরিচালিত পশ্বাবলীকেই আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করেছি। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে।

পশ্বাবলীর প্রতি সংখ্যায় থাকতো একটি করে জন্তুর বিবরণ (বৃত্তান্ত), আর প্রথম পৃষ্ঠায় থাকতো সেই জন্তুর একটি ছবি। কাঠ-খোদাই করে তার সাহায্যে সে ছবি ছাপা হোত। এইভাবে প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংখ্যা অবধি যথাক্রমে সিংহ, ভালুক, হস্তী, গণ্ডার ও হিপোপটেমাস, ব্যাঘ্র ও বিড়ালের বিবরণ এবং ছবি ছাপা হয়। সোসাইটি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পারিতোষিকদানের উদ্দেশ্যে সংখ্যাগুলি একত্রে প্রকাশ করে তারই নাম দিয়েছিলেন 'পশ্বাবলী'।

পশ্বাবলীর প্রথম খণ্ডের রচনারীতি ছিল নিম্নরূপ :

পশ্বাবলী

প্রথম খণ্ড।

সিংহের বিবরণ।

সিংহের বৃত্তান্ত কথা শুন দিয়া মন,
যাহার প্রতিমা এই উপরে লিখন।
সকল পশুর মধ্যে হয় বলশালী,
সেই হেতু ইহাকে পশুর রাজা বলি।

প্রথমাধ্যায়।—সিংহের আকারাদি।

ইহার জন্মস্থান আফ্রিকা ও আসিয়া, এই উভয় দেশের মধ্যস্থানেই জন্মে, এই কারণ শীতস্থানে কখন বাস করে না। যে ২ নিভৃতস্থানে উষ্ণের নিমিত্তে লোকেরা বাস করিতে পারে না, সেইখানে সিংহ অনায়াসে ও সুখে বাস করে। উষ্ণ দেশোৎপন্ন প্রযুক্ত তাহারা স্বাভাবিক রাগী ও বলবান হয়। পূর্ব্বে ঐ দেশদ্বয়ের মধ্যারণ্যে অনেক অনেক সিংহ উৎপন্ন হইত, কিন্তু এইক্ষণে তাহার অনেক ন্যূনতা দেখা যায়। ···

'পশ্বাবলী'র তৃতীয় আধ্যায়ে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। সেটি নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

শৃগালের ক্রোড়পত্র

জেলা নদিয়ার মাটিয়ারি পরগণার সাহাবাদপুর গ্রামে শ্রীপলিন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি মুছলমান ছিল ; সে প্রতিদিন

রোজা করিত ; তাহাতে ঐ গ্রামের উত্তর দিকে গিয়া পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিত, শৃগালের দিগকেও অন্ন দিত ; ঐ অন্নাশাতে অনেক শৃগাল সেই স্থানে একত্র হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিশ্বাস পাক আরম্ভ করিত, তখন সকল শৃগাল নির্ভয়ে অশব্দে বসিয়া থাকিত ; পাক সমাপ্ত হইলে সকলকে ডাকিয়া নিরূপিত খাপরায় তাহার দিগকে অন্ন দিত, তাহাতে শৃগালেরা আপন ২ ভাগ খাইয়া অন্য কোন ভাগের উপর আক্রমণ করিত না, আর শৃগালেরা ঐ বিশ্বাসের নিকটে অতি নির্ভয়ে আপন ২ বাচ্চার সহিত গতায়াত করিত এবং তাহার দিগকে ভাগ ২ করিয়া দিলে যাবৎ বিশ্বাসের আজ্ঞা না পায় তাবৎ ঐ অন্নের নিকটে বসিয়া থাকে ; আজ্ঞা পাইলে স্ব ২ ভাগ মাত্র খায়।

এক দিবস ঐ বিশ্বাসের ২ বৎসর বয়স্কা এক পৌত্রীর মৃত্যু হইলে, বিশ্বাস শোকার্ত্ত হইয়া অনেক রোদন করিয়া সে দিবস আহার না করিয়া কোন লোকদ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া শৃগালের দিগকে নিয়মানুসারে দিল ; তাহাতে প্রচুর দুঃখে কোন শৃগাল সেদিন অন্ন খাইল না।

এবং সেই কন্যার গোর সেই স্থানে দিলে শৃগালেরা অতিশয় মাংসাশী হইয়াও অন্য ২ বালকের গোরের মত তাহার কোন ব্যাঘাত করিল না, বরং ঐ গোরের রক্ষা করিল, ইহাতে হে মনুষ্যেরা, শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমার দিগেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

স্কুল-বুক সোসাইটির রীতি ছিল, প্রথমে বিষয়টি ইংরেজীতে রচনা করা। তারপর বাঙলায় সেটির তর্জমা করা। সেজন্য গ্রন্থের এক-পৃষ্ঠায় ইংরেজী, বিপরীত পৃষ্ঠায় তার বাঙলা তর্জমা দেওয়া হোত। কিন্তু আমরা যে গ্রন্থখানি পাঠের সুযোগ লাভ করেছি তাতে এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবুও রচনাটিকে মৌলিক বলা যেতে পারে না। কারণ, সোসাইটি তাঁদের প্রতিষ্ঠাকালের অন্তত বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যে এই রীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তার প্রমাণ নেই।

সোসাইটির কাজকর্মের সংবাদ থাকতো তাঁদের রিপোর্টে। সোসাইটি সম্বন্ধে সেইটেই প্রধান প্রমাণ। আমাদের বিশেষ অসুবিধা এই যে, আমরা মাত্র ১৮১৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রিপোর্টই দেখবার সুযোগ লাভ করেছি, তার পরের রিপোর্ট দেখতে পাই নি, যদিও সোসাইটি তারপরও জীবিত ছিল আরও দশ-পনেরো বৎসর।

'পশ্বাবলী' যে মাসিক পত্রিকা—শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা ছিল, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা নেই। তার ওপর 'ক্রোড়পত্র' কেবল পত্রিকারই থাকে, গ্রন্থের থাকে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যায় ছিল 'কুকুরের বৃত্তান্ত'। রামচন্দ্র মিত্র 'পশ্বাবলী'র ষোলখানি সংখ্যা প্রকাশ করেন, কেবল বাঙলায় নয়, ইংরেজী ভাষাতেও। 'পশ্বাবলী'কেই বাঙলার দ্বিতীয় শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্র বলা যেতে পারে। তবে তার বিষয় ছিল মাত্র একটি এবং বর্তমানের বা তার বৎসর কতক পরের সাময়িক পত্রের রূপও তাতে ছিল না। প্রাণী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণ ছিল তার উদ্দেশ্য।

৩॥ অতঃপর ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কৃষ্ণধন মিত্র 'জ্ঞানোদয়' নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তাতে নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোলের কাহিনী প্রকাশিত হোত। তবে পত্রিকাখানি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি। মোট বিশখানি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়।

পত্রিকাখানিতে ভারতের—প্রাচীনকালের এবং মুসলমান বিজয় থেকে মুসলমান আমলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ষষ্ঠ সংখ্যার দ্বিতীয় পাঠে আছে 'চীন্‌দেশের বিবরণ'। আরম্ভ— 'সর্ব্বদেশাপেক্ষায় চীন্‌দেশে প্রথমে ধারানুরূপ রাজশাসন ছিল।' আবার গ্রীসদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, রোমেরও আছে।

'জ্ঞানোদয়ে'র বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে :

> এই পুস্তক প্রতিমাসে মুদ্রাঙ্কিত হইবে ইহা গ্রহণে যে যে মহাশয়ের বাঞ্ছা হয় তাঁহারা স্বীয় অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক সিমলার

নীলমণি মিত্রের স্ট্রীটের ২০ সংখ্যার বাটিতে এক পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷০ মুদ্রামাত্র এবং এই পুস্তক গ্রহণে যে যে মহাশয়েরা স্বীকার করিয়াছেন সেই ২ মহাশয়ের নিকটে যদ্যপি না পৌঁছে তবে স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইলে আমরা অবিলম্বে পাঠাইয়া দিব। ইতি।

'পশ্বাবলী'র রচনাটির বাক্য ও বাক্যাংশ যতিচিহ্ন দ্বারা সংযত ও খণ্ডিত। একালের পাঠকপাঠিকাগণ তা স্বচ্ছন্দে পাঠ করতে পারেন। এমন হবার কারণ মূল ইংরেজীকে অনুসরণ। তাই বাক্যে কমা, সেমিকোলন ও ফুলস্টপ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'জ্ঞানোদয়ে'র বিজ্ঞাপনটি মৌলিক রচনা। সেজন্য কেবল শেষ বাক্যটির অন্তে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী 'ছেদ বা দাঁড়ি' ও 'ইতি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পুস্তকশেষে লিখিত আছে :

এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেসে মুদ্রিত হইল। ইং জানেওয়ারি ১৮৩৩ সাল।

মনে হয় ঐ বৎসর ও মাসই পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাকাল। কিন্তু আমরা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র তালিকায় দেখি পত্রিকাখানি তারও দু' বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমরা পত্রিকাখানির প্রচ্ছদপট ও নামপৃষ্ঠা দেখবার সুযোগ লাভ করি নি; শেষের কথাগুলি ভিত্তি করেই মত প্রকাশ করছি।

পত্রিকাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় যা মুদ্রিত আছে তা এই :

জ্ঞানোদয়

১ সংখ্যা ৷৷

৷৷ প্রথম পাঠ ৷৷

যৌবনাবস্থাতে সত্ বিদ্যোৎপার্জ্জন করা অত্যুচিত। পরোপকার করিবার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা মনুষ্যের অত্যাবশ্যক। যুবা ব্যক্তির প্রধান অলঙ্কার লজ্জা হইয়াছেন।

কোন বিষয় অঙ্গীকার করিবার পূর্ব্বক্ষণেই বিবেচনা করা অতি কর্ত্তব্য।

নিরাকাঙ্ক্ষ মন হয়েন এক অমূল্য মহারত্ন।

অলস দুঃখের ও পাপের ও ঈকর্ম্মের মূলাধার।

যাঁহারা সর্ব্বদা অনৃত কহেন তাহার দিগের প্রতি কদাচ বিশ্বাস থাকে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি পরদোষ দর্শন করিয়া আপন দোষকে শোধিত করেন।

বন্ধু ব্যতীত এ সংসার বন স্বরূপ।

পাপক্রিয়া বিলম্বে বা অবিলম্বে প্রকাশ পাইয়া মহৎ দুঃখোৎপাদিকা হয়েন।

সম্পত্তিকালীন বহুবিধ বন্ধুগণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু বিপত্য সময়েই বন্ধুতা ব্যক্তা হয়েন।

ধন সার মৃত্তিকার ন্যায়। তাহাকে যদবধি ব্যয়রূপ ভূমিতে বপন করা না যায় তদবধি ইহাতে বিশেষ শস্যোৎপত্তি হয় না।

আমরা সর্ব্ব সময়ে খেদ করি যে অস্মদাদির পরমায়ু অত্যল্প কিন্তু কার্য্যবসে এবংপ্রকার প্রকাশ হইতেছে যে অমূল্য পরমায়ুর শেষ হয় না।

উপদেশগুলির লক্ষ্য 'যুবা ব্যক্তি'গণ। শিশু ও কিশোরবয়স্কগণ যে উপদেশবাক্যাবলীর অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে অপারগ তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবুও এখানিই ছিল বাঙালী পরিচালিত প্রথম শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। এর রচনাবলী ছিল মৌলিক ও ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা। স্কুল-বুক সোসাইটি এই Native Magazine-এর সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক মিত্রমহাশয়কে উৎসাহ দানোদ্দেশ্যে ৫০ খানি ক্রয় করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থখানিকে স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ। (সোসাইটির দশম রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। ১৮৩২-৩৩ খৃঃ অঃ)। দিগদর্শনও 'যুবলোকের দিগের' উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এবং সোসাইটি কতকগুলি সংখ্যা

একত্রে বাঁধাই করে স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার দেন। তবে বিবর্তনের স্বাভাবিক কারণেই 'জ্ঞানোদয়ে'র বিষয়বস্তুতে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়।

পত্রিকাখানির তৃতীয় সংখ্যায় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কাহিনীটি আছে :

শত্রুকে ক্ষমা করণ বিষয়

যখন চীন দেশীয় মহারাজ শুনিলেন যে শত্রুরা তাঁহার কোন দূরবর্ত্তি প্রদেশে উপপ্লব করিতে উপস্থিত হইয়াছে তখন তিনি আপন সৈন্যগণকে কহিলেন যে তোমরা আমার পশ্চাতে আইস এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তাহাদিগকে শীঘ্র বিনাশ করিব।

অনন্তর তথায় তাঁহার উপস্থিতি হওনেতে ঐ শত্রুরা তাঁহার অধীন হইল। তৎকালে সৈন্যেরা দেখিল রাজা তাহারদিগের কাহাকেও দয়া ও কাহারও সহিত শিষ্টতা ব্যবহার করিলেন তখন তাহারা অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিল। এবং তৎকালে প্রধান মন্ত্রী রাজাকে কহিল হে মহারাজ আপনি কি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কেননা মহারাজ এই কহিয়াছিলেন যে শত্রুদিগকে বিনাশ করিব কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা না করিয়া কতক শত্রুদিগকে ক্ষমা ও কাহাকেও আদর করিতেছেন। রাজা দয়াপ্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন যে শত্রু বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বটে সে সত্য কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি কারণ দেখ এই ব্যক্তিরা শত্রু নহে এইক্ষণে বন্ধু হইয়াছে।

৪॥ আবার 'পশ্বাবলী'র রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় স্কুল-বুক সোসাইটির সাহায্যে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে 'পক্ষির বৃত্তান্ত Orinthology No 1' নামে একখানি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার দাম ছিল দশ পয়সা। কিন্তু এই পত্রিকা দীর্ঘকাল চলে না। এই পত্রিকাও ছিল পশ্বাবলীর অন্তর্গত।

৫ ॥ তারপর ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল প্রকাশিত হয় 'বিদ্যাদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকাখানি।

পরবর্তী ৩রা মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে লিখেছেন :

শ্রীযুক্তবাবু প্রিয়মাধব বসু তথা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'বিদ্যাদর্পণ' নামে এক মাসিক নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহা পাঠ করত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, পুস্তকের পরিমাণ ষোড়শ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা মাত্র, প্রিয়মাধব-বাবু ও যোগেন্দ্রবাবুর বয়ক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক নহে, কিন্তু এই নবীন বয়সে তাঁহারা যেরূপ রচনা করিয়াছেন তৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা চমৎকৃত হইবেন।

এই মাসিক পুস্তক প্রতিমাসের ১৫ তারিখে প্রকাশ। ইহাতে নীতি, ইতিহাস, কবিতা ও বালকদিগের পাঠযোগ্য অনেক বিষয় লিখিত থাকে।

৬ ॥ এই পত্রিকার পর ১৮৬০ খৃস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে খৃস্টান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি প্রকাশ করেন 'সত্যপ্রদীপ' নামে একখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়ে প্রায় পাঁচ বৎসর জীবিত থাকে। এতেই বোঝা যায়, 'সত্যপ্রদীপ' জনপ্রিয় ছিল।

৭ ॥ অতঃপর মাসিকপত্র অবোধ-বন্ধু—১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে (ইংরেজী ১৮৬৬ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। পর বৎসর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন। যোগেন্দ্রবাবু তাঁকে পত্রিকাখানি দান করেন। কিন্তু অবোধ-বন্ধুর প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে। তবে সে সময়ে বেশী দিন চলে না।

তখন বিদ্যাসাগর-যুগের প্রথম ভাগ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাঙলা গদ্য অনেকটা পুষ্ট ও গঠিত। কিন্তু গদ্যলেখক বিষয়বস্তুর জন্য অনেকাংশে নির্ভর করেন ইংরেজীর ওপর। সেজন্য এই

পত্রিকাখানিরও অনেকগুলি রচনা ইংরেজীগ্রন্থ ও ইংরেজ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত। যা হোক, পত্রিকাখানির প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই আছে :

স্বদেশের যে প্রকারে হোতে পারে হিত
সাধ্যমত চেষ্টা করা সবার উচিত।
তিল সম হেন কাজ যদি মনে লয়,
তথাচ নিরস্ত থাকা, যুক্তিযুক্ত নয় ;
কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন।

আরম্ভ।

সূর্য্য যেমন অস্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে ছিল। এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার সর্ব্বসমীপে উদয় হইতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকদ্বারা উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা। শীতকালে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্ণতর কিরণ প্রাণী দেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু, যদ্যপি কোন একটি বালকবালিকা কিম্বা অন্তঃ-পুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে ; এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধ-বন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফললাভ করিব।

কিন্তু দেখা যায় কি গদ্য কি পদ্য কোনটিই ঠিক শিশুপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে নি। কতকগুলির বিষয়বস্তু তো শিশু ও কিশোরোপযোগী

আদৌ নয়। যেমন, 'অপূর্ব্ব পতন', 'পতির অত্যাচার', 'সংসার', 'বিরহিনী', 'বঙ্গসুন্দরী' ইত্যাদি কাব্য ও কবিতানিচয়। বিহারীলালের 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যের অধিকাংশ অবোধ-বন্ধুতেই প্রকাশিত হয়। তাঁর 'সুরবালা' কাব্যেরও কিছু অংশ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার রচনাবলী যে 'অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের' বোধযোগ্য হয়েছিল আমাদের এমন মনে হয় না। অধিকাংশ গদ্য ও পদ্যরচনার মর্ম্মোপলব্ধি সাধারণ মেধাবিনী অন্তঃপুরিকাগণের ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্নের সাধ্যাতীত বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা। তবুও পত্রিকাখানি তিন বৎসর চলে এবং স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কবি বিহারীলালকেই দ্বিতীয় ভাগের শেষ থেকে স্বত্বাধিকার দান করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করেন নি। অনুমান, পত্রিকার আয়ের চেয়ে পরিচালন-ব্যয় অধিক হয়, এই কারণেই।

পত্রিকাখানিতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, চরিতকথা, গল্প, কবিতা ও গ্রন্থসমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হোত। গ্রন্থসমালোচনা থেকে সেকালের দুজন কৃতী লেখিকার নাম জানা যায়—কৈলাসবাসিনী দেবী ও বামাসুন্দরী দেবী। সম্পাদক উভয়কেই তাঁদের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-রচনার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের গ্রন্থগুলি অবশ্য শিশু-পাঠ্য ছিল না। কারণ কৈলাসবাসিনীর গ্রন্থখানি সম্পাদকের ভাষায়

> 'অমায়িক ও ভাবুকচিত্তে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় আলোচনা করিলে সহজেই যে সকল আশ্চর্য্য জ্ঞানকৌশল ও ক্ষমতা প্রতীয়মান হয়, তাহার কীর্ত্তন করা এই গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য।

তবুও শিশুপাঠ্য সাময়িকে গ্রন্থখানির সমালোচনা করা হয়। একালে এ রীতি নেই। কৈলাসবাসিনী 'অবোধ-বন্ধু'র অন্যতম লেখিকাও ছিলেন। 'বামাগণের রচনা' নামে একটি বিভাগ পত্রিকাখানিতে থাকতো। মনে হয় পত্রিকাখানির অধিকাংশ রচনাই বিহারীলালের। দ্বিতীয় বৎসরে মাত্র একটি সংখ্যায় একখানি কাঠ-খোদাই ব্লকের ছবি ছাড়া আর কোনও ছবি কোনও সংখ্যায় দেখা

যায় না। শিশুপাঠ্য পত্রিকার মধ্যে 'অবোধ-বন্ধু'তেই প্রথম গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে আর কোনও শিশুপাঠ্য পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা আমরা দেখি না। কাজেই বিহারীলালই শিশুপাঠ্য পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনার প্রথম প্রবর্তক।

পত্রিকাখানির রচনাবলীর কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

বেকন সন্দর্ভ

পাখীর মধ্যে বাদুড় যেরূপ, চিন্তার মধ্যে সন্দেহ সেইরূপ। বাদুড় সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে উড়িয়া বেড়ায় সেইরূপ যে বিষয় আমরা ভাল জানি না সেই বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ থামাইয়া রাখা ভাল, অন্ততঃ তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়াও চাহি।

সন্দেহে মন মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় হইয়া উঠে, বন্ধুবান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ এবং কার্য্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মে সুতরাং কাজকর্ম্ম স্থির ও সমভাবে চলিতে পারে না। ইহাতে রাজা যথেচ্ছাচারী ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী হয়; বিজ্ঞ লোকদিগের বুদ্ধির স্থিরতা ও মনের প্রফুল্লতা থাকে না।

বিদ্যা

বিদ্যার সমান ধন কি আছে সংসারে,
বিদ্যার গুণের কথা বর্ণিতে কে পারে॥
বিদ্যাই সবার মূল কুবুদ্ধি নাশিনী,
জ্ঞানময়ী বিদ্যাদেবী সুবুদ্ধি দায়িনী॥
যথার্থ বিদ্যার তত্ত্ব যে জন পেয়েছে,
নম্রতার হার সেই গলায় পরেছে॥ ইত্যাদি।

আবার এরকমেরও আছে :

অপূর্ব্ব পতন

....এখন কোথায় সেই পতি প্রতি মতি,
পতিধ্যান, পতিপ্রাণ, পতিমাত্র গতি;
হায়রে কোথায় সেই পতি ভালবাসা,
সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা?

কেবল কি সে সকল বচন চাতুরী,
মধু মধু মধুমাখা মিচিরির ছুরী?
দেখেছিনু যে প্রণয়, সে কি সত্য নয়?
হায় তবে আজো কেন দিন রাত হয়! ইত্যাদি।

কিন্তু 'অবোধ-বন্ধু' যে শিশুচিত্ত হরণে একেবারেই বিফল হয় তা বলা যায় না, যখন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র পৃষ্ঠায় পত্রিকাখানিতে প্রকাশিত পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ সম্বন্ধে এই উক্তি পাঠ করা যায়:

> বাল্যকালে আর একটি ছোট কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধ-বন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের ও বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধ-বন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জিনী গল্পের সরল বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্র সমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙিন রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙ্গালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল!

তবে এই শিশুপাঠকটি ছিলেন অসাধারণ। গ্রন্থখানি ফরাসী থেকে অনুবাদ করেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনিও ছিলেন পত্রিকার অন্যতম লেখক।

অবোধ-বন্ধুকে আমরা পুরাপুরি শিশুপাঠ্য পত্রিকা বলার পক্ষে নয়। পত্রিকাখানির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুদেরও মনোরঞ্জন ও শিক্ষা।

৮॥ অতঃপর ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়, 'জ্যোতিরিঙ্গণ'। তার দ্বিতীয় সংস্করণের নামপৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

'জ্যোতিরিঙ্গণ' স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত মাসিকপত্র। —ভবানীপুর

কলিকাতা ট্রাকট সোসাইটির যত্নে সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

পত্রিকাখানির ভূমিকার সূচনায় আছে :

আমোদ ও নীতিশিক্ষা একত্র করিবার নিমিত্ত অনেকেই চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া সকলের পক্ষে সহজ নহে।······আমরা······বালক-বালিকা ও স্ত্রীগণের এককালীন আমোদ ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।······এই পত্রেতে বিবিধ উপাখ্যান, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি নানাপ্রকার বিষয় থাকিবে। আমোদ-সহকৃত নীতিশিক্ষাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

পত্রিকাখানি ছিল একরঙা চিত্র সম্বলিত। চিত্রের শিল্পী ছিলেন ইংরেজ। কাঠ-খোদাই করে বিলাতীর অনুকরণে চিত্রগুলি তৈরি করে ছাপা হোত।

পত্রিকাখানির একটি কবিতার নমুনা :

পক্ষীগণ

কিবা পশু, কিবা পক্ষী, কিবা নরজাতি,
সবার অন্তরে স্নেহ করয়ে বসতি।
দেখ, দেখ শিশুগণ! কত না যতনে,
পক্ষীগণ পুষিতেছে আপন সন্তানে। ইত্যাদি।

গদ্যের নমুনা—সিংহের কথা প্রসঙ্গে :

আফ্রিকার উত্তপ্ত মরুভূমিতে অতি ভয়ঙ্কর সিংহ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের আশ্চর্য্য সাহস! মরুভূমির নিকটস্থ জীবজন্তুরা সর্ব্বদা এই সিংহের নিমিত্ত সশঙ্ক হইয়া বাস করে।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভাষায় আগের পত্রিকাগুলির মতো জড়তা নেই। আর, বাক্যের শেষে কেবল পূর্ণবিরাম চিহ্নই নেই, মধ্যে স্বল্পবিরাম চিহ্নও ব্যবহৃত হয়েছে।

৯॥ উক্ত পত্রিকাখানির নয় বৎসর পরে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একখানি সচিত্র বালকপাঠ্য পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানির নাম 'বালকবন্ধু'। পত্রিকার প্রকাশ-কাল লিখিত আছে—২০শে বৈশাখ, ১৮০০ শক। ইং ১৮৭৮। শকাব্দ ইংরেজী খৃস্টাব্দ থেকে ৭৮ বা ৭৯ বৎসর কম। বালকবন্ধুর সম্পাদনা করতেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। অতএব দেখা যায়, বালকবন্ধুই বাংলার বালকপাঠ্য প্রথম পাক্ষিক সাময়িক পত্র। এর আগে আর কোনও শিশুপাঠ্য পাক্ষিকের সন্ধান আমরা পাই না।

বালকবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল সুকুমারমতি পাঠকগণকে শিক্ষা ও আনন্দ দান। সেজন্য পত্রিকায় নানা বিষয়ের সমাবেশ করা হোত। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, প্রায় প্রতি সংখ্যায় দুটি-একটি 'বালকের রচনা' প্রকাশিত হোত। তবে সেগুলি কবিতা। রচনাগুলির একটির কিঞ্চিৎ নমুনা :

মাতৃস্নেহ

মাতার মতন স্নেহ করে কে কখন ?
জননী সমান হায় কে করে যতন।
কতই যতন করে, সন্তানে পালন করে,
কে পারে সহিতে ক্লেশ তাঁহার মতন
সন্তানই যেন তাঁর সমগ্র জীবন।

রচনা শেষে রচয়িতার নাম ও উপাধি কেবলমাত্র আদ্যক্ষরে লেখা থাকতো। তবে কোথাও বয়সের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু স্কুলের নাম থাকতো। বালকেরা কবিতার অনুবাদও করতো।

পাক্ষিকের ২০শ সংখ্যা থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় দেশী-বিলাতী 'সংবাদ'

কেশবচন্দ্র সেন

প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই থেকে দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীর বালক-বালিকাপাঠ্য সংবাদপত্র বালকবন্ধুতেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

পাক্ষিকের একটি সংবাদের নমুনা :

> একটি নয় বৎসরের বালিকা এদেশী একটি কিরোসিন লাম্প নিবাইতে যায়। নিবাইবার সময় হঠাৎ হাই উঠাতে তাহার একমুখ 'কার্ব্বণ' হইয়া শরীরে প্রবেশ করে। কয় মিনিটের মধ্যেই তাহার পেটের ভিতরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং সে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

পত্রিকাখানিতে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেশন করা হোত। কোনও কোনও সংবাদের উপসংহারে সে সম্বন্ধে নীতিকথা থাকতো। সম্ভবত তাই ছিল সম্পাদকের মন্তব্য। কোনও পত্রিকায় পৃথক সম্পাদকীয় স্তম্ভ থাকতো না। পাক্ষিকখানি দীর্ঘকাল চলে না।

১৮৮১ খৃস্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর পাক্ষিক বালকবন্ধু মাসিকরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে পত্রিকাখানির তিরোধান ঘটে। তারপর আবার ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) ১ম ভাগ (পাক্ষিক) প্রকাশিত হয়। তারপরও ১৮৯১ খৃস্টাব্দে (১২৯৮ বঙ্গাব্দে) মাসিক আকারে 'নূতন প্রকরণ' প্রকাশিত হয়েছিল।

মাসিক বালকবন্ধুতে দেশী-বিলাতী সংবাদ পরিবেশন করা হোত, এবং তার উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়বস্তুরও কোনও পরিবর্তন হয় না। তবে দু'-একটি ধারাবাহিক গল্প প্রকাশিত হোতে থাকে।

বালকবন্ধুতে প্রকাশিত হোত বিজ্ঞান, গল্প, নীতি, কবিতা, হেঁয়ালী, ব্যাকরণ ও গণিত। কি উপায়ে নির্ভুল বাঙলা লেখা যায় তাও পাঠকগণকে শিক্ষা দেওয়া হোত। আবার কখনও কখনও একটি অনুচ্ছেদের বাক্যাবলীর পদগুলিকে ভেঙে তাদের দু'-একটি বর্ণকে পূর্ব্বের বা পর পদের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হোত যে, পাঠকালে পাঠকের বিশেষ অসুবিধার ও শ্রোতার মনে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করতো। এর দ্বারা পাঠকের বাঙলা ভাষায় জ্ঞান পরীক্ষা করা যেতো। প্রতি সংখ্যায় একটি করে সংস্কৃত শ্লোক ও তার সরল ব্যাখ্যা থাকতো।

বালকবন্ধুর ভাষা ছিল প্রায় বিংশ শতাব্দীর বাঙলা ভাষার মতো এবং যে ভাষায় পত্রিকাখানি লেখা হোত তা সহজ, সরল ও সুমিষ্ট।

বালকবন্ধুর প্রতিসংখ্যায় থাকতো কাঠ-খোদাই ব্লকে ছাপা কয়েক-খানি এক-রঙা ছবি। কিন্তু সেগুলির শিল্পী কে তা জানা যায় না। বলতে গেলে বালকবন্ধু থেকেই শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাজগতে নূতনের উদয় হয়।

আনন্দ ও বিস্ময়ের কথা যে, ১৮৮১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ এই চার বৎসরে বাংলা দেশে আরও ছ'খানি বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। মাসিক বালকবন্ধুর সমসাময়িক ছিল :

১০ ॥ 'বালক হিতৈষী।' পত্রিকাখানি ছিল মাসিক এবং ১৮৮১ খৃস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৮৮, কার্তিক মাসে) প্রকাশিত হয়। পত্রিকা-খানির পরিচালক ছিলেন, জানকীপ্রসাদ দে।

১১ ॥ আবার, ঐ ১৮৮১ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়, 'আর্য্যকাহিনী'। পত্রিকাখানি ছিল সাপ্তাহিক। এইখানিই বাংলার বালক-বালিকাপাঠ্য প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। কারণ এর আগে আর কোনও সাপ্তাহিকের সন্ধান আমরা পাই না।

১২ ॥ এই পত্রিকাখানির দু'বৎসর পরে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ১লা জানুয়ারী আবির্ভূত হয় সেকালের বাংলার বালক-বালিকাগণের প্রিয়, 'সখা'। 'সখা' ছিল মাসিক পত্রিকা। প্রথম তিন বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ অবধি সখার সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। পত্রিকাখানির জন্য তিনি প্রভূত ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেন। অথচ তিনি ছিলেন দরিদ্র। দুর্ভাগ্য যে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ২১শে জুন অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন থেকে অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তৃতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা জুলাই থেকে, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ অবধি চতুর্থ বর্ষটি 'সখা'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁর পরে এক বৎসর ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে সখা পরিচালনা করেন অন্নদাচরণ সেন। তিনি পত্রিকাখানির পরিচালন-ভার পরিত্যাগ করলে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সখার সম্পাদনভার গ্রহণ করে

পত্রিকাখানিকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁরই যত্নে সখা তিন-চার বৎসর জীবিত থাকে। অবশেষে সখার কৈশোরেই মৃত্যু হয়। তারপর প্রায় চার বৎসর কেটে যায়। ভুবনমোহন রায় ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'সাথী'। তার আগে জুড়ে দেন সখার প্রিয় নামটি। তখন হয় 'সখা ও সাথী'। সাথীদের কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

রচনাসম্ভারে 'সখা' বাংলার শিশুচিত্ত এতখানি লুঠে নিয়েছিল যে, আজও এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও অনেক শিক্ষিত বাঙালী তাকে স্মরণ করে থাকেন। বস্তুত সখাই প্রথম শিশু ও কিশোরোপযোগী পত্রিকা।

যে উপেন্দ্রকিশোর রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার বালক-বালিকাদের হাতে মনোলোভা 'সন্দেশ' দিয়ে তাদের আনন্দবর্ধন করতেন, তিনি ছিলেন সখার অন্যতম প্রধান লেখক। তখন তিনি ১৬।১৭ বৎসরের কিশোর। প্রথম দিকে সখাকে সুন্দর রচনাসম্ভারে সাজাতেন সম্পাদক মহাশয়, তিনি ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরও অনেকে।

আরও একটি মজার কথা এই যে, সখার ষষ্ঠ সংখ্যায় বিখ্যাত মনীষী ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল 'সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি সুরেন্দ্রবাবুর (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) হাইকোর্টে বিচার, কারাবাসের কারণ ও চরিতকথা অতি সহজ ভাষায় বর্ণনা করেন। প্রবন্ধটির উপসংহারে আছে :

> পাঠক! পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য জন্মভূমির জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে শেখ! একদিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, একদিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে। একদিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে।

শিশুপাঠ্য পত্রিকায় এই প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ।

সখাও তার পূর্ববর্তিনীগণের মতোই গল্প, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে সমৃদ্ধ থাকতো। বালকবন্ধুর প্রদর্শিত পথে চললেও সখার অনেকগুলি

বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলির মধ্যে বিদেশী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সচিত্র চরিতকথা ছিল অন্যতম। সখার চিত্রগুলিও কাঠ-খোদাই করে ছাপা হোলেও ছিল স্পষ্ট ও চমৎকার।

প্রমদাচরণ ছিলেন উদার ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। তাঁর রচনায় ও সমগ্র পত্রিকাখানিতে তার প্রচুর পরিচয় মেলে। আর, তাঁর রুচিও ছিল উন্নত। চাষী, অনুন্নত শ্রেণী ও দরিদ্রের প্রতি তাঁর দরদ ছিল গভীর।

সখা কয়েকটি স্তম্ভে গঠিত ছিল। এই সকল স্তম্ভে পাঠক-পাঠিকাগণকে পোশাক, আচার-ব্যবহার, স্বাস্থ্য ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হোত। মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীও কোনও কোনও সংখ্যায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শিখানো হয়েছে। বালকবন্ধুতেও এরকম প্রয়াস দেখা যায়। প্রথম সংখ্যাতেই পাঠক-পাঠিকাদের পত্র ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার রীতির ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনার প্রবর্তন হয়। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক স্তম্ভে দেশী-বিলাতী সংবাদ প্রকাশিত হোত। মন্তব্যসহ সম্পাদক যা লিখতেন তাকে সম্পাদকীয় বলা যেতে পারে। তবে আজকালকার সাময়িকীর অবিকল রূপ তার ছিল না।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশের কৈফিয়তে লিখেছেন :

> এতদিন পরে সখা প্রকাশিত হইল। এইরূপ পত্রিকা আমাদের দেশে নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

এবং পত্রিকার লক্ষ্য সম্বন্ধে লিখেছেন :

> এই পত্রিকায় লিখিত গল্পপ্রভৃতির দ্বারা বালক-বালিকাদের চরিত্রের বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তার করাই আমাদের লক্ষ্য।

তাই স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় 'ভীমের কপাল' নামে একখানি সুন্দর উপন্যাস প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক লিখে দশম সংখ্যায় সমাপ্ত করেন। উপন্যাসের নায়ক মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন নন, এক বাঙালী কিশোর। তাকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলে শোধন

করা ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রচনাটিতে তখনকার বাংলার মফঃস্বল শহর ও গ্রামের চিত্র দেখা যায়। এইখানিই বাংলার শিশুপাঠ্য পত্রিকার পাতায় প্রথম কিশোরপাঠ্য মৌলিক উপন্যাস। এর আগে আর কোনও কিশোরপাঠ্য উপন্যাসের সন্ধান আমরা পাই না।

'ঠাকুরদার আসর' নামে একটি আসর ছিল। এই আসরে গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হোত। আসরের 'ঠাকুরদাদাটি' ছিলেন, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। কিশোরবয়স্ক উপেন্দ্রকিশোরও বিজ্ঞান-বিষয়ক নিবন্ধ লিখতেন।

সখায় নানা রকমের ধাঁধা থাকতো। যে সবচেয়ে বেশি উত্তর দিতে পারতো তাকে পুরস্কার দেওয়া হোত।

সখার গদ্য ও পদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া হোল :

পদ্য : শরদের নিশি

কাননে ফুটেছে ফুল,
গগনে ফুটেছে তারা,
শরদের নিশিখানি,
হাসিতেছে মুখভরা।

গদ্য :

সে প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। ক্লুউপ সাগরে একটি সীলের ছানা ধরা পড়ে। সমুদ্রের ধারে একটি ভদ্রলোক থাকিতেন। তিনি তাহাকে রান্নাঘরে রাখিয়া পুষিতে লাগিলেন।

এই সীলটি ছিল অন্ধ।

উপরোক্ত গদ্য-পদ্যের ভাষা কত সাবলীল! পূর্ববর্তিনী পত্রিকাগুলির চেয়ে 'সখা' ছাপা, ছবি ও রচনাশৈলীতে ছিল অনেকটা উন্নত। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে সখা শিক্ষালাভ করে লাভবান হয়েছিল। সখার কার্যালয় ছিল—৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩॥ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৯০, ভাদ্র মাস) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, 'বালিকা'। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন, অক্ষয়-কুমার গুপ্ত।

১৪॥ এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে 'বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়' থেকে প্রকাশিত হয়, 'সুনীতি'। এখানিও ছিল মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল 'বালক ও যুবকবৃন্দের হৃদয়ে আর্য্য রীতিনীতির প্রবর্তনা ও আর্য্যভাবের উদ্দীপনা।' এই মহৎ কার্যে পত্রিকাখানি কতদূর সাফল্য লাভ করে তা জানা যায় না, তবে যখন সে এক বৎসরের শিশু তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এ কথা জানা যায়। পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন, ভূধর চট্টোপাধ্যায়।

১৫॥ আবার এই বৎসরেই রেভাঃ জে. ই. পেন-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, 'বাল্যবন্ধু'। বন্ধুটির উদ্দেশ্য ও কার্য ছিল বালক-বালিকাদের মধ্যে খৃস্টতত্ত্ব প্রচার। এই পত্রিকার প্রকাশকাল, ১৮৮৩ (বঙ্গাব্দ ১২৯০, কার্তিক)। বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রচারমূলক পত্রিকা দুখানি জনপ্রিয় হয় না।

শিশু-সাহিত্যের রূপ কেমন হওয়া উচিত, এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে হবে এমন সম্ভাবনারও যথেষ্ট কারণ আছে। তবুও শিশু-সাহিত্যিক ও অপরাপর সাহিত্যিকগণ সমালোচকের মন্তব্য উপেক্ষা করে নিজেদের খেয়ালে এ সাহিত্য সর্বকালেই রচনা করে যাবেন। দেখা যায়, এক সময়ে যা বয়স্কগণের পাঠ্য ছিল, পরবর্তীকালে তাই শিশু-সাহিত্য হয়েছে। আবার বিপরীতটাও যে কখনও কখনও ঘটে নি এমনও নয়। পূর্বে অবোধ-বন্ধুতে তা দেখা গেছে। আবার পরেও তা দেখা যায়। নিম্নে তার একটি প্রমাণ দেওয়া গেল।

১৬॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় বাংলার বালক-বালিকাদের জন্য ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে—১৮৮৫ খৃস্টাব্দে—'বালক' নামে যে সুন্দর মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় তার কথা অনেকেরই মনে আছে। এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।' আবার এই বালকেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের

'রাজর্ষি' নামক উপন্যাস। এখানিকে কেউই শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন না।

বালকও ছিল সচিত্র, কিন্তু ছোট অক্ষরে মুদ্রিত হোত। আমরা পূর্বের অনেকগুলি বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকা বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেখেছি। বালকের অধিকাংশ লেখক ছিলেন ঠাকুরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'ঠগী' কাহিনীর রচয়িতারূপে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়। ইনি হাস্যরসাত্মক রচনায় পারঙ্গম সুপ্রসিদ্ধ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি না জানি না। অন্তত এই রচনাটিতে হাস্যরস নেই। অবিশ্যি ঠগীদের কাণ্ডকারখানা মনে হাস্যরসের পরিবর্তে আতঙ্কেরই সৃষ্টি করতো এবং তার কাহিনী আজও তা করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'হেঁয়ালী' নাটিকাগুলি, যা আজকাল বালক-বালিকারা অভিনয় করে, কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্কগণও করেন, বালকেই প্রথম প্রকাশিত হয়। বালকের আগে আর কোনও শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রে আমরা নাটক প্রকাশিত হোতে দেখি না।

রবীন্দ্রনাথের নাটিকাগুলির পূর্বে বাংলার বালক-বালিকাগণের জন্য আর কেউ নাটক রচনা করেছিলেন এমন প্রমাণ আমরা পাই না। ঐ সকল নাটক বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের হাস্য-কৌতুক নাটিকাগুলির অন্তর্গত। কতকগুলির মধ্যে প্রচুর শ্লেষ আছে যার ফলে হাস্য-রসসৃষ্টি হয়ে থাকে।

বালকেও বিজ্ঞান, ইতিহাস, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ ও নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হোত। কিছু 'খবরাখবর' থাকতো এবং বালক-বালিকার রচনাও স্থান পেতো। ব্যায়ামের রীতিও শিখানো হোত। বালকেও গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়েছে। 'প্রভু যীশুখৃস্টের নূতন নিয়ম' নামক একখানি গ্রন্থের সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যারা ধাঁধার উত্তর দিত কোনও কোনও সংখ্যায় তাদের নাম প্রকাশিত হোত। এরূপ একটি সংখ্যায় মাত্র ১৪টি নাম প্রকাশিত হয়েছে।

'বালকে' প্রকাশিত বালক-বালিকাদের জন্যে রচিত দু'-একটি গদ্য ও পদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা :

ক ॥ অর্থাৎ বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মা-প্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান, কোন বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজকার করিব ও আমরা খাইব।

খ ॥ নিদাঘ-তপন শুষ্ক ম্রিয়মান লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—

এইরূপ রচনা অসাধারণ বালক-বালিকাদের জন্যই রচিত হোত মনে হয়। 'বালক' এক বৎসর পরে প্রাপ্তবয়স্কদের পত্রিকা 'ভারতী'র সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৭ ॥ অতঃপর 'শিক্ষা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার কথা জানা যায়। পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন বনগ্রামের ছাত্রসমিতি ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে। পত্রিকাসম্পাদক ছিলেন, প্রিয়নাথ বসু।

১৮ ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশুবান্ধব' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সন্ধান দিয়েছেন বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকার উল্লেখ করে। তাঁর অনুমান, পত্রিকাখানি ১৮৯০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাসম্পাদক ছিলেন, জি. এইচ. রুজ। পত্রিকাখানির রচনা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

১৯ ॥ ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে—১৮৯৩ খৃস্টাব্দে—মধুগুপ্তের লেন থেকে প্রকাশিত হয় 'সাথী'। এর সম্পাদক ছিলেন ভুবনমোহন রায়।

প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় কার্যাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র সেন লিখছেন :

'সাথী' প্রকাশিত হইল। বালক-বালিকাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাই সাথীর লক্ষ্য। আদর্শ জীবন চরিত, মনোহর গল্প, কবিতা, সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের কথা, ইতিহাসের কথা এবং

বিবিধ প্রকার ব্যায়াম ও খেলার কথা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সাথীতে লেখা হইবে।

…কথায় যাহা পরিষ্কার না হইবে, চিত্রাদি দ্বারা তাহা বুঝান হইবে; চিত্রের বিষয় আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইত্যাদি।

'সাথী'র প্রকাশিত বিষয়বস্তুর কথা কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের বিবৃতিতেই জানা গেল। সাথীতেও বালকদের রচনা প্রকাশিত হোত এবং রচনা প্রতিযোগিতায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনা পুরস্কার লাভ করতো। একবার প্রথমজনকে পুরস্কার দেওয়া হয় পকেট ঘড়ি, দ্বিতীয়কে টাইমপিস। বালক বয়সে মাইকেল-চরিতকার যোগেন্দ্রনাথ বসুও সাথীতে কবিতা লেখেন। তার কিঞ্চিৎ :

বিচার আসনে বসি আছে সিংহরাজ
বিচার হইবে দুষ্ট শৃগালের আজ।
বামে বসি রাজমন্ত্রী সভাসদ যত,
দক্ষিণেতে উকিল কৌঁসুলী দেখ কত।
হেন অত্যাচার রাজার সহ্য নাহি হয়
অধর তাঁর কাঁপছে রাগে চক্ষু রক্তময়।
শৃগাল বলে,
মিথ্যা কথা বলছে বৃদ্ধ মেষ
'আমি কি কভু একটা ভেড়া করতে পারি শেষ?'

সাথীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথমেই অমর-যশা শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একটি কবিতায় 'আবাহন' করছেন—

কোথা আছ
ভাইটি আমার কোথা আছ বোন,
আয় ছুটে
আয় শোনরে এসে সাথীর আবাহন …ইত্যাদি।

সাথীর ভাষা পূর্ববর্তিনী পত্রিকাগুলির চেয়েও সহজ ও সাবলীল। চিত্রগুলি আগের মতোই কাঠ-খোদাই করে ছাপা হোলেও স্পষ্ট ও সুন্দর।

৭ম সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের 'বেচারাম ও কেনারাম' নামে সুন্দর একখানি সচিত্র নাটিকা প্রকাশিত হয়। চিত্র কয়খানি সম্ভবত তাঁরই আঁকা।

আর, ৮ম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একটি সুন্দর উপদেশ দিয়ে তার উপসংহারে লিখছেন :

> প্রকৃত জ্ঞানীর প্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি বাল্য ভাব-বিশিষ্ট। অতএব তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, হে বালক! হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী! হে ঋষি! হে দেবতা! তোমাকে নমস্কার করি।

বসু মহাশয় তখন থাকতেন 'দেবগৃহে' (দেওঘরে)। সাথীর গদ্যের কিঞ্চিৎ নমুনা :

> কুরুক্ষেত্রে উঞ্ছবৃত্তি নামে এক তপস্বী ছিলেন। (পাদটীকায় 'উঞ্ছ' কাকে বলে তা বোঝানো হয়েছে।) তিনি সেখানে পর্ণ কুটীরে স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত তপস্যা করিতেন। প্রতিদিন উঞ্ছদ্বারা ব্রাহ্মণ যাহা কিছু পাইতেন অপরাহ্ণে সপরিবারে তাহাই ভোজন করিতেন।

এই রচনাটির রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।

আজকাল বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকায়ও ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু 'সখা'তেই বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রথম রেওয়াজ আরম্ভ হয়। সাথীতেও এই রীতির অনুসরণ করা হয়।

২০॥ প্রকাশের এক বৎসর পরে সাথীর সঙ্গে সখা যুক্ত হয়। তখনই নাম হয় 'সখা ও সাথী'। ভুবনমোহন রায়ই ছিলেন তার সম্পাদক। সখা ও সাথীর প্রকাশকাল—১৮৯৪ খৃস্টাব্দ।

সখা ও সাথী রচনায় আরও উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু বিষয়বস্তুর বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নাম দেখা যায় জলধর সেন, জগদানন্দ রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সখা ও সাথীর পাঠক-পাঠিকাগণকে দেওঘর থেকে একটি সংখ্যায় 'নারিকেল বৃক্ষের উপদেশ'

নামে একটি রচনা পাঠিয়েছিলেন। সখা ও সাথীতে মনীষীদের চরিত-কথাও গল্পের মতো কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হোত। কয়েকটি সংখ্যায় হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড' নামে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। এইটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকায় প্রথম 'থ্রিলার' বলা যেতে পারে। এ যুগে এই সাহিত্যের প্রাচুর্য এবং কুফল দেখে অনেকেই এর বিরোধী হয়ে উঠেছেন।

২১॥ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে 'দিগ্দর্শন' বাংলার শিশু-সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ বপন করে তা সাতাত্তর বৎসরে অঙ্কুরিত হয়ে শাখায় পল্লবে সুশোভিত এবং সুগন্ধি মনোরম কুসুমে কুসুমিত হয়ে ওঠে মাসিক 'মুকুলে'। সে কুসুমের বর্ণ, সুষমা ও সুরভিতে বাংলার শিশুচিত্ত পুলকিত ও মুগ্ধ হয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের নব মেঘোদয়ে হয় 'মুকুলে'র প্রথম প্রকাশ। তখন ইংরেজী ১৮৯৫ খৃঃ অঃ। মুকুলও ছিল সচিত্র ও সুমুদ্রিত।

আমাদের বাংলার সাহিত্যকে যাঁরা বিবিধ মণি-রত্নে ঐশ্বর্যময় করে গেছেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন, 'মুকুলে'র লেখক। যেমন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য যোগেশচন্দ্র, গিরীন্দ্রমোহিনী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। শেষোক্তজন ছাড়া আর সকলেই আজ পরলোকে। আর, সম্পাদক স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় তো—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—তাঁর সুললিত রচনায় মুকুলের প্রতি সংখ্যাকে সরস করতেনই।

প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছেন :

> মুকুল নামটা বেশ। মুকুল বলিলেই অনেক কথা মনে হয়। প্রথম মনে হয়, আশা। যাহা আজ মুকুলে আছে, কালি তাহা ফুটিবে। মুকুল আসিয়াছে, পশ্চাতে ফুল ও ফল আসিতেছে। এই জন্যই মুকুল দেখিলেই সকলের আনন্দ ; মুকুল দেখিলেই বোঝা যায়, এ বৎসর ফলটা কেমন হইবে। ইত্যাদি।

আবার, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রারম্ভেই তিনি জানাচ্ছেন, 'মুকুল কাহাদের জন্য ?' তিনি লিখছেন :

মুকুল সম্পূর্ণরূপে ছোট শিশুদের জন্য নহে। যাহাদের বয়স ৮।৯ হইতে ১৬।১৭র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্য।

বস্তুত কেবলমাত্র ৮।৯ বৎসরের শিশুদের জন্য কোনও পত্রিকা আজ অবধি প্রকাশিত হয় নি, যদিও বা দু'-একখানি হয়ে থাকে, তাও অল্প-কালের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের যতটা মনে হয়, এর প্রধান কারণ আর্থিক। তবে 'মুকুলে' যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয়ের অনেকগুলি সুন্দর সচিত্র কবিতা বাস্তবিকই ৮।৯ বৎসরের বালক-বালিকাগণের উপযোগী ছিল। আজও সেগুলি সানন্দে পঠিত হয়।

মুকুলও তার পূর্ববর্তিনীগণের মতোই গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, চরিত-কথা, ভ্রমণ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও ধাঁধা ইত্যাদিতে পূর্ণ থাকতো। জীবজন্তুর কথা থাকতো আগের চেয়ে অনেক বেশি। সম্পাদক মহাশয় পাঠকমহলের প্রশ্ন ও পত্রের সরস উত্তর দিতেন। কোনও কোনও গ্রাহক তাঁকে 'গালাগালি' দিয়ে পত্র দিত। তিনি তারও সরস উত্তর দিয়ে তাকে শিক্ষা দিতেন ও অপর পাঠকগণকে হাস্যরস বিতরণ করতেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 'মুকুলে' পাঠক-পাঠিকাগণের উদ্দেশ্যে হাস্যরসে-ভরা কবিতায় ও কৌতুক চিত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সে দুটি ও অপরাপর রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা নিষ্প্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত হোল না। অবিশ্যি মুকুলের অনেক রচনা—যেমন জগদীশচন্দ্রের 'গাছের কথা', শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের গল্প 'আবু করিমের চটি জুতা' বালক-বালিকারা আজও পাঠ করে থাকে।

মুকুলেও বালক-বালিকাদের রচনা প্রকাশিত হোত। ২য় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়—দ্বিতীয় বর্ষ থেকে বৈশাখেই বর্ষারম্ভ হোত—একটি আট বৎসর বয়সের শিশুর বর্ণনাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শিশুটির পরিচয় 'শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী (বয়স ৮ বৎসর)' এইরূপ লেখা আছে।

কবিতাটির নাম 'নদী'। কবিতাটি এই :

হে পর্ব্বত যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।

ছোটবড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্ কল্ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।

পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই সব কিবা মনোলোভা।

কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে।

কোথাও ময়ূরে দেখে পাখা প্রসারিয়া
বনধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া।
নদী তীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।

দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে যায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়।

এই শিশুই পরবর্তীকালের হাস্যরসে মধুময়, অনুপম নাটিকা ও কবিতাবলীর রচয়িতা 'সুকুমার রায়'। তবে সুকুমারের সকল রচনার মর্মকথা শিশুদের বোধগম্য হওয়া সহজ নয়। এ বিষয়ে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

তৃতীয় বর্ষে একটি সংখ্যায় বালকদের রচনা বিভাগে একটি কবিতার জন্য শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ মহাশয় পাঁচ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। একথা তাঁর স্মরণেও থাকতে পারে।

শাস্ত্রীমহাশয়ের পরে হেমচন্দ্র সরকার এবং তারপরে আরও কয়েকজনের সম্পাদনায় মুকুল প্রকাশিত হয়। মুকুলের একটি পরিচালকমণ্ডলী ছিলেন কিন্তু সম্পাদকমণ্ডলী ছিলেন না।

২২ ॥ মুকুলের পর বঙ্গাব্দ ১৩০৩—খৃঃ অঃ ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত

গুরুপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'শৈশব সখা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার কথা জানা যায়।

১৩॥ তারপর চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের ১লা বৈশাখ —১৮৯৮খৃস্টাব্দে—প্রকাশিত হয় 'অঞ্জলি' নামক শিক্ষা-বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন রাজেশ্বর গুপ্ত।

কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথমে সম্পাদকের 'নিবেদনে' আছে :

> প্রায় চারি বৎসর হইল, অঞ্জলির অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন সংকল্পিত সময়ে 'অঞ্জলি' প্রকাশ করিতে পারি নাই।

কিন্তু অনুষ্ঠানপত্র ও পত্রিকা এক নয়। কাজেই পত্রিকাখানি ১৮৯৮ খৃঃ অব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল বলা যায়। প্রথম সংখ্যার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদক পত্রিকাখানি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখছেন :

> এইখানি শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক-বালিকা-দিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ।...আমি একাকী এই ব্রত উদ্‌যাপন করিব বলিয়া গ্রহণ করি নাই এবং করিতে পারিব বলিয়াও মনে করি না। সকলের সমবেত চেষ্টা না হইলে একটি সামান্য পিনও প্রস্তুত হয় না। ইত্যাদি।

অতঃপর ভাদ্র সংখ্যার নামপৃষ্ঠা থেকে লেখা হোতে থাকে 'মাসিক পত্র ও সমালোচনা'। বস্তুত তখন থেকে প্রতি সংখ্যাতেই মৃদু সমালোচনা থাকতো। একবার ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'উড়িয়া বর্ণলিপি' সম্বন্ধে তাঁর যে নিজস্ব মত তাঁর বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় তা বেশ যুক্তি ও প্রামাণ্য গ্রন্থের উক্তি দিয়ে নস্যাৎ করা হয়েছিল।

পত্রিকাখানির 'প্রাণ' ছিল বালক-বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা। বলতে দুঃখ হয় এই 'প্রাণ' ছিল কঠোর। কারণ দু'-একটি গল্প ও একটি মাত্র কবিতা ছাড়া আর সবই ছিল শুষ্ক প্রবন্ধ। আবার প্রবন্ধাবলীর বিষয়ও ছিল এমন যে, তার প্রতি সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের সাধারণত কৌতূহলের অভাব দেখা যায়। জানি না

তখনকার বালক-বালিকাদের কাছে পত্রিকাখানি কতটা প্রিয় হয়েছিল। মনে হয়, পত্রিকাখানি তাদের চেয়ে তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক-গণেরই উপযোগী হয়েছিল বেশি। তাঁদের প্রতি বহু উপদেশ এবং বাংলার শিক্ষাবিভাগের বহু সংবাদ এতে প্রকাশিত হোত, তবে কোনটাই গুপ্ত সংবাদ নয়।

আমরা বৈশাখ থেকে চৈত্র, এক বৎসরের বারোখানি সংখ্যার যে সমষ্টিবদ্ধ গ্রন্থ দেখেছি তাতে প্রবন্ধ লেখকগণের নাম জানবার সুযোগ পাই নি। কারণ তার সূচীও নেই, প্রবন্ধের উপরে বা নিচে কারও নামও দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, পত্রিকাখানি সচিত্র ও সুরুচির পরিচায়ক ছিল না। এতে 'তত্ত্ব খবর' ও নানা কথায় তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করা হোত। আবার, পৃথক প্রবন্ধাবলীও থাকতো। 'তত্ত্ব খবর' অনেকটা ছিল আজকালকার সাধারণ জ্ঞান-বিষয়ক অনুচ্ছেদের মতো। 'নানা কথায়' স্বদেশের ও বিদেশের বহু ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুচ্ছেদ থাকতো।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'চীন পরাধীন-পরতার পরিণাম' নামক একটি প্রবন্ধে চীনের মহান ঐতিহ্যময় অতীত সম্বন্ধে ও তার দুরবস্থার কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং উপসংহারে চীনকে আহ্বান করে বলা হয়েছে :

> নব বিজ্ঞানালোকে জাগরিত হও, বাতগর্ভ অভিমান দূর কর, যাহা দেখ নাই দেখিতে পাইবে, যাহা শুন নাই শুনিতে পাইবে। আর সে চীন থাকিবে না, নব পৃথিবীতে নূতন চীন হইবে।

সুখের কথা যে চীন আজ সত্যই মহাচীন হয়ে উঠছে।

অঞ্জলির বালক-বালিকা পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল :

> বাইরনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় পরিতোষক গানের পরিবর্তে টেনিসনের ধর্মপ্রাণ নীতিশাসনের মিষ্টতর সঙ্গীত সকল প্রাণকে সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে প্রকাশিত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবিশ্যি এরই মধ্যে দু'-একটি মরূদ্যান ও মরুকুসুমও যে না আছে তা নয়। যেমন,

একদা এক দেবী মানবী ধূলি ধূসরিত একটি শিশুকে যত্নপূর্ব্বক কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতেছেন—

সোনার বেনে সোনার বেনে
সোনার জানে মূল।
অন্ধের দুয়ারে সোনা রাঙ সমতুল ॥ ···

কবিতাটি শেষ হইলে ধূলি ঝাড়া শেষ হইল।

২৪ ॥ অতঃপর বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের শ্রাবণে—১৮৯৮ খৃঃ অঃ—প্রকাশিত হয় 'কুসুম'। পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন কতকগুলি ছাত্র। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানির সন্ধান দিয়েছেন ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের 'প্রয়াসের' উল্লেখ করে।

২৫ ॥ ঊনবিংশ শতকের শেষ বৎসরেই ১৩০৭ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ—১৯০০ খৃঃ অঃ—বসন্তকুমার বসু প্রকাশ করেন 'প্রকৃতি' নামক একখানি মাসিকপত্র। পত্রিকাখানির নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকতো 'Under the supervision of Students'. প্রকাশক মহাশয় পত্রিকাখানি প্রকাশের যে চারটি উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেগুলির দ্বিতীয়টির কিঞ্চিৎ পাঠেই জানা যায় ছাত্রগণের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির মহৎ সংকল্প তাঁদের ছিল। তিনি লিখছেন :

······ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করা। অধিকাংশ ছাত্রেরা বাঙ্গালা ভাষায় ভাল লিখিতে পারেন না। এ দোষ তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িতেছে—দিন দিন অলক্ষ্যে তিল তিল করিয়া তাঁহাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করতঃ মাতৃভাষালোচনার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই অসুবিধা নিরাকরণ মানসে এত মাসিক পত্রিকা সত্ত্বেও ইহার অভ্যুদয়। ···

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার আগ্রহ ও মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা তখনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল ছিল। এর কারণ প্রধানত আর্থিক। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাঙলা ভাষায় মহৎ সাহিত্য সৃষ্ট হয়। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনন্যসাধারণ প্রতিভাই তার উৎস। যাহোক, আলোচ্য পত্রিকাখানি তার মহৎ সঙ্কল্প পালনে কতখানি সফল হয় তা জানা যায় না। আর, বিদ্যালয়ের কি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পত্রিকাখানির তদারক করতো তাও অনুমানসাপেক্ষ। যদিও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করবার, তাঁদের রচনা প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে তথাপি রচনা ও রচনার বিষয় পরীক্ষা করে একথা বলা যায় যে, পত্রিকাখানি বালক-বালিকাদের উপযোগী ছিল না বা হয়ে ওঠে নি। বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকাতেই 'ধাঁধা' থাকে। প্রকৃতিরও প্রতি সংখ্যাতে এই বিভাগটি থাকতো। নিয়মাবলী পাঠেও জানা যায়, পত্রিকাখানি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্যই প্রকাশিত হোত। কিন্তু রচনা ও বিষয়বস্তু বিপরীত প্রমাণ দেয়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে শিশু-সাহিত্যে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়। তাঁর যে গ্রন্থখানি তাঁকে যশস্বী করেছে—'ঠাকুরমার ঝুলি'র কথা বলছি—তখনও প্রকাশিত হয় নি। তিনি প্রকৃতির প্রথম বর্ষের একটি সংখ্যায় বালক-বালিকাদের জন্য যে কবিতাটি রচনা করেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

আধুনিক মুর্শিদাবাদ চিত্র।

হের সখে, ওই দূরে স্তব্ধ সুনীরব
সুবিস্তৃত স্তূপাকৃতি অতি জীর্ণ শীর্ণ
অতীতের সুবিশাল কীর্ত্তির ললাম
দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধাকুল। বিষমবিদীর্ণ
বিশাল হৃদয় হতে অতীত ক্ষোভের
উঠি ভীম মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হাহাকার
মিশিছে অনন্ত শূন্যে! অতীত বৈভব,
মহান গৌরব চূর্ণ,—ব্যথা সার! ···

দক্ষিণারঞ্জনের দুটি প্রবন্ধ ও একটি গল্পও পত্রিকাখানিতে প্রকাশিত হয়। তবে সেগুলিতে 'ঠাকুরমার ঝুলি' রচয়িতার ছাপ চোখে পড়ে না।

প্রথম বর্ষেই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় বালক-বালিকাদের জন্য খগেন্দ্রচন্দ্র দেব লিখিত 'ভ্রমর' নামক উপন্যাসের কিয়দংশ পাঠে জানা যায় পত্রিকাখানি কাদের জন্য প্রকাশিত হোত এবং পাঠক-পাঠিকা ছিল কারা।

তবে প্রকাশকের কথায় এ সংবাদও পাওয়া যায়, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণও পত্রিকাখানির পাঠক ও লেখক ছিলেন। বয়স্ক-গণপাঠ্য পত্রিকায় যে তরুণেরা রচনা প্রকাশের সুযোগ পেতেন না, তাঁদের জন্যও ছিল এই পত্রিকা। সেজন্যই পত্রিকাতে মিশ্র রচনার জোট দেখা যায় বলে মনে হয়।

> ভ্রমরের কিয়দংশ···কন্যা দেখিয়া রামবাবু ও তদীয় বন্ধুগণ প্রীত হইলেন। এবং সেই স্থানেই পুত্রের বিবাহ দিবেন, এইরূপ আশা দিয়া যাইলেন। কিয়ৎ দিবসের মধ্যে ঘটক মহাশয় একখানি ফর্দ্দ লইয়া নরেন্দ্র বাবুকে দিলেন। ফর্দ্দখানি পাঠ করিয়াই তাঁহার সমস্ত আশাভরসা দূর হইল। ইহার কারণ এই যে, ফর্দ্দখানি আধুনিক প্রথানুসারে লিখিত। পাঠকবর্গ! বুঝিতে পারিয়াছেন কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে একবার ফর্দ্দখানি পাঠ করিয়া দেখুন।—স্বর্ণ ১০০ ভরি, রৌপ্য ৩০০ এবং নগদ ৪০০০৲ টাকা! এতদ্ভিন্ন রদারাম মেকারের ঘড়ি, ঘড়ির চেন, খাট, বিছানা, তৈজস প্রভৃতি। কেহ যেন আশ্চর্য্য হইবেন না; আজিকালি পাঁঠাবিক্রেতাদের চাপরাস-যুক্ত পাঁঠার দর এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। কতদূর যে স্থির হইবে তাহা ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে নিহিত।···

প্রকৃতিতে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকেরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সকল রচনা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-গণের যোগ্য ছিল না। রচনাগুলি সম্ভবত তাঁরা তাঁদের জন্য লেখেননি।

রামমোহন রায় ॥ পৃষ্ঠা ৩৭ ॥

শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকার মধ্যে প্রথম প্রকৃতিতেই কয়েকজন মুসলমান লেখকের রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন কবি মোজাম্মেল হক ও আবতুল করিম। করিম সাহেবের প্রবন্ধ কয়টি ছিল গবেষণামূলক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের পত্রিকাগুলি অপেক্ষা প্রকৃতি বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য প্রদর্শন করতে পারে না। সেগুলিরই প্রদর্শিত পথে প্রকৃতিতে কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও ধাঁধা প্রকাশিত হোত। তবে পত্রিকাখানি কথোপকথনের মাধ্যমে একটি ধারাবাহিক নীতি-আলোচনার মধ্যে মধ্যে ভাবসমৃদ্ধ প্রচুর ইংরেজী উদ্ধৃতিতে সকলকে অতিক্রম করে। মনে হয়, সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণকে লেখক 'এথিকস্' শিক্ষা দিতে উৎসাহী হন। আর, সমগ্র পত্রিকার রচনা বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রকাশক মহাশয়ের পত্রিকা প্রকাশের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। তথাপি পত্রিকাখানি চার বৎসর জীবিত থাকে। পত্রিকাখানি প্রকাশিত হোত কলকাতায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত উপরোক্ত পঁচিশখানি পত্রিকার কথাই এ পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি।

এইগুলিকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বাংলার বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্য রচনারও সূত্রপাত হয় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের প্রচেষ্টায়। তবে এই মহৎ কর্মে তাঁরা আমাদের দেশের জনকয়েক মনীষীর সহযোগিতা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ও ছিলেন। 'দিগ্দর্শন' যে একখানি সাময়িক পত্রিকা ছিল তার নামপৃষ্ঠা দেখে তাতে আর সন্দেহ করা চলে না। এই পত্রিকায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেগুলির অধিকাংশই রাজা রামমোহন রায়ের রচনা বলে কারও কারও ধারণা। এই সকল নিবন্ধ পরে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে খৃস্টান স্কুল বুক সোসাইটি 'বঙ্গ বিদ্যালয়ের' ছাত্রগণের জন্যে 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামে গ্রন্থে

প্রকাশ করেন। 'বঙ্গীয় পাঠাবলী'তে 'অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি', 'মকর মৎস্যের বিবরণ,' 'বেলুন', 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি নিবন্ধ ছিল। এগুলি দিগ্দর্শনের পরবর্তী সময়ে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে পত্রিকায় কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা যায়, রাজা রামমোহনও আমাদের বাংলার বালক-বালিকাগণের জন্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দানও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। [কেদারনাথ মজুমদারকৃত বঙ্গাব্দ ১৩২৪ সালে প্রকাশিত 'বাংলার সাময়িক পত্র সাহিত্য' দ্রষ্টব্য]। 'দিগ্দর্শনে'র ভাষাকে কেউ কেউ বালক-বালিকাগণের অনুপযোগী বলতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তখন বাঙলা গদ্যেরও শৈশব। এখনকার মতো তা সুগঠিত সমৃদ্ধ সাবলীল হয়ে ওঠে নি। আর এই গদ্য রচনা ছিল ইংরেজীর অনুবাদ। ভাষার শব্দভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ না হোলে রচনা কি মৌলিক কি অনুবাদ সাবলীল হোতে পারে না।

কোনও দেশের শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে শিশু-সাহিত্যও রচিত হোতে থাকে। আমাদের বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই ১৮১৭ খৃস্টাব্দে, ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। আর, তারপর থেকেই বাংলার বালক-বালিকাগণের জন্য নানা গ্রন্থ রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, সে সকল গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। কিন্তু যাঁরা বলেন, বাংলার তখনকার শিশু-সাহিত্য কেবল পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁদের ১৮১৮ খৃস্টাব্দের 'দিগ্দর্শন', ১৮২২ খৃস্টাব্দের 'পশ্বাবলী' ও তৎপরবর্তীকালের সাময়িক পত্রগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই পাঠ্যপুস্তকের নিগড়ের বাইরেও বাংলার শিশু-সাহিত্য রচিত ও পুষ্ট হোতে থাকে। কাজেই দেখা যায়, বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যের বয়ঃক্রম প্রায় দেড় শতাব্দী। উইলিয়াম কের রচিত ও ১৮১২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ 'ইতিহাস-মালা'কে বাংলার শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করলে, যা কেউ কেউ করে থাকেন, এই

সাহিত্যের বয়স আরও বৎসর কয়েক বেশি হয়। কিন্তু গ্রন্থ ধরে কোনও দেশের সাহিত্যের বয়স নির্ণয় যুক্তিসঙ্গত নয়। এক সময়ে সাহিত্য মুখে মুখেও সৃষ্ট ও প্রচারিত হয়েছে। বাংলার রূপকথা ও ছেলে-ভুলানো, ঘুম-পাড়ানো ছড়াগুলি এই শ্রেণীর। এগুলির কিছু কিছু মুদ্রণ হয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে— তার পূর্বের খবর আমাদের জানা নেই— অথচ এগুলি বয়সে অতি প্রাচীন।

রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে ;

না জানি কোন নদীর ধারে।
না জানি কোন দেশে
কোন ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।

কিন্তু,

ছেলে ঘুমুলো
পাড়া জুড়ুলো
বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে—

এই আকুলতা ভরা ছড়াটির বয়স আন্দাজ করা সম্ভব। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এটির উদ্ভব পল্লী বাংলায় বর্গী-হাঙ্গামার ফলে। বর্গীর হাঙ্গামা হয় বাংলার নবাব আলীবর্দীর সময়ে ১৭৪০ খৃস্টাব্দের পর। তবে সকল ছড়া শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং সকল রূপকথা তাদের আনন্দ দানের জন্য রচিত এমন কথা উভয় সাহিত্য বিচার করে বলা যায় না। এগুলি বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত।

অনেকের একটা ধারণা আছে, বাংলার শিশু-সাহিত্য শিশুদের মতোই নিতান্ত স্বল্পবয়স্ক এবং এই সাহিত্য বিংশ শতাব্দীতে কোনও একজনের একক প্রচেষ্টায় বা কোনও একটি পরিবারের মিলিত যত্নে, শ্রমে ও প্রতিভায় সৃষ্ট হয়ে সেখানেই শেষ হয়েছে। সেখানেও

বাইরের বহুর যোগ ছিল। কিন্তু বাংলার শিক্ষা ও শিশু-সাহিত্যক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী অন্যরূপই প্রমাণ দেয়। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা বাংলার শিশু-সাহিত্যের যে সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল রূপ দেখি তাও গঠন করেছেন একজনে নয়,—নানা জনে। বাংলার শিশু-সাহিত্য বাংলার বিরাট জাতীয় সাহিত্যেরই একটি অংশ। সে সাহিত্যের যেমন প্রাণ ও গতি আছে, এতেও তেমনি তা পরিপূর্ণ-ভাবেই বর্তমান।

কিন্তু নিছক আনন্দদানই তখনকার সাহিত্য রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ছিল না একথা আমরা একাধিক পত্রিকার সম্পাদক বা প্রকাশকের কথায়ও জানতে পারি। পত্রিকাগুলির প্রায় সকল রচনা ছিল শিক্ষামূলক এবং সেগুলি যাতে সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তগ্রাহী হয় সেই উদ্দেশ্যে সরস করা হোত। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও নীতিকথা ছিল প্রায় সকল পত্রিকার বিষয়বস্তু। কিন্তু সকলগুলিই গল্পের ছাঁচে রচিত। আর, নীতিকথা তো ছিল নীতিগল্প। সকল পত্রিকারই উদ্দেশ্য ছিল পাঠক-পাঠিকার নৈতিক চরিত্রগঠন ও শিক্ষাপ্রদান। তখনকার শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলিতেও তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র ‘গ্রন্থ-প্রসঙ্গে’ আলোচনা করেছি।

এই সকল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা অনেকক্ষেত্রেই ছিলেন একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, বাইবেল ট্রাক্ট সোসাইটি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পত্রিকাগুলি কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় মতের বাহন ছিল না। দেশে যে নূতন শিক্ষার, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হচ্ছিল সেগুলিতে ছিল তারই প্রতিফলন। তবে দু’-একখানি পত্রিকা সে পথ গ্রহণ করে নি, যেমন বারাণসীর ধর্মামৃত যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত ‘সুনীতি’ ও পাদ্রি জে. ই. পেন সম্পাদিত ‘বাল্যবন্ধু’। এই দুটি মাসিক পত্রিকা ছিল কর্তৃপক্ষের স্ব স্ব মত প্রচারের বাহন। কিন্তু ঈশ্বরে বা দেব-দেবীতে বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে অসম্ভব অতিপ্রকৃত কাহিনীর আশ্রয় কেউই গ্রহণ করেন নি। বুদ্ধি ও সাহস সঞ্চারের অজুহাতে কোনও

পত্রিকায় 'থ্রী্লার' প্রকাশিত হোত না। মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকার প্রমাণস্বরূপ পরলোকবাসীদের কার্যকলাপ কাহিনীও কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হোত না। বরং ভৌতিক ব্যাপার যে অলীক তা বোঝাবার চেষ্টা দেখা যায়। কবি বিহারীলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ সে চেষ্টা করেন। অথচ সে যুগে আজকালকার মতো শিক্ষার প্রসার ছিল না!

বাংলা দেশের ছাপাখানা ও গদ্য সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সাময়িক পত্রিকাও মুদ্রণে ও রচনায় উন্নত হয়। চিত্রগুলি উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এবং মধ্যভাগেও ইংরেজ চিত্রকরগণ কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু নব্বই সালের পর দু'-একখানি চিত্রকোণে 'প্রিয়নাথ কর্মকারে'র নামাঙ্কিত দেখা যায়। এই শতাব্দীর শেষ ভাগেই বাংলার কৃষ্টিতে যাঁদের দান অমূল্য তাঁদের মধ্যে অনেকে যিনি যে বিষয়ের চর্চা করতেন, সেই বিষয়ের রচনায় এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম থেকেই বিজ্ঞান ছিল পত্রিকার অন্যতম প্রধান বিভাগ। সেই সঙ্গে থাকতো দেশের ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিচয়। ভারত-সীমার ওপারেও যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে সে সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে থাকতো বিদেশের সংবাদ, কাহিনী ও প্রবন্ধ। কিন্তু সবই ছিল শিক্ষামূলক—Art for art's sake-এর পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। আবার, কোনও মতবাদ মন্দ ও অকল্যাণকর বা কোনও মতবাদ উৎকৃষ্ট ও মঙ্গলের তা বোঝাবার প্রচেষ্টাও আমরা দেখি না। বরং সুস্থ মানবতা বোধ, মানুষের প্রতি মমত্ব, মানুষকে যথোচিত মর্যাদা দানের এবং এই বিশাল পৃথিবীর বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদরাজ্যের যে আমরা একটি অংশ এই বোধ জাগাবারই ছিল সাধু প্রচেষ্টা। পাঠকের কল্পনা ও প্রজ্ঞাকে জাগ্রত করা পত্রিকাগুলির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তবে সকল পত্রিকাই যে বিষয়বস্তু ও রচনায় শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী হয়েছিল প্রমাণ-দৃষ্টে তা বলা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'সখা ও সাথী', 'বালক' ও 'মুকুলে' বাংলার শিশু-সাহিত্যের কতকগুলি স্থায়ী সম্পদ প্রকাশিত হয়।

আমাদের কালে, এই বিংশ শতাব্দীতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বহু উপন্যাস, গল্প, নাটক ও কবিতা প্রথমে সাময়িক পত্রেই প্রকাশিত হয়ে বাংলার শিশু-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। ভাবীকালেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই আয়ু ছিল তিন বৎসরের মধ্যে। যে কয়খানি তারও বেশিকাল জীবিত ছিল, সেগুলি মাসিক পত্রিকা—পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক নয়। কারণ বালক-বালিকাপাঠ্য পত্রিকা ও সাহিত্যের আয়ু সম্পূর্ণ তাদের রুচির উপর নির্ভরশীল নয়। তাদের আর্থিক সামর্থ শূন্য। এগুলি অভিভাবক-গণের রুচি, বিচার, শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ ও আর্থিক সঙ্গতিরই মুখাপেক্ষী। আজকাল পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভের একটা সুযোগ ঘটেছে। তবে সকলের সে সৌভাগ্য হয় না। কারণ, এর মূলে প্রধানত রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ—যেমনটি সেকালে ছিল না।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যেমন একালে, তেমন সেকালেও বালক-বালিকাদের পাঠ্য সাময়িক পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণত ৮।৯ বৎসরের শিশুদের উপযোগী ছিল না। বিষয়বস্তু, রচনা ও ভাষায় সেগুলি ছিল কিশোর-বয়স্কগণের উপযোগী। তবুও সেগুলি ছিল শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত।

একালের পত্রিকাগুলি ও সেকালের পত্রিকাগুলি তুলনা করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের মহৎ প্রচেষ্টাই সাময়িক পত্রিকা-জগতে বিংশ শতাব্দীকে পথের নির্দেশ, জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করেই একালের সুন্দর পত্রিকাগুলি প্রস্তুত হয়। অবিশ্যি ধাতুপত্রে ব্লক নির্মাণে, মুদ্রণ ব্যাপারে, রকমারি কাগজ প্রস্তুত করণে বিংশ শতক গত শতকের চেয়ে অনেক অগ্রসর। আবার, একালে বহু চিত্রশিল্পীর উদয় হয়েছে। এ সকলের সাহায্যে ও বিদেশের উদাহরণ-দৃষ্টে পত্রিকাগুলি সেকালের চেয়ে অনেক সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে বটে। তবে সেকালে কিশোরদের জন্য 'দৈনিক' প্রকাশের চেষ্টা কেউ করে নি। পৃথিবীর কোনও দেশে তখনই

তার দৃষ্টান্ত ছিল না। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধের প্রায় শেষ ভাগে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে একটি প্রগতিশীল বৈদেশিক রাষ্ট্রে তার আবির্ভাব হয়। আমাদের বাংলাতে সামাজিক ব্যাপারে সেরূপ কিছু না ঘটলেও চিন্তাধারায় কিছুটা বৈপ্লবিক ভাবের ফলে সাময়িক পত্রিকা-জগতে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণের চেষ্টা হয়েছিল ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'কিশোর' নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশে। কিন্তু প্রতিকূলতার দরুন পত্রিকাখানি স্থায়ী হতে পারে না।

ইউরোপের সংস্পর্শে উনবিংশ শতকে বাংলার জাতীয় জীবনে নবজাগরণ আসে, বাংলার সংস্কৃতিতে নূতনের আবির্ভাব হয়। তারই অন্যতম স্বাভাবিক ফল শিশু ও কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কপাঠ্য নানা ধরনের পত্রিকার প্রকাশ। এই যুগটিকে যথার্থই বলা হয় বাংলার স্বর্ণযুগ। এই যুগের স্বর্ণালোকেই বাংলার শিশু-সাহিত্যেরও একটি শাখা পুষ্পিত ও অপর শাখাগুলি মুকুলিত হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দী

॥ ১৯০৭ খৃঃ অঃ—১৯১৮ খৃঃ অঃ ॥

২৬॥ এই প্রকৃতির অন্তর্ধানের পর মনে হয় ছয় বৎসরের মধ্যে আর কোনও শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। অতঃপর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে (১৩১৪ বঃ অঃ, কার্তিক) 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'ও 'প্রকৃতি' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানির রচনাবলী মোটের ওপর উৎকৃষ্ট না হোলেও বালক-বালিকাদের উপযোগী ছিল এবং কয়েকটি নূতন বিভাগ ছিল যা বিংশ শতাব্দীর আলোচ্য পত্রিকাগুলিতে দেখা যায় না। পত্রিকাখানির লেখকবৃন্দের মধ্যে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ও মাইকেল-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। বালক-বালিকাদের কাছে বস্তুর পরিচয় দানোদ্দেশ্যে যোগেশচন্দ্র 'চীনী', 'ডাইল-ভাত' 'ঝড়-বাদল' 'ভূমিকম্প' ও 'বেলীফুল' নামে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক রচনা লেখেন। সকল বয়সের পাঠক-পাঠিকার কাছেই বৈজ্ঞানিক গল্পের আদর। কিন্তু সত্যকারের বৈজ্ঞানিক গল্প রচিত হয় অল্পই। রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক না হোলে, তাঁর পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলে গল্পটির মধ্যে যথেষ্ট অলীকতা থাকে। তা সরস গল্প হোতে পারে, কিন্তু তাকে বৈজ্ঞানিক গল্প বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকতার মধ্যে কল্পনা-বিলাসিতা নেই।

পত্রিকাখানি প্রকাশিত হবার এক বৎসর পরে, কার্তিক সংখ্যায় আচার্য মহোদয়ের 'চীনী' নামক বৈজ্ঞানিক গল্পটি প্রকাশিত হয়।

চীনী

বিমল ও নিমল দুই ভাই। বিমল বড়, নিমল ছোট।

একদিন দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্ক উঠিয়াছিল। বিমল বলে, কয়লা ও জল মিলিয়া চীনী। নিমল চীনী খাইতে ভালবাসে। চীনীতে কয়লা শুনিয়া নিমলের রাগ হইল।

কার না রাগ হয়? চীনী কেমন শাদা ধবধবা; কেমন মিঠা! বিমল বলে, চীনীতে অঙ্গার!

বিমলও খাবার সময় অল্প চীনীতে তুষ্ট হয় না। মুঠা মুঠা চীনী নইলে দুই ভাইএর মনে ধরে না।

সন্ধ্যার পর হইতে দুই জনের তর্ক চলিতেছিল। রাত্রে খাবার সময় হইল। মা রুটী ব্যন্নন, এবং বিমল ও নিমলের থালায় এক এক থাবা চীনী দিয়া দুই ভাইকে খাইতে ডাকিলেন। কেহ ওঠে না। এদিকে খাবার জুড়াইয়া যায়। মা শুনিলেন, চীনীতে কয়লা আছে কিনা, এই কথা লইয়া দুই ভাইএর ঝগড়া।

মা বলিলেন, খাবার সময় রাগ করা, ঝগড়া করা, তর্ক করা ভাল নয়। যেমন তেমন করিয়া তাড়াতাড়ি ভাত ডাইল রুটী গিলিয়া ফেলিলেই খাওয়া হয় না। শুদ্ধ মনে খাইতে বসিবে, মন দিয়া খাইবে; নতুবা খাওয়াতে মন তুষ্ট হয় না। যদি চীনীতে কয়লা আছে, কালি বিমল তাহা দেখাইবে। যে কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মিটিয়া যায়, সে কথা লইয়া তর্ক কেন? দেখ দেখি, আজি কতখানি চীনী দিয়াছি।

মায়ের বিচারে নিমল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কেবল চীনী ত নয়; চীনী দিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা হয়। চীনীতে অঙ্গার বলিয়া চীনী ছাড়িতে হইলে সন্দেশ, রসগোল্লা ছাড়িতে হয়। তা পারা যায় কি?

বিমল ইস্কুলে দেখিয়া আসিয়াছিল, শিক্ষকমহাশয় চীনী হইতে কয়লা ও জল বাহির করিয়াছিলেন। কি উপায়ে

পরীক্ষাটি করিবে তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিমল খাইতে বসিল। বলা বাহুল্য, বিমল ও নিমলের কেহই থালে একটুও চীনী ফেলিয়া রাখিল না।

পরদিন সকাল হইতে না হইতে নিমল দাদাকে ধরিয়া বসিল। সেদিন রবিবার। ইস্কুল যাইবার তাড়াতাড়ি নাই। রাত্রে বিমল বুদ্ধি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সে একটা পিতল বাটীতে চীনী রাখিয়া গন-গনা আঙগারার উপর বাটীটি চাপাইয়া দিল। পিতলবাটীর মুখে একটা পাথর বাটী চাপা দিল। নিমল এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

সবাই জানে আগুনে চীনী গলিয়া যায়, পরে লাল হয়, পরে কয়লার মত কাল হয়, শেষে কয়লাই হয়। উপরের পাথরের বাটীতে জল জমিয়া যায়।

যখন ধুঁআ বন্ধ হইল, তখন বিমল বাটী নামাইয়া নিমলকে দেখাইল। নিমলের মুখ দিয়া কথা সরিল না। নিশ্চয় তাহার হারি। তবু সে বলে, বাটীতে কয়লা নয়।

কি তবে? বিমল বাটীর একটু কয়লা আগুনে ফেলিল। সেটা পুড়িয়া গেল। জলে একটু ফেলিল। সেটা জলে মিশিল না। তবে সত্য সত্যই কয়লা!

চোখের সামনার ঘটনা মিছা বলিবার যো নাই। নিমল ভাবিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! কয়লা ও জল মিলিয়া চীনী?"

রচনাটি বৈজ্ঞানিক গল্প। এই থেকে দেখা যায়, আচার্য যোগেশচন্দ্র বাংলার বালক-বালিকাদের জন্য গল্পও রচনা করেছিলেন। চিনি যে কয়লা ও জলের মিলনে তৈরী তা অনেক বয়স্কেরও জানা নেই।

প্রকৃতির নূতন বিভাগ দুটির মধ্যে একটি 'আমাদের দেশের কথা', অপরটি 'স্বাস্থ্য-রক্ষা'। আমাদের দেশের কথায় বাংলা দেশ ও ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া হোত, আর স্বাস্থ্য-রক্ষায়

বালকবন্ধু।

বালক বন্ধু।

'বালকবন্ধু' পত্রিকার প্রতিলিপি

দেওয়া হোত ধারাবাহিক ভাবে স্বাস্থ্যবিধিপালনের উপদেশ। এই বিভাগটি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম দেখা যায় 'বালক-বন্ধু'তে। বালক-বন্ধুকে অনুকরণ বা অনুসরণ করে পরবর্তীকালের কয়েকখানি পত্রিকা। তবে প্রকৃতির স্বাস্থ্য-রক্ষা বিভাগটির রচনা গুরু-চণ্ডালী দোষে দুষ্ট।

প্রকৃতির আরও একটি বিভাগ ছিল, ছবি দেখে গল্প রচনা বা ছবিখানির পরিচয় লেখা যা আর কোনও পত্রিকায় পূর্বে বা পরেও দেখা যায় নি। ঐগুলি ছাড়া অন্যান্য বিভাগগুলি ছিল পূর্ববর্তী পত্রিকারই অনুসৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কীট-পতঙ্গ ও প্রাণী-পরিচয়, কবিতা, ছোটবড় গল্প, ভ্রমণকাহিনী ও ধাঁধা। দু'-তিনটি নাটকও ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রকৃতিতে জীবেন্দ্রকুমার দত্তের অনেকগুলি কবিতা ও কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কতকগুলি গদ্য-পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। আর প্রকাশিত হয় দীনেশরঞ্জন দাসের কয়েকটি কবিতা ও গদ্য রচনা। ইনিই 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিনা জানি না। প্রকৃতি আট বৎসরেরও অধিককাল জীবিত ছিল।

২৭॥ ১৯১০ খৃস্টাব্দে (১৩১৭ বঙ্গাব্দে) অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ঢাকায় প্রকাশিত হয় 'তোষিণী' নামে একখানি সচিত্র শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র। পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা আমাদের হাতে আসে নি, ২য় সংখ্যা থেকে ৫ম সংখ্যা পর্যন্ত দেখার সুযোগ ঘটেছে। পত্রিকাখানির প্রচ্ছদপটে চারিচরণের এই পদ্যটি মুদ্রিত থাকতো :

তুষিতে শিশুর মন আমি গো তোষিণী
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মাসে মাসে আসি
কহিব বিচিত্র কত কবিতা কাহিনী,
উপহার দিব আর ছবি রাশি রাশি।

তোষিণীর উদ্দেশ্য কতকাংশে সফল হয়। বিষয়বৈচিত্র্যে পূর্বের পত্রিকাগুলিকে অতিক্রম না করলেও অনেকগুলি রচনা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী ছিল। প্রতি সংখ্যাতেই এরূপ হোত। তোষিণীর জীবজন্তুর বিবরণ ও রবিনসনক্রুশোর বঙ্গানুবাদ মনোরঞ্জক

ছিল। অনুবাদটি করেন শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। তোষিণীতে কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত ও শিশু-ভারতী সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। তিনি বাংলার বালক-বালিকাগণের জন্য এ যাবৎ বহু কবিতা রচনা করেছেন। সম্ভবত তোষিণীতেই বালক-বালিকাদের জন্য তাঁর রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়।

২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় তাঁর একটি কবিতা :

দুটি উপদেশ

ছোট বড় সবা হতে লইবা শিখিয়া,
হোক না সে শিশু, মূর্খ, কৃষক-তনয়,
রতন যে জন বেচে, কি হবে খুঁজিয়া,
তার গৃহ কুলশীল বিদ্যা-পরিচয় ?
বড় যদি হও কভু সকল বিষয়ে,
ছোট হয়ো নাকো যেন কেবল বিনয়ে।
যতদিন ছোট রবে বয়সে বিদ্যায়,
বড় কথা কয়ে বড় ভেব না তোমায়।

শিক্ষক-কবি তাঁর কবিতাবলীতে কেবল আনন্দ বিতরণ করেন না, পাঠক-পাঠিকাগণের মানসিক হিত সাধনের উদ্দেশ্যও তাঁর থাকে। তাঁর অনেক কবিতার সুর এমনি উঁচু ও উপদেশমূলক।

তোষিণীর ২য় বর্ষের প্রারম্ভ থেকে দক্ষিণারঞ্জনের 'চারু ও হারু' নামক গল্পটি ক্রমশ প্রকাশিত হয়। তোষিণীতে প্রতি মাসে কিছু সংবাদও পরিবেশন করা হোত, সম্ভবত ডাকঘরের মাশুলিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই। নতুবা সে সংবাদ বালক-বালিকাগণের ভাল না লাগারই কথা। তার ওপর সংবাদ-পরিবেশনের রীতিও ছিল বৈচিত্র্যহীন। পঞ্চম বর্ষের কতকগুলি সংখ্যার প্রথমেই বালক-বালিকার রচিত একটি করে কবিতা প্রকাশিত হয়। তোষিণীর কবিতাসম্পদ মোটের উপর উৎকৃষ্ট ছিল না, যদিও কবিশেখর কালিদাস রায়,

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ও মনোমোহন সেনের কয়েকটি কবিতা এতে প্রকাশিত হয়।

একটি সংখ্যায় চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য লিখিত 'উপকথা' গল্পের দিক থেকে ভাল হোলেও রচনায় বালক-বালিকাদের উপযোগী সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে নি। ভাষা রূপকথার যোগ্য নয়। রচনাটির কিয়দংশ পাঠেই তা জানা যায়।

উপকথা

প্রাচীন সময়ে সুধর্ম্ম ও কুধর্ম্ম নামে দুইজন লোক ছিল। শৈশব হইতেই দুইজনের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল! উভয়ে একত্রে খেলা করে, একত্রে বেড়ায়, যেন দুইটিতে একপ্রাণ। এমনি করিয়া হাসিয়া খেলিয়া উভয়ের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইল। কালক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ভার নিয়া উভয়কে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। কিন্তু শৈশবের সেই ভালবাসার কথা উভয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিল না। সংসারে প্রবেশ করিয়া কুধর্ম্ম নানা কুকার্য্যে আসক্ত হইতে লাগিল, আর সুধর্ম্ম সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অত্যল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করিল। কুকর্ম্মের ফলে কুধর্ম্ম গরীব ও লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়া পড়িল এবং আপনার হীনাবস্থা ও বন্ধুর ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া ঈর্ষ্যাবিষে দিবানিশি দগ্ধ হইতে লাগিল। কুধর্ম্মের মত যাহাই থাকুক, সুধর্ম্ম কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও শৈশবের বন্ধু কুধর্ম্মকে ভুলিতে পারিল না। তাহার কোন অভাব জানিতে পারিলে সুধর্ম্ম আপনা হইতে সেই অভাব পূরণ করিয়া দিত। কিন্তু সংসারে যাহার চরিত্রবল নাই তাহার কোন স্থায়ী উপকার কেহই করিতে পারে না; ...

কথা এই, চন্দ্রকুমার নিজেই এটিকে লোকসাহিত্য বলে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। রূপকথা লোকসাহিত্য। তোষিণীতে পূর্বের পত্রিকাগুলির মতো উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, দু'-একটি নাটকও প্রকাশিত হোত।

২৮॥ এই বৎসরেই ১৯১০ খৃস্টাব্দে (১৩১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে), ঢাকায় 'সোপান' নামে আর একখানি বালক-বালিকাপাঠ্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সোপান' সম্ভবত চার বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। প্রথম বর্ষের কোনও সংখ্যা আমাদের হাতে আসে নি। আমরা তারপরের সংখ্যাগুলি দেখেছি। বিষয়বস্তুর সমাবেশে ও রচনায় 'সোপান' 'তোষিণী'র ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় নি। চিত্রশোভা, সাজসজ্জা ও চিত্তাকর্ষক ছিল না। কিন্তু বাংলার কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীর রচনা সোপানে প্রকাশিত হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনুরূপা দেবী, রবীন্দ্র-জীবনী-রচয়িতা শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীতপন-মোহন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এঁদের কেউই এখন আর বালক-বালিকাদের জন্য কিছুই রচনা করেন না। মনই সাহিত্যরচয়িতা। যাহোক, ভ্রমণকাহিনী, চরিতকথা, ছোট-বড় গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, অনুবাদ, কবিতা, ইতিহাসের গল্প, ধাঁধা ছিল সোপানের প্রকাশ্য বিষয়। গালিভারের ভ্রমণ, রাইডার হ্যাগার্ডের 'অ্যালেন কোয়ার্টার মেনে'র বঙ্গানুবাদও সোপানে প্রকাশিত হয়। আর প্রকাশিত হয় 'আত্মত্যাগ' শিরোনামায় ১৯১৩ খৃস্টাব্দের একটি ভয়ঙ্কর সংবাদ। সংবাদটি কুমারী স্নেহলতার আত্মহত্যার। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় হতভাগিনী কিশোরীটির একখানি আলোক-চিত্র। এমন সংবাদে বালক-বালিকাদের প্রয়োজন কিছু মাত্র থাকে না, প্রয়োজন থাকে তাদের অভিভাবকগণের যাঁরা সামাজিক নিয়মকানুন ভাঙেন-গড়েন ও আঁকড়ে থাকেন। কারণ, এই কার্যটির পশ্চাতে যে কারণ বিদ্যমান তার গুরুত্ব উপলব্ধির শক্তি ও তা দূরীকরণের যে সামর্থ্য তা বালক-বালিকাদের নেই। এই ধরনের সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে সম্পাদকীয় অবিবেচনাই চোখে পড়ে, যদিও ঘটনাটির সাহায্যে পিতামাতার জন্য সন্তানের আত্মত্যাগ করার উপদেশ দান করা হয়েছে। পত্রিকাখানির সম্পাদক কে ছিলেন তা জানা কঠিন। সংবাদটির কতকটা উদ্ধার করা গেল :

…শিক্ষিত বরের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে অনেক টাকা পণ দিতে হয়; প্রচুর টাকা না পাইলে শিক্ষিত ছেলেরা বিবাহ করিতে রাজী হয় না। কন্যার পিতামাতাকে তাহারা যেন বলে, 'যে যত বেশী টাকা দেয় সে যেমন বাজার হইতে তত ভাল গো-মহিষ কিনিতে পারে, তেমনি যে কনের বাপ যত বেশী টাকা দিতে পারিবে সে তত বেশী শিক্ষিত জামাই পাইবে।' কি ঘৃণার কথা! কি লজ্জার কথা! ধিক এমন বিদ্যায়! ধিক এমন শিক্ষায়!

স্নেহলতার গরীব বাবা স্নেহলতার জন্য একটি শিক্ষিত বর খুঁজিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু সে নগদ ও জিনিসপত্রে দুই হাজার টাকা চাহিয়া বসিল। গরীব মানুষ এত টাকা কোথায় পাইবে! তথাপি কন্যার সুখ ও মঙ্গলের দিকে চাহিয়া নিজের পৈত্রিক বসতবাটীখানা বাঁধা দিয়া দুই হাজার টাকা ধার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। স্নেহলতা দেখিল তাহার সুখের জন্য পিতা-মাতা চিরদুঃখে পতিত হইতেছেন। সে ইহা সহিতে পারিল না। একদিন পরিবার কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢালিয়া সে শরীরে আগুন লাগাইয়া দিল। সেই অগ্নিদাহেই তাহার মৃত্যু হইল। … —১৩২০, চৈত্র

এই মর্মান্তিক ঘটনাটি চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বের, কিন্তু এই কলকাতা শহরের একখানি প্রথম শ্রেণীর বাঙলা দৈনিকে (যুগান্তরে) এই ঘটনাটির চুয়াল্লিশ বৎসর পরেই (১৩৬৪, পৌষ) পণ-প্রথার বিরুদ্ধে একটি সুচিন্তিত ও প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ব্যবধান প্রায় অর্ধশতাব্দীর। কিন্তু বাংলায় সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে কতটুকু? অবিশ্যি সেদিনের সামাজিক আর্থিক কাঠামো আজও আছে।

ঐ সংবাদটি যেমন বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকার অনুপযোগী তেমনি ১৩১৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত জন পাউণ্ডস্ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি প্রশংসনীয় ও উপযোগী। একটি মানুষ যিনি দীন, দরিদ্র ও বিকলাঙ্গ হয়েও অন্তরের ঐশ্বর্যে যে কত উচ্চস্তরের

ছিলেন, তা রচনাটিতে প্রকাশ করে বালক-বালিকাদের অন্তরে মহৎ কর্মপ্রেরণা জাগানোর চেষ্টা হয়েছে। বিদ্যা দান সর্বাপেক্ষা মহৎ দান। জন পাউণ্ডস্ সেই মহৎ কর্মেই জীবনপাত করে বহু নিরক্ষরকে ধন্য করে গেছেন। জন পাউণ্ডস্ ছিলেন শ্রমজীবী। এই ধরনের চরিতকথা তিন চার বৎসর পরে 'সন্দেশে'ও প্রকাশিত হয়। সন্দেশে যে তিন-জন সাধারণ ব্যক্তির জীবনকথা প্রকাশিত হয় তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দরিদ্র ট্রাম কন্‌ডাকটার। সাধারণ মানুষের সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর উদাহরণ বালক-বালিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সাধারণ শ্রমিক-কৃষক সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে শৈশব থেকেই মানসিক শুচিতা ও কৌলিক উচ্চতার মনোভাব রক্ষার উদ্দেশ্যে ঘরে-বাইরে এমন ধারণা গঠন করে দেওয়া হয় যে, শ্রমজীবীদের মনুষ্যেতর জীবপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করাই স্বাভাবিক হয়ে থাকে। পরে সমগ্র জীবনেও এই ধারণার প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয় না। উপলব্ধিই হয় না যে, জীবনধারণের উপকরণগুলির গঠন ও উৎপাদন করে তারাই।

রচনাটির প্রারম্ভ এইরূপ :

> ······সোপানের পাঠক-পাঠিকাগণ! উপরে যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল, তাহার অর্থ বোধ হয় তোমরা সকলেই বুঝিতে পার। 'জন্ম হউক যথা তথা, কর্ম্মভাল লয়ে কথা।' কথা ঠিকই বটে! কেবল উচ্চ জাতিতে অথবা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিলে কেহ বড়লোক হয় না। উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গণ্ডমূর্খ ও নিষ্কর্ম্মা হইলে কেহ তাহার আদর করে না। যে সকল মহাপুরুষ নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বড়লোক কে? যে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে ভাল খায়? যে ভাল পরে? না তাহা নয়···
>
> —১৩১৮, আষাঢ়

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত ইতিহাসের গল্পেরও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল। তাঁর এই সকল রচনা 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' নামক গ্রন্থে এই বৎসরেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির ভূমিকা লেখেন আচার্য যদুনাথ সরকার।

> অনেক দিন পূর্বে গ্রীসের নগরে নগরে এক অন্ধ গান করিয়া বেড়াইতেন। অন্ধকে সকলেই চিনিত। যে বাড়ীতে তিনি যাইতেন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত আদর করিয়া বসাইত। অন্ধ বৃদ্ধ, কিন্তু তবু তাঁর কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট! তাঁহার হাতে একটি বীণা। সেই বীণার সুরে সুর মিলাইয়া তিনি গান গাইতেন। অনেক রাজবাড়ীতে তাঁর ডাক পড়িত। তখন তিনি প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া গ্রীকদের প্রাচীন কথা বীরদের গাথা গান করিতেন। এই অন্ধ কবির নাম হোমার। তিনি গাহিতেন ঃ—
>
> প্যারী ট্রয়ের রাজপুত্র। ঐ নগরটি সমুদ্রের ধারে এসিয়া-মাইনরে। এক দেবতা প্যারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন যে, ধরার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী রমণী তিনি লাভ করিবেন। গ্রীসে স্পার্টার রাজা মেনেলাস। তাঁর হেলেনা নামে পরম সুন্দরী এক স্ত্রী। মেনেলাসের গৃহ তাঁর অতুল শোভায় আলোকিত। তিনি শান্তির আধার, প্রীতির আকর। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসারটি পরিপূর্ণ; আনন্দ উৎসবে গৃহটি সর্ব্বদা মুখরিত। মেনেলাস ট্রয়রাজকুমার প্যারীর বন্ধু। বন্ধুগৃহে বন্ধু আসিলেন। হেলেনকে দেখিয়া প্যারীর মনে হইল, জগৎমাঝে এমন সুন্দরী নারী আর কোথাও নাই! হেলেনও তাঁর স্বামীর কথা ভুলিয়া গেলেন। কোলের ছোট কন্যাটির কথা একেবারে মন হইতে মুছিয়া গেল। এমনি তাঁর পোড়া-কপাল, দুরদৃষ্ট! ঈশ্বরকে ভুলিলে, প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিলে মানুষের এমনই অধঃপতন হয়। ...

শেষ ছত্রটির মর্মোপলব্ধি অপরিণত দেহ-মনা পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে সম্ভব না হোলেও রচনাটি প্রধানত সহজ ও সুন্দর। অজিতকুমার

চক্রবর্তীর 'তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ' নামক কবিতাটিরও ভাষা ও গঠন সুন্দর হোলেও শিশুমন রসগ্রহণ করে কবিতাটির প্রতি সুবিচার করতে সমর্থ হবে বলে মনে হয় না। কবিতাটির কয়েকটি স্তবক পাঠে আমাদের কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে :

(১)

এই আকাশে এই বাতাসে এই কাননে উদার মাঠে,
পৌষ কাঁপে, শ্রাবণ ঝরে, বৈশাখেতে মাটি ফাটে,
যাহার ভয়ে, যাঁর অভয়ে, ঋতুর পরে ঋতু ফোটে,
এই আকাশে, এই বাতাসে, জাগেন তিনি উদার মাঠে।

(২)

চেতনারে জ্বালিয়ে তোলেন ভোরের বেলা আলোর সনে
সেই চেতনা হরষ হয়ে ধেয়ে বেড়ায় দেহে মনে,
যতই চলি, যতই বলি, যতই খেলি শ্রান্তি যে নাই,
সেই চেতনায় তিনি আছেন তাহাতে আর ভ্রান্তি যে নাই।

(৩)

দিনের শেষে এই অতি দূর আকাশপানে দেখি চেয়ে
হঠাৎ রবি যায় রে ডুবি পূবে আঁধার আসে ছেয়ে !
সকল শব্দ যখন স্তব্ধ, তারার পাশে তারা সাজে
কোন সুগভীর বিজন লোকে শুনি পূজার শঙ্খ বাজে ? ···

—১৩৩৯, বৈশাখ

শিশুচিত্ত সাধারণত শব্দ-ঝঙ্কার ও ছন্দ-নৃত্যেই মুগ্ধ হয়, ভাবের গভীরতায় ডুব দেবার শিক্ষা তার তখনও হয় না। অপরিণত মনের স্বভাব এই। এই মনের জন্যই রূপকথা ও ছড়া। ভাবের গভীরতায় নিমগ্ন হওয়ার শক্তির ও শিক্ষার অভাব থাকলেও সে কল্পনালোকে অবাধে উড়ে উড়ে মুক্তি ও আনন্দের আস্বাদ লাভে সক্ষম।

২৯॥ তোষিণীর ও সোপানের দুবৎসর পরে ১৯১২ খৃস্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হয় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'শিশু'। পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন বরদাকান্ত মজুমদার, পৃষ্ঠপোষক

ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। 'প্রকৃতি'র মতোই 'শিশু'র সম্পাদক নিজ নামটি অন্তরালে রেখেছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকের পত্রিকাগুলির পথানুসরণ করে শিশুতেও প্রকাশিত হোত উপন্যাস, গল্প, জীবজন্তুর কথা, কবিতা, ধাঁধা ও নাটিকা। তোষিণীর মতো প্রতি মাসে কিছু কিছু বাসী খবরও প্রচারিত হোত। ইংরেজ রাজ-স্তুতি ও সরকার-তোষণটা পত্রিকার দু'-একটি সংখ্যার বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। সেজন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তোষিণীও এদিকে বেশি পশ্চাৎপদ ছিল না। স্বাদেশিকতা, দেশপ্রেম, ভারত যে পরাধীন এ কথা বোঝাবার বা শিখাবার প্রয়াস উনবিংশ শতকের ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকের পত্রিকাগুলিতে বিশেষ দেখা যায় না। শিশু ও তোষিণী কবিতা ও গল্পে পাঠক-পাঠিকাগণের মনে ঈশ্বরে ভয় জাগ্রত করবার দিকেই কিছু সচেষ্ট ছিল। সেই কারণেই শিশুর অনেক গল্প ছিল বাস্তবতাবর্জিত, অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনাপূর্ণ। একদিকে বিজ্ঞান, অপরদিকে অলৌকিকতা—এ দুটির শিক্ষা কতটা কার্যকরী হয়েছিল জানি না। সাধারণত অলৌকিকতাই বিশ্বাস্য হয়। কিন্তু শিশুর গ্রাহকসংখ্যা দশ হাজারে ওঠে এ খবর তার একটি সংখ্যার ভূমিকা থেকেই পাওয়া যায়। এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও দু'-একখানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা শিশুর পথে চলে এবং সেগুলিরও গ্রাহকসংখ্যা প্রচুর! উপরন্তু সেগুলি কিছুটা প্রচারধর্মীও বটে। এই ত্রুটি সত্ত্বেও শিশুর রচনাবলীর ভাষা ছিল খুবই সহজ, বহু কবিতা ছিল হাস্যরসে রসাল। পত্রিকাখানির জনপ্রিয়তার কারণগুলির মধ্যে এগুলিও অন্যতম বলা যায়।

রচনা যে কত সরল, কত লঘু হোতে পারে একটি গল্পের কিঞ্চিৎ পাঠেই জানা যায়ঃ

আলেয়া।

ছোট মেয়েটি—তার নাম ছিল আলেয়া। দিব্যি—ফুটফুটে জলকন্যা, তাদের বাড়ী ছিল সাগরের সেই অতল নীল

জলের মধ্যে। সে দেশে সব ঝিনুকের বাড়ী, প্রবালের কপাট, সাদা সাদা চকচকে মুক্তা বিছান রাস্তা ; সে দেশে দুঃখ নাই—কষ্ট নাই—বেশ মজার দেশ। সে দেশের লোকেরা কেবল হাসি খেলা নিয়ে থাকে ; হাসি খেলা পেলে তারা আর কিছু চায় না।

প্রবালের উপর মুক্তা দিয়ে গাঁথা—তাদের সুন্দর বাড়ীখানি তার চারধারে কত রকম বেরকমের—খুব সুন্দর—ছোট্ট ছোট্ট গাছ—সে সব গাছ মানুষে কখন দেখে নি, নামও শোনে নি। …

শিশুতেই চলিত বাঙলায় গদ্য রচনার আগ্রহ দেখা যায় পূর্বের পত্রিকাগুলিতে যা ছিল না।

বাংলা দেশের রূপকথার ভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ। একটি রূপকথাকে হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত কবিতায় রচনা করেছিলেন। হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্তের কবিতাগুলিতে ছন্দোবৈচিত্র্য ছিল না বটে কিন্তু হাস্যরস ছিল প্রচুর যা বালক-বালিকাদের সবচেয়ে ভাল লাগে। যে সকল লেখক ও কবির রচনা হাস্যরসভরা তাঁরা সকল বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের প্রিয়। দাশগুপ্ত মহাশয়ের আলোচ্য রচনাটির কিয়দংশ :

নাতনীর বাড়ীর পথে—

(৪)

ভালুক যখন হাঁড়িটারে গড়িয়ে দিল কসে,
খানিক গিয়ে থামলো যেথা শিয়াল ছিল বসে।
শিয়াল বলে, 'কে গো তুমি, বুড়ীর খবর রাখো ?
ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, আর তো এল নাকো !'
'কে জানে তোর বুড়ীটুড়ী, কে জানে তোর কে ,
হাঁড়ি আমি—বুড়ীর খবর কিছুই জানি নে !
হাঁড়ির ভিতর বসে আমি তেঁতুল চিড়ে খাই
মার দেখিনি একটি ঠেলা, কতদূর যাই ?'

(৫)

শিয়াল বলে, 'বুড়ী তুমি হাঁড়ির ভিতর থেকে,
ভাবচো মনে, আমায় যাবে ফাঁকি দিয়ে রেখে !'
শিয়াল তখন গাছের সনে ঠুকে দিতে হাঁড়ি—
দুষ্ট বুড়ী বেরিয়ে প'লো জব্দ হয়ে ভারী।

শিয়াল বলে—'এসো বুড়ী এখন তোমায় খাই !'
বুড়ী বলে—'তাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই ;
বুড়ো হয়ে গেছি, এখন মরলে পরে বাঁচি—
হেসে গেয়ে মরবো আমি—এইটে শুধু যাচি।'
শিয়াল বলে—'তাতেই রাজী—হেসে গেয়ে নাও ;
আঁচলখানা রাখবো ধরে, পালিয়ে পাছে যাও।"...

শিশুর লেখকগণের মধ্যে জনকয়েক প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্য রচয়িতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, শ্রীকার্তিক দাশগুপ্ত, শিবরতন মিত্র, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা প্রভৃতি। আর ছিলেন সুসাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গবাসী কলেজের বিখ্যাত ইংরেজী অধ্যাপক) ও কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।

'শিশু' পাঠক-পাঠিকা মহলে আদরণীয় হোলেও পাঁচ বৎসরের বেশি জীবিত থাকে না।

৩০॥ অতঃপর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্বাদে, গন্ধে সরেস 'সন্দেশ' শিশুপাঠকমহলের মনোহরণ করে। 'শিশু'র তখন দু' বৎসর বয়স, সেই সময়, ১৯১৩ খৃস্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশে'র পসরা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম দেখা দেয়। বিজ্ঞানী, সঙ্গীত-কলাবিৎ ও চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরের স্বাস্থ্য সে সময়ে ভাল ছিল না ; বয়স পঞ্চাশ বৎসর, তবুও তিনি 'সন্দেশ' প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন করে বঙ্গসাহিত্যের একটি দিক উজ্জ্বল ও সুসমৃদ্ধ করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন, যাঁদের রচনায় শিশু ও কিশোরবয়স্ক পাঠকগণের চিত্ত জ্ঞানে ও আনন্দে ভরপুর হোত তাঁদের মধ্যে কেউ তখনই, কেউ বা পরবর্তীকালে বঙ্গসাহিত্যে ও শিল্পকলায় অমরতা লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য যোগেশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় (চৌধুরী), বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (এঁর লেখনী নাম ছিল 'মেজদাদামশায়'), সুখলতা রাও, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়,

শ্রীকার্তিক দাশগুপ্ত, স্বভাবকবি সুনির্মল বসু, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, কুলদারঞ্জন রায়, শ্রীসীতা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি অনেকের রচনায় 'সন্দেশে'র সংখ্যাগুলি মনোহর হয়ে উঠতো। কিন্তু সন্দেশের প্রথম দু' বৎসরের অধিকাংশ রচনা উপেন্দ্রকিশোরের। সন্দেশের তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের পরিচালনায় সন্দেশ প্রকাশিতে হোত। তাঁর লোকান্তর গমনের পর তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র বিজ্ঞানী, শিল্পী ও কবি সুকুমার রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবি সুকুমার রায়চৌধুরীর অকালে লোকান্তর ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যমপুত্র সুনিপুণ শিশু-সাহিত্য রচয়িতা সুবিনয় রায়চৌধুরী সন্দেশের সম্পাদক হন। সন্দেশের প্রথম পর্যায় সুবিনয় রায়চৌধুরীর সম্পাদনা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়—'নবপর্যায়'— প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খৃস্টাব্দে, প্রথম পর্যায়ের পাঁচ বৎসর পরে। এই পাঁচ বৎসর কাল পত্রিকাখানি বন্ধ ছিল। নবপর্যায়ে সম্পাদক ছিলেন একা সুবিনয় রায় (চৌধুরী)। তৃতীয় পর্যায়ে রায়চৌধুরী পরিবারের হাতে পত্রিকাখানি থাকে না। সম্ভবত এইখানেই রায়-চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে পত্রিকাখানির সম্পর্ক শেষ হয়। আমরা প্রথম পর্যায়ের খণ্ডগুলি দেখেছি।

সন্দেশের বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব ছিল না। পূর্বের পত্রিকাগুলির মতোই উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, ছড়া, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, জীবজন্তুর বৃত্তান্ত, একরঙা বা রঙিন চিত্রাবলীও ধাঁধা প্রকাশিত হোত। কিন্তু রচনায়, পরিবেশনে, সাজসজ্জায়, ছাপায় সন্দেশ ছিল অতুলনীয়। ছবিগুলি সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত হোত যা পূর্বের ছবিগুলিতে দেখা যায় না। বিজ্ঞান, রসসাহিত্য ও চিত্রশিল্প—এই তিন মিলিয়ে নিপুণ হাতে সন্দে তৈরি হোত। রচয়িতাগণ শিশু ও কিশোরদের মন বুঝতেন। সকল রচনার জন্ম হোত তারই পরিপ্রেক্ষিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের মুকুল যেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সন্দেশে প্রস্ফুটিত হয়ে বাংলা দেশ আমোদিত করেছিল।

পূর্বেই বলেছি উপেন্দ্রকিশোর নানা গুণে গুণী ছিলেন। তৃতীয় বর্ষে পৌষমাসে তাঁর পরলোক গমনের পর মাঘ সংখ্যার একটি রচনায় তাঁর মূল্যায়ন করা হয়। তাই থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা গেল :

> তোমরা তাঁহাকে না চিনিলেও তিনি তোমাদিগকে—বাঙলার সকল বালক-বালিকাকে—শিশুদের মনটিকে, বেশ চিনিতেন। তাই যেটি বলিলে এবং যেমন ভাবে বলিলে, তোমরা বুঝিবে, তোমাদের মনের মত হইবে, তোমাদের প্রতি গভীর স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বহু পরিশ্রম ও যত্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিপুণতা প্রয়োগে তোমাদিগকে শিক্ষা ও আমোদ দিতে, তোমাদিগকে 'ফূর্তি' দিয়া ভাল করিতে তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

এর মধ্যে অত্যুক্তি নেই। তিনি প্রতিভাবলে বঙ্গসাহিত্যের অশেষ উপকার করে গেছেন। যখন ষোলো-সতেরো বৎসরের কিশোর তখনই তাঁর কতকগুলি রচনা 'সখা'য় প্রকাশিত হয়। আজও তাঁর গদ্য-রচনা 'ছেলেদের মহাভারত' ও 'টনটুনির গল্প' ইত্যাদিতে বাংলা দেশে প্রচলিত। তাঁর কবিত্ব শক্তিও কিরূপ ছিল তা নিচের কবিতাটি থেকে জানা যাবে :

ছোট বলি কারে ?

ছোট বলি ঘৃণা করি রাখি যারে দূরে—
কাল সে উঠিতে পারে সবার উপরে।
নাহি জানি জীবনের কোন্ পথ দিয়া,
বিধাতা আনেন তারে সুন্দর করিয়া।
জ্ঞান প্রেম লভি কত শুভ ইচ্ছা লয়ে,
সে রহে তাঁহারি কাজে চিরমগ্ন হয়ে।
ফুটন্ত ফুলের মত ফুটিয়া ধরায়,
গুণের সৌরভ সেও জগতে ছড়ায়॥

—২য় বর্ষ, ১৩২১, আশ্বিন

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের চিন্তাধারা থেকে এ চিন্তা কতদূর অগ্রসর! শ্রেণীধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই মানুষের মর্যাদা দিতে, সকলেরই মধ্যে মানবীয় সদ্গুণের স্বীকৃতি দিতে এই আহ্বান।

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) শিশু-সাহিত্যের পৃথক সত্তা স্বীকার করেন নি। কিন্তু সন্দেশ থেকে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি কোন সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত ?

আষাঢ়ে ছড়া

এ বুঝি আষাঢ় মাস
তাই ছুটে চারি পাশ
শুধু করে হাঁস-ফাঁস
পূবের বাতাস।

কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেটফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
জুড়িয়ে আকাশ ॥

হাতির মতন ধড়,
নাহি তাহে নড়চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়
চারিদিক ছেয়ে।

এত হল অন্ধকার
দিবারাত্রি একাকার
পাখী সব চীৎকার
করে ভয় খেয়ে।

দু' হাত না চলে দৃষ্টি
ধুয়ে পুঁছে সব সৃষ্টি
অবিরাম ঝরে বৃষ্টি
ঝর ঝর ঝরে।

দেখে ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেঙচায় মুখ,
বিদ্যুতের সবটুক
জিভ বার করে ॥

গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে,
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের।

শিউলি ভুঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকা ফুলের।

মেঘেদের হুড়োহুড়ি
শুনে যত বুড়োবুড়ি
জ্যেঠা-জ্যেঠি, খুড়ো-খুড়ি
ভয়ে মরে আজ।

কখন সড়াৎ করে,
অথবা হড়াৎ করে,
বেজায় কড়াৎ করে
শিরে পড়ে বাজ ॥

ছেলেপিলে মহানন্দ,
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ,
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব
মহাতাল ঠুকে।

পা ছড়িয়ে নারীকুল,
উনুনে শুকোয় চুল,
দু' নয়ন বাষ্পাকুল,
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে ॥

চিল খায় ঘুরপাক
ডালে বসে কাঁপে কাক,
আকাশেতে বাজে ঢাক
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।
সারস মেলিয়া পাখা
নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা,
ময়ূর ধরেছে কেকা,
গায় কোলা ব্যাঙ॥

হাঁস, রাজা আর পাতি,
খালে বিলে সার গাঁথি,
ফুলিয়ে বুকের ছাতি,
হেসে ভেসে চলে।
ব্যাঙদের মকমকি,
বিদ্যুতের চকমকি,
দেখে শুনে বকবকি
এক পায়ে টলে॥

মাতিয়া বরষা রসে,
ভাঙাগলা মেজে ঘসে,
কোন যুবা ভাঁজে কসে,
সুরট-মল্লার।
কেহবা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে,
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদ কহ্লার॥

বলি শুন, ওহে বর্ষা!
আবার যে হবে ফর্সা
এমন হয় না ভর্সা,
—না হয় না হোক!
তোমার ঐ রঙ কালো,
তোমার ঐ রাঙা আলো,
তার বড় লাগে ভালো,
যার আছে চোখ॥

—আষাঢ়, ১৩২১

সন্দেশের বিস্তর রচনা উদ্ধারযোগ্য। কিন্তু সকলগুলিই নয়-দশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক-বালিকাদের উপযোগী ছিল না। অবিশ্যি কবিতাগুলি সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। অনেক কবিতা ছিল, নয়-বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক-বালিকাদের উপযোগী। বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য পত্রিকার মতোই সন্দেশেরও অনেক গল্প অনুবাদ, ভাবও বিদেশী।

সন্দেশের একটি সংখ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন :

মুক্ত

সংসার সরসী মাঝে আমি যেন পানা
মূল নাহি বাঁধা নহি
সর্ব্বদা স্বাধীন রহি,
যথা ইচ্ছা ভেসে যাই নাহিক ঠিকানা।

প্রভুর যেদিন ইচ্ছা লবে মোরে তুলে
বাধা নাহি, নাহি টান,
ছিঁড়িতে হবে না প্রাণ,
তাঁরি আছি, তাঁরি রব একূলে ওকূলে।

শিশু-সাহিত্যের আনন্দ যজ্ঞে এটি বৈরাগীর গান।

ডেনমার্কের যেমন হ্যানস্ ক্রিশ্চান অ্যানডারসন, ইংলণ্ডের লুই ক্যারোল, ইটালির পিনেকিও, রুশিয়ার মারশাক, বাংলার তেমনি সুকুমার রায়চৌধুরী শিশু-সাহিত্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা। লুই ক্যারোল ছিলেন বিজ্ঞানী, সুকুমার রায়চৌধুরীও ছিলেন তাই। ইউরোপের ঐ সকল প্রতিভার রচনা নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। গল্পাংশ ও বর্ণনা অনুবাদ করা যায়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দ, প্রকাশ-ভঙ্গী, বাচনপদ্ধতি এমন কি বিশেষ কাহিনীও অনুবাদ করা যায় না। সুকুমার রায়চৌধুরীর রসগ্রহণ করতে হোলে, তা বুঝতে হোলে বিদেশীকে বাঙলা শিখতে, ইংরেজ আমলের বাংলা ও বাঙালীকে জানতে হবে, এমন কি, বাঙালীর সমাজকে বুঝতে পারলে আরও ভাল হয়। তাঁর রচনাবলীর অধিকাংশই অপর ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব। যেমন তাঁর 'আবোল-তাবোল' কবিতাবলী— 'কুমড়োপটাস', 'রামগড়ুরের ছানা', 'খাই খাই' কি অনুবাদ করা সম্ভব? 'অবাক জলপান' শব্দটি বাঙলা ছাড়া আর কোন ভাষায় বোঝানো যায়? 'জল পাই কোথায়' শব্দ তিনটি অনুবাদ করে 'জলপাইয়ের' অর্থ প্রকাশ করা অসম্ভব। অন্ধ সংস্কারে পঙ্গু, নানা বিধি-নিষেধে জড়, পরাধীনতার নাগপাশে মৃতপ্রায় ও উদ্যমহীন জাতিকে জাগ্রত করবার প্রচেষ্টা তাঁর রচনার মর্মকথা। হাস্যোদ্দীপক শব্দে ও বাক্যে অদ্ভুত চিত্র এঁকে কবি গদ্যে ও পদ্যে বিষয়টিকে পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। অপরিণত মনে সে বিচিত্র চিত্র হাস্যরসের উদ্রেক করেছে, রসিক তার মর্ম গ্রহণ করে নিজ দুঃখের অবস্থায় সচেতন হবার চেষ্টা করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে সুকুমার রায়চৌধুরীর রচনার কোনও তুলনা নাই। যিনি কারও অনুসরণ বা

সুকুমার রায় ॥ পৃষ্ঠা ৬১ ॥

অনুকরণ করেন নি, তাঁকেও কেউ কেউ অনুসরণ বা অনুকরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর সময়ে বাংলার সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্র-প্রতিভার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে আলোকও সুকুমার-প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ম্লান করতে পারে নি। তার প্রভা যেন এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনাবলী বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব হোলে দেখা যেতো অ্যানডারসন-ক্যারোল-পিনোকিও-মারশাক মালিকায় সুকুমার মধ্যমণির মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন। 'আবোল-তাবোল' বহুজনপঠিত কবিতাগ্রন্থ। সেজন্য তার কোনও কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

সন্দেশেই তাঁর 'হযবরল', 'অবাক জলপান', 'পাগলাদাশু', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'হেঁসোরামের ডায়েরি', 'ড্রিঘাংচু' ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর আঁকা একরঙা ও রঙিন চিত্র। মনে হয়, দুঃখকে তিনি জয় করেছিলেন। তাই অপরকেও দুঃখ ভোলাতে হাসির দোলায় মনকে নাচিয়ে আনন্দ দিয়ে গেলেন।

বর্ষকে বিদায় দিয়ে, সকল কবিরই কবিতায় একটু করুণ সুর ধ্বনিত হয়ে থাকে। কিন্তু কবি সুকুমার রায়চৌধুরী ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্রকে বিদায় দিলেন এই বলে :

বর্ষশেষ

শুনরে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশী নাই রে।

ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বল সে।

কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে!

পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার॥

কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোন উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ।

রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।

ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে॥

সুকুমার রায়চৌধুরী নানা ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সকল কবিতায়ই হাস্যরস ছিল না, কয়েকটি গম্ভীর রসের কবিতাও ছিল।

তবে তিনি একাধিক ছোট গল্প রচনা করেছিলেন, এমন কথা আমরা জানি না। যেটি রচনা করেন সেটি হাস্যরসের সাহায্যে অন্ধ সংস্কারকে ব্যঙ্গ। গল্পটির নাম 'ড্রিঘাংচু' এবং উদ্ধারযোগ্য।

ড্রিঘাংচু

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওমরা সিপাই শান্ত্রী গিজ্ গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা হতে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁচু থামের উপর বসে ঘাড় নীচু করে চারদিক তাকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বল্লে, 'কঃ'।

কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ,—সভাশুদ্ধ সকলের চোখ একসঙ্গে গোল হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ করে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মত তাকিয়ে রইলেন! দরজার কাছে একটা ছেলে বসেছিল। সে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল, চামরটা তার হাত থেকে ঠাঁই করে রাজার মাথার উপর পড়ে

গেল। রাজামশাইয়ের চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বল্লেন, 'জল্লাদ ডাক।'

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বল্লেন, 'মাথা কেটে ফেল।' সর্ব্বনাশ! কার মাথা কাটতে বলে? সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজামশাই খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বল্লেন, 'কই মাথা কই?' জল্লাদ বেচারা হাত জোড় করে বল্লে, 'আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?' রাজা বল্লেন, 'ব্যাটা গোমুখ্খু কোথাকার, কার মাথা কিরে? যে ঐ রকম বিটকেল শব্দ করেছিল তার মাথা।' শুনে সভাশুদ্ধ সকলে হাঁফছেড়ে এমন ভয়ানক নিঃশ্বাস ফেল্ল যে কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে সেখান থেকে উড়ে গেল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, ওই কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল। তখন রাজামশাই বল্লেন, 'ডাক, পণ্ডিতসভার যত পণ্ডিত সবাইকে।' হুকুম হওয়ামাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজামশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে এমন গোল বাধিয়ে দিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার?'

কাকে আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি? পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। একজন ছোকরামত পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচু-মাচু করে জবাব দিল, 'আজ্ঞে বোধ হয় তার ক্ষিদে পেয়েছিল।'

রাজামশাই বল্লেন, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! ক্ষিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে কেন? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রী হয়? মন্ত্রী, ওঁকে বিদেয় করে দাও।'— সকলে মহাতম্বী করে বল্লে, 'হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক, ওঁকে বিদেয় করুন।'

আর একজন পণ্ডিত বল্লেন, 'মহারাজ কার্য্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই

বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়সপক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই অপরূপ ধ্বনিরূপ কার্য্যের নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?'

রাজা বল্লেন, 'আশ্চর্য্য এই যে, তোমার মত মোটাবুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল-তাবোল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে ওঁর মাইনে বন্ধ কর।' অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'মাইনে বন্ধ কর।'

তুই পণ্ডিতের এ রকম তুর্দ্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, কেউ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুরমত খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম, সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল। রাজামশাইয়ের খিদেও নাই, বিশ্রামও নাই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের 'মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা' বলে গাল দিচ্ছে এমন সময় রোগা সুঁটকো মত একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার করে সভার মাঝখানে পড়ে গেল। রাজামন্ত্রী পাত্রমিত্র উজিরনাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'কি হল ? কি হল ?'

তখন অনেক জলের ছিটা, পাখার বাতাস আর বলাকওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বল্ল, 'মহারাজ, সেটা কি দাঁড়কাক ছিল ?' সকলে বল্ল, 'হাঁ হাঁ হাঁ—কেন বল দেখি ?' লোকটা আবার বল্ল, 'মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসেছিল—আর মাথা নীচু করেছিল, আর চোখ পাকিয়ে ছিল আর 'কঃ' করে শব্দ করেছিল ?' সকলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বল্ল, 'হাঁ হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।' তাই শুনে

লোকটা আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, 'হায় হায় সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে না কেন?'

রাজা বল্লেন, 'তাই ত, একে তখন তোমরা খবর দাও নি কেন?' লোকটাকে কেউই চেনে না, তবু সে কথা কেউ বলতে সাহস পেল না, সবাই বল্ল, 'হ্যাঁ, ওকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল' —যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কি খবর দেবে এ কথা কেউ বুঝতে পারল না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত করে বল্ল, 'ভ্রিঘাংচু।' সে আবার কি! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বল্লেন, 'দিঘাঞ্চু কি হে?' লোকটা বল্ল, 'দীঘাঞ্চু নয়, ভ্রিঘাংচু।' কেউ কিছু বুঝতে পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বল্ল, 'ও!' তখন রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি রকম হে?' লোকটা বল্ল, 'আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে ভ্রিঘাংচু শুনে আসছি—তাই জানি ভ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মত। সে যখন সভায় ঢোকে তখন সিংহাসনের ডান দিকে থামের উপর বসে, মাথা নীচু করে দক্ষিণ দিকে মুখ করে চোখ পাকিয়ে 'কঃ' বলে শব্দ করে। আমি ত আর কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন—'। পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'না, না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।'

রাজা বল্লেন, 'তোমায় খবর দেয়নি বলে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কি?' লোকটা বল্ল, 'মহারাজ, সে কথা বল্লে যদি লোকে বিশ্বাস না করে তাই বলতে সাহস হয় না।'

রাজা বল্লেন, 'যে বিশ্বাস করবে না তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে বলে ফেল।' সভাশুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বল্ল, 'মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে আছি ভ্রিঘাংচুর দেখা পেলে, সেই মন্ত্র তাকে

যদি বলতে পারতাম তাহলে কি যে আশ্চর্য্য কাণ্ড হত তা কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোন বইয়ে লেখে নি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর কি পাব?' রাজা বল্লেন, 'মন্ত্রটা আমায় বল ত।' লোকটা বল্ল, 'সর্ব্বনাশ! সে মন্ত্র ড্রিঘাংচুর সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—আপনি দু দিন উপোস করে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার সামনে দাঁড়কাক দেখলে তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার আর কেউ যেন তা না শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি ড্রিঘাংচু না হয়। আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ফেলে তাহলেই সর্ব্বনাশ!'

তখন সভা ভঙ্গ হ'ল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সকলে ড্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য্য ফল পাওয়ার কথা, বলাবলি করতে করতে বাড়ী চলে গেল।

তারপর রাজামশাই দুদিন উপোস করে তিন দিনের সকালবেলা—সেই লোকটার লেখা কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎপটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালী
ধর্ম্মতলা কর্ম্মখালি।

রাজামশাই গম্ভীর ভাবে এটা মুখস্থ করে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই লোকজন সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন, কোন রকম আশ্চর্য্য হয় কিনা! আজ পর্য্যন্ত তিনি ড্রিঘাংচুর, কোন সন্ধান পান নি।

—চতুর্থ বর্ষ, কার্তিক, ১৩২৩

গল্পটিতে 'আবোল-তাবোলে'র সুর আছে যার মর্মগ্রহণ শিশু ও কিশোর বয়স্ক পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে সম্ভব নয়।

উপেন্দ্রকিশোরের 'সাতমার পালোয়ান' নামক গল্পটি শিশু-সাহিত্য হোলেও ব্যঙ্গ-রচনা শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। একটি ছোট ইঁদুর মারতে গিয়ে সাতভাই শেষে নিজেদের মাথায় লাঠি বসালে, এটি কৌতুককরও বটে।

৩১॥ অপর দিকে মফঃস্বলে কোচবিহার শহরে জেনকিনস্ স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জন্য বা উদ্যোগে ঠিক বলা যায় না ১৯১৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, মাসিক পত্রিকা 'অঞ্জলি'। পত্রিকাখানি সম্ভবত ছাত্রবৃন্দই সম্পাদনা করতেন। কিন্তু পত্রিকাখানির প্রথম দিকে তার অভিভাবক ছিলেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্রনাথ রায়, আর, প্রকাশক ছিলেন কালীদয়াল মুখোপাধ্যায়। পরে প্রকাশক পরিবর্তিত হয়। অভিভাবকেরও আসন শূন্য থাকে।

আমরা মাত্র দু' বৎসরের পত্রিকা দেখেছি। কাজেই 'অঞ্জলি'র আয়ু কতদিন ছিল আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

অঞ্জলির পরিচালক বিজ্ঞাপনে লিখেছেন :

> যে কোন প্রকার ভাল গল্প, আলোচনা, কবিতা, ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। জেঙ্কিনস্ স্কুলের যে কোন শ্রেণীর ছাত্র এই পত্রিকায় লিখিতে পারিবেন।

পত্রিকাপাঠে মনে হয়, বিজ্ঞপ্তিটি পালিত হয়। পত্রিকায় ছাত্র-শিক্ষকগণ তো লিখতেনই বাইরের লোকের লেখাও প্রকাশিত হোত মনে হয়। শিশুপাঠ্য পুস্তকে ও পত্রিকায় আদিরসাত্মক রচনা পরিহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু পত্রিকানিতে আদিরসাত্মক কয়েকটি রচনাও পাওয়া যায়, তবে রচনাগুলি কাঁচা হাতের। কোনও রচনাই উদ্ধার-যোগ্য নয়।

ঐ সনে বা পরবর্তী সনে, ১৯১৮ খৃস্টাব্দে, আর কোনও পত্রিকা প্রকাশিত হয় কি না আমাদের জানা নেই। পরবর্তী ইংরেজী সালে

অর্থাৎ ১৯১৯ খৃস্টাব্দে যে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়ে তা আজও বাংলার বালক-বালিকাগণের রস পরিবেশন করছে, তার নামোল্লেখ পত্রিকা-প্রসঙ্গের আলোচনার গোড়ার দিকেই করা হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখলাম, ১৯০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯১৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে উপরোক্ত মাত্র সাতখানি মাসিক পত্রিকা।

শতাব্দীর পত্রিকা-প্রসঙ্গে ঐ কথা বলা যায়, যে-সকল পত্রিকায় শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও কবিগণের রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিই উৎকৃষ্ট ছিল এবং বিষয়ের দিকে বিংশ শতাব্দীর পত্রিকাগুলি ঊনবিংশ শতককে বিশেষভাবে অতিক্রমে সক্ষম হয় নি। আর, দশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য যে-সকল রচনা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তা সংখ্যায় অতি অল্প। কাজেই 'শিশুপাঠ্য' ও 'শিশু-সাহিত্য' এই শব্দ দুটি ঐ সকল পত্রিকা ও রচনার প্রতি প্রয়োগ সমীচীন বোধ হয় না। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে 'শিশু' আখ্যা দিলে এ কথার বাস্তবিকতা থাকে বটে।

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

১৮১৮—১৯১৮ ॥

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

॥ গ্রন্থ-প্রসঙ্গ ॥

এক

স্কুল-বুক সোসাইটি যুগ

॥ ১৮১৮ খৃঃ অঃ—১৮৪৬ খৃঃ অঃ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বাংলার গদ্য-সাহিত্যের প্রারম্ভকাল এবং উনবিংশ শতাব্দীরই প্রথম ভাগে বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যেরও সূচনা। এই সময়ের পূর্বে বাংলা দেশে কোনও উল্লেখযোগ্য শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রমাণ আমরা পাই নি। বাংলার সুন্দর রূপকথাসম্ভার ও ছেলেভুলানো, ঘুমপাড়ানী সুললিত ছড়াগুলিকে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হোলেও এগুলির রচনাকাল সুদূর অতীতে, যখনকার বাংলার রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, এমন কি ভৌগোলিক অবস্থা ছিল এখনকার থেকে ভিন্ন ধরনের। এই প্রাচীন সাহিত্যে পুরানো দিনের সামাজিক চিত্র আছে কিন্তু ইংরেজ আমলের ও বর্তমানকালের শিশু-সাহিত্যের সঙ্গে এই সাহিত্যের কোনও ধারাবাহিকতা দেখা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে একাল পর্যন্ত বাংলা দেশে যে শিশু-সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে, তা ইংরেজী শিক্ষার ফল। তার ভিত্তি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায়। তাকে আলোচনার সুবিধার জন্য (১) কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি যুগ, (২) বিদ্যাসাগর যুগ ও (৩) বিদ্যাসাগরোত্তর যুগ, এই তিন ভাগে আমরা বিভক্ত করেছি। প্রথম দু'ভাগে এই সাহিত্যে সোসাইটি ও বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই প্রাধান্য দেখা যায়। বিদ্যাসাগোরত্তর যুগ পুষ্পস্তবকের মতো। নানাজনের দানে তা সমৃদ্ধ।

শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কর্তৃক শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন এবং গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশের যে উদ্দেশ্যই থাক তাঁরা আমাদের বাঙলা সাহিত্যের যে অশেষ উপকার করেছেন, একথা উচ্চ শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই অবগত। আবার বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যের গোড়ায়ও ছিলেন তাঁরা। বাংলার কিশোরপাঠ্য প্রথম পত্রিকা (দিগদর্শন—১৮১৮ খৃঃ অঃ) প্রকাশ করেন তাঁরাই। অবশ্য রাজা রামমোহন রায়ও এই মহৎ কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন। (উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্রিপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যের আরম্ভ এবং তখন থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত এই সাহিত্যের উন্নতিবিধান করেন, প্রধানত এই প্রতিষ্ঠানটি। স্কুল-বুক সোসাইটির উদ্দেশ্যই ছিল :

> Preparation, publication, and cheap or gratuitous supply of works useful in schools and semineries of learning.

কারণ তখন দেশে পাঠ্যপুস্তকের নিতান্ত অভাব এবং ইংরেজ নিজ কর্মসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এদেশীয়গণকে (natives) ইংরেজী প্রণালীতে শিক্ষাদানে সচেষ্ট, যদিও প্রথম দিকে কয়েকটি বিশেষ কারণে এদেশের লোক ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দিকে কিছু বিমুখ ছিল। এমন অবস্থায় বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যের মূল যে পাঠ্যপুস্তকে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নিহিত থাকবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পাঠ্যপুস্তককেই যতটা সুখপাঠ্য ও মনগ্রাহী করা সম্ভব সেদিকেই তখনকার লেখকগণ যত্নবান ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কখনও কখনও মাসিক পত্রিকা ও দু'-একখানি গ্রন্থ ছাড়া আর কোনও কিছু রচিত হোত না বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা। কারণ তার প্রমাণ আমরা পাই না। সে সকল পত্রিকাও একেবারে গোড়ার দিকে এখনকার মতো বা উনবিংশ শতাব্দীরই শেষার্ধের উন্নত পত্রিকাগুলির মতো বিবিধ রচনাবলীতে সমৃদ্ধ ছিল না এবং তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। ক্রমবিকাশের রীতি অনুসারে সেই

সুযোগ-সুবিধাহীন কালে প্রারম্ভ ছিল সামান্য, বৈচিত্র্যহীন ও ভাবীকালের রূপাভাষ বর্জিত। লেখকের সংখ্যাও ছিল অতি অল্প। ক্রমে উন্নত ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরে উপহারপুস্তক রচনার সাধু ইচ্ছা সোসাইটির ছিল একথা রিপোর্টে জানা যায়, (৭ম রিপোর্ট)। তবে তা সফল হয়েছিল কি না জানতে পারা যায় না। বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্য সোসাইটির যে অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এবং তাঁদের শ্রম যে সার্থক হয় একথা তাঁরা সানন্দেই ঘোষণা করেছিলেন।

> In this language the society's labours have been most productive and it now posseses publications on almost every subject of elementary instruction.—৭ম রিপোর্ট—১৮২৮-২৯ খৃঃ

পত্রিকার ক্ষেত্রে যে রীতি সাহিত্য-পুস্তকের ক্ষেত্রেও সেই রীতিই কাজ করে। প্রতিষ্ঠার পর অল্পকাল মধ্যেই সোসাইটি ছয়খানি বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য সাহিত্য-পুস্তক। গ্রন্থ কয়খানির লেখক ছিলেন, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, তারাচাঁদ দত্ত ও ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট। স্টুয়ার্ট ছিলেন বর্ধমানে প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুটান্ট। তিনি বর্ধমানে প্রথমে দুটি বাঙলা স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর স্কুলের সংখ্যা ক্রমে হয় দশটি। তারাচাঁদ দত্ত তাঁর কর্মচারী, সম্ভবত শিক্ষার ব্যাপারে সহকারী ছিলেন। স্কুল-বুক সোসাইটির রিপোর্টেই জানা যায়, স্টুয়ার্ট 'ইতিহাস কথা' নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন। পরে এই গ্রন্থখানির নাম হয় 'উপদেশ কথা'। আমরা গ্রন্থখানি দেখবার সুযোগ পাই নি। কলকাতার কোনও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে এই অমূল্য গ্রন্থখানি থাকা সম্ভব। যাহোক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, গ্রন্থে উপদেশ, ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, শেষে অভিধান অংশ ছিল। 'দিগ্দর্শনে'ও অভিধান অংশ ছিল। মনে হয়, পরবর্তীকালের অর্থপুস্তক ও পৃথক অভিধানের উদ্ভব অভিধান অংশ থেকেই। কাজেই

তাঁদেরই শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্র-পথিকের সম্মান দিতে হয়। এই সঙ্গে রাজা রামমোহন রায় ও জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যানের নামোল্লেখ করাও প্রয়োজন। কারণ 'দিগ্দর্শনে'র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি রাজা রামমোহন রায়ের রচনা বলে ধারণা হয়। নিবন্ধগুলি অনুবাদ নয়, মৌলিক। কিন্তু উপরোক্ত লেখকগণের মধ্যে কেউই মৌলিক রচনায় অগ্রাধিকার লাভের অধিকারী নন। কারণ মৌলিক রচনার সুত্রপাত হয় 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকায়। পত্রিকা সম্পাদক কৃষ্ণধন মিত্রই শিশু-সাহিত্যে প্রথম মৌলিক রচনার অগ্র-পথিকের সম্মান লাভের অধিকারী বলে আমাদের ধারণা।

দেব-মিত্র-সেন প্রথমে যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'নীতিকথা'। গ্রন্থখানি ১ম, ২য়, ও ৩য় এই তিন ভাগে বিভক্ত। 'নীতিকথা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃস্টাব্দে সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রায় এক বৎসর পরে এবং তখনও সোসাইটির নিজস্ব ছাপাখানা না থাকায় মুদ্রিত হয় শ্রীরামপুরে মিশনারিদের ছাপাখানায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, উইলিয়াম কেরীও ছিলেন সোসাইটির অন্যতম সদস্য। রাধাকান্ত দেব তাঁর সাহিত্যিক কার্যকলাপের জন্য সাহিত্যিক বলেই যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন, যদিও তিনি উপন্যাস, গল্প বা কবিতা রচনা করেন নি! 'নীতিকথা'য় প্রথম ভাগে বর্ণপরিচয়, হিন্দুদের জাতি পরিচয় (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জলচল, জলঅচল ইঃ), বানান ও উপদেশাদির পর নীতিমূলক গল্প—ইংরেজী ও আরবী গল্পের অনুবাদ আছে। যেমন :

২০ ॥ দুই কুকুড়া

দুই কুকুড়া কোন দ্রব্যের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলে একটা জয়ী হইল আর একটা অন্যস্থানে পলাইয়া গেল। পরে যে জিনিয়াছিল সে এক বড় উচ্চ পালার উপরে বসিয়া আহ্লাদে পাখা ঝটকাইতে ও ডাকিতে ও অহঙ্কার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক কুকুর তাহাকে দেখিয়া ছোঁ মারিয়া লইল।
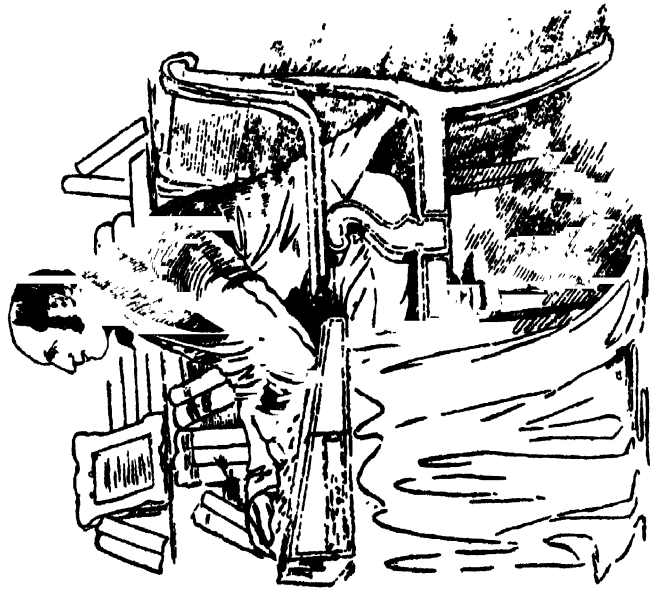
জন মার্শম্যান ॥ পৃষ্ঠা ৭৬ ॥
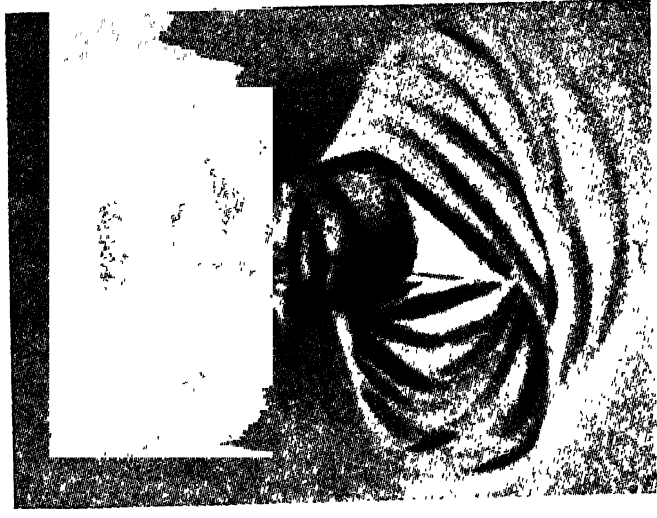
অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ পৃষ্ঠা ১০০ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই। আপন পরাক্রমের অহঙ্কার করিলে শীঘ্র লজ্জা পায়।

২১ ॥ কয়েক নেকড়িয়া বাঘ।

কয়েক নেকড়িয়া বাঘ এক গর্ত্তে গোচর্ম্ম দেখিয়া তাহা খাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ গর্ত্ত জলে পূর্ণ ছিল। তাহাতে তাহারা ঐক্য হইয়া এই পরামর্শ করিল, আইস আমরা আগে সমস্ত জল পান করিয়া গর্ত্ত শুষ্ক করি, পরে চর্ম্ম লইয়া খাইব। ইহা স্থির করিয়া তাহারা উদর পূর্ণ হওন পর্য্যন্ত জল খাইল; কিন্তু অধিক জল পান করাতে সকলে পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল, সুতরাং চামড়া খাইতে পারিল না।

ইহার তাৎপর্য্য এই। অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শ নিষ্ফল।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম রচনাটি এই :

১ ॥ অহঙ্কারের কথা।

ধনে অহঙ্কার নহে অহঙ্কার মনে।
বয়সেতে বিজ্ঞ নহে বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

অনেক ধনি (বানানটি লক্ষণীয়—লেখক) লোক অহঙ্কার করে না। অনেক দরিদ্র লোক অহঙ্কার করে। যদি ধনে অহঙ্কার জন্মাইত তবে সমস্ত ধনি লোকই অহঙ্কারী হইত। অতএব অহঙ্কার ধনে নহে কেবল মনে আপনাকে বড় করিয়া জানা সেই অহঙ্কার। কোন কোন বিদ্বানও মনে করেন আমি বড় আমা হইতে আর কেহ বড় নাই ও আমার সদৃশ আর নাই; তৎপ্রযুক্ত অপর ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন। এই প্রকার লোক কেবল চিত্রকরের ন্যায় অর্থাৎ পদার্থ বোধ নাই। মনুষ্য পাত্রের ন্যায় ও জ্ঞান জলের ন্যায় অতএব যেমন জল নীচগামী, তেমনি জ্ঞানি (বানানটি লক্ষণীয়—লেখক) ব্যক্তি কদাচ আপনাকে বড় করিয়া জানে না। যেমন বৃক্ষাদির যে ডালে ফল ধরে, সে ডাল ফলের ভারেতে অবশ্য নত হয়। বড় গাছ হইলেই ফলবান হয় তাহা

নয়। দেখ, ধান্যের শীস যত শস্যপূর্ণ হয় তত নম্র হইয়া ভূমিতে পড়ে, তাদৃশ জ্ঞানি যত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তত নম্র ও শিষ্ট হয়।

প্রাচীন হইলেও বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও লজ্জা করিও না; কেননা বিদ্যা বৃদ্ধা হন না। অতএব অধিক বয়সে কিম্বা অল্প বয়স হইলেই যে বিজ্ঞ হয়, তাহা নয়; কেবল জ্ঞান থাকিলেই বিজ্ঞ হয়। ইতি।

উপরোক্ত প্রবন্ধটি পাঠে ধারণা হয় রচনাটি মৌলিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সোসাইটির নিয়ম ছিল প্রথমে বিষয়টি ইংরেজীতে রচনা করা, পরে সেটিকে ভাষান্তরিত করা। এই নিয়মটি কখনও শিথিল করা হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। তবুও বলতে হয় গ্রন্থখানির যে সংস্করণে থেকে আমরা রচনাটি সংগ্রহ করেছি সেটি ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত। এই সময়টি বিদ্যাসাগর যুগ এবং তখন বাঙলা গদ্য পূর্বের চেয়ে অনেকটা সুগঠিত, সুসমৃদ্ধ ও সুন্দর। আরও এক কথা, কোনও গ্রন্থের বহুল সংস্করণ হোলে প্রথম দিককার সংস্করণ থেকে পরের সংস্করণ কিছু তফাত হয়ে পড়ে। এর কারণ, পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংশোধন। আবার কখনও কখনও হয়ও না, যেমন ছিল তেমনি চালানো হয়। কিন্তু সোসাইটির ক্ষেত্রে এ দোষ আরোপ করা যায় না। কারণ তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, এ দেশে শিক্ষাবিস্তার, পুস্তক ব্যবসায়ের দ্বারা ধনার্জন নয়।

তৃতীয় ভাগের একটি গল্পের কিয়দংশ :

১০। বিদ্বান ও মূর্খের বিষয়।

বিদ্যা যত্ন করিলে পাওয়া যায় ও সাধিলে সিদ্ধ হয়।

এক বালক বিদ্যাভ্যাসে যত্ন না করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে কালক্ষেপণ করিত এবং সুশিক্ষায় ও হিতবাক্যে অবহেলা করিয়া কুপথে ভ্রমণ করিত। পরে যৌবনাবস্থায় অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে অধিক দুঃখ পাওয়াতে সে মাসে মাসে দুই টাকা মাহিনাতে কর্ম্ম

> করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহাতে বড় ক্লেশ বোধ হইল, যেহেতু তাহার এক বন্ধুর নিকট যাইয়া কাতরোক্তিতে জিজ্ঞাসা করিল, হে ভাই, তুমি কিরূপে সাহেব লোকের কর্ম্ম করিয়া প্রতি মাসে দশেরও অধিক টাকা পাইতেছ, কিন্তু আমি সমস্ত দিন কার্য্যে মগ্ন থাকিয়া ··· ইত্যাদি।

এই সংস্করণখানিও ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত। রচনাটির ভাষা অনেক সাবলীল।

'নীতিকথা'র পর ১৮১৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস'। কিন্তু গ্রন্থখানি ইতিহাস নয়, কাহিনী ও প্রবন্ধে, আঠারোটি রচনায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থখানি প্রথমে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুখপাঠ্য হওয়ায় পরে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, সোসাইটির রিপোর্টে এ কথার উল্লেখ আছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় গ্রন্থখানির এইরূপ পরিচয় আছে :

> ইহাতে গল্পচ্ছলে উদারতা, অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, অসূয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যুবকদিগের প্রতি উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। কলিকাতা এবং চুঁচুড়ার অনেক মুদ্রাযন্ত্র হইতে এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ···

কলকাতায় সারকুলার রোডে সোসাইটি নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপন করলে এই গ্রন্থখানিই তাতে প্রথমে মুদ্রিত হয়। প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণ পরীক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় ১৮২৮ খৃস্টব্দের সংস্করণখানি পরীক্ষা করে আমাদের এই ধারণা হয় যে, গ্রন্থখানিতে দু' রকমের রচনাশৈলী বর্তমান। একটা নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

শিষ্ট নিরূপণ

> এক মহল্লোকের সন্তান এক ইতর লোকের পুত্রকে কটূক্তি করিল ; কিন্তু ইতরলোকের সন্তান তাহা সহিল, সে এক কথাও কহিল না ; কেন না কহিল, দুষ্ট ভাষা কহা অপেক্ষা সহিষ্ণুতা ভাল। এই আখ্যান একজন শিক্ষক আপন শিষ্যকে জ্ঞাত করাইয়া

কহিলেন, কহ দেখি বাপু, ইহার মধ্যে শিষ্ট কে ? শিষ্য কহিল, মহাশয় আমার অল্প জ্ঞান। এই বুঝি যে ইতর সন্তানের নম্রতা দ্বারা শিষ্টতা জানা গেল, গুরু কহিলেন ধন্য শিষ্য, এই বটে, কেননা দোষগুণ বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশ পায়, দেখ, মহৎকুলে উৎপন্ন হইয়া চৌর্য্য, যুয়াচৌর্য্য, লম্পটতা, ইত্যাদি নীচ ক্রিয়া করিতেছে, নীচকুলে উৎপন্ন হইয়াও মহৎ ক্রিয়া করিতেছে যেহেতু জন্ম হউক যথাতথা কর্ম্ম হউক ভাল।

কুল বিশেষে শিষ্ট নয়, শীল থাকিলেই হয়। তাহার বিবরণ এই লজ্জাশীল, ধৈর্য্যশীল, ধর্ম্মশীল, ব্যয়শীল, গুণশীল ইত্যাদি শীলতা দ্বারা বিশিষ্ট করা যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বলেছেন গ্রন্থখানিতে 'যুবকদিগের প্রতি উপদেশ বিবৃত হইয়াছে', কিন্তু গ্রন্থখানির নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে 'বালকের দিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতি শিক্ষক উপাখ্যান।' সম্ভবত সেকালে পাঠশালার অনেক পড়ুয়ায় বয়সাধিক্যের কথা চিন্তা করেই পত্রিকা একথা লিখে থাকবেন।

'মনোরঞ্জনেতিহাসে'র পর ১৮২০ খৃস্টাব্দে বালকদের পাঠার্থে 'হিতোপদেশ' নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি সম্বন্ধে সোসাইটি পুস্তকের প্রারম্ভে লিখছেন :

…এই পুস্তকে যে ২ হিতোপদেশ সংগ্রহ হইল তাহা প্রথম বাবু রামকমল সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত. ইহার পূর্ব্বে তিনি ঔষধসার সংগ্রহ নামে পুস্তক করিয়া দেশের উপকার ও আপন সুখ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছেন. তিনি এই হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়া মোং কলিকাতার স্কুল বুক সোসাইটির নিকট উপস্থিত করিয়াছেন. পরে ঐ সম্প্রদায় শ্রীরামপুরের পাঠশালার নিবন্ধকর্ত্তারদের নিকটে এই হিতোপদেশ অর্পণ করিয়া কহিলেন যে শ্রীযুক্তবাবু রামকমল সেন সংগৃহীত হিতোপদেশের সহিত তোমারদের হিতোপদেশ মিলাইয়া পুস্তক ভারী করিয়া ছাপা কর ; পরে সেই মত করা গেল.

দেখা যাচ্ছে, 'শ্রীরামপুরের নিবন্ধকর্ত্তারদের' দ্বারাও একখানি হিতোপদেশ রচিত হয় এবং সেখানিও ছিল পাঠশালার পড়ুয়াদের জন্য। সংযুক্ত গ্রন্থখানির নামপৃষ্ঠা ছিল এই :

হিতোপদেশ

লোকেরদের হিত প্রবোধের জন্যে,

শ্রীযুক্তবাবু রামকমল সেন ও শ্রীরামপুরান্তর্গত পাঠশালা নিবন্ধকর্ত্তারদের কর্ত্তৃক সংগৃহীত.

মো. শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইল.

শন ১৮২০. ১২২৭. ইত্যাদি।

গ্রন্থখানির মুখবন্ধটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

মুখবন্ধ

সভ্য হউক অথবা অসভ্য হউক সকল জাতির মধ্যে হিতোপদেশের বড় চলন ; এই হিতোপদেশ রচিবার নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র স্বাভাবিক গুণ অপেক্ষণীয় ; এবং যে ব্যক্তি এই হিতোপদেশ রচনা নিপুণত্বরূপে খ্যাত হইয়াছে সে অত্যল্প.

যে হিতোপদেশ কোন জাতির ব্যবহারানুসারে কহা যায়, সে হিতোপদেশ কালক্রমে নিষ্প্রয়োজন হয়, যে হেতুক মনুষ্যেরদের ব্যবহার পরিবর্ত্তন নিত্য হইতেছে. অতএব যে ব্যবহারানুসারে হিতোপদেশ কহা গিয়াছে সে ব্যবহার লোপ হইলে সুতরাং সে হিতোপদেশ অবোধ্য হইয়া লুপ্ত হয় ; কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে স্বাভাবিক কতক ব্যবহার ও দোষ আছে ; সে কাল বিশেষ ও দেশ বিশেষ ও জাতি বিশেষ কৃত নয়, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ. এই সর্ব্বসাধারণ দোষ কিম্বা ব্যবহারানুসারে যে হিতোপদেশ কহা যায়, সে হিতোপদেশ তাজা থাকে ; সে হিতোপদেশ রচনা করিবার হাজার ২ বৎসর পরেও তাহা বোধগম্য হয় ; এবং যে জাতির মধ্যে ভিন্ন ২ ব্যবহার আছে সে সকলের মধ্যেও তাহার

তাৎপর্য্য বোধ হয়. এই প্রকার হিতোপদেশ কাল পরিবর্ত্তন হইলেও প্রাচীন হয় না; এবং মনুষ্যেরদের এক বংশ নানা হইলেও অন্য বংশ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া নূতনবৎ থাকে. ···

মানুষেরদের শিক্ষার কারণ হিতোপদেশের অধিক প্রয়োজন দেখা যায়, যেহেতুক হিতোপদেশের দ্বারা অতি বেগে সুন্দর কোন অনুভব মনে প্রবিষ্ট হয়. ···

হিন্দুদের মধ্যে সকল হিতোপদেশ গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত হিতোপদেশ. বারশত বৎসর হইল সে গ্রন্থ পারসী ভাষাতে তর্জ্জমা হইয়াছে ও ইউরোপে নানা ভাষাতে তর্জ্জমা হইয়াছে, এবং আমরা এই বিষয় সত্য কহিতে পারি যে ঐ হিতোপদেশ যেমন আসিয়াতে খ্যাত তদধিক ইউরোপে খ্যাত.

গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯ এবং গল্পও ছিল ৪৯টি।

সে সময়ের প্রাপ্তবয়স্কগণ পাঠ্য বা অপ্রাপ্তবয়স্কগণ পাঠ্য কোনও গ্রন্থেই মুখবন্ধ বা ভূমিকা দেখা যায় না। তা দেওয়াও হোত না বলেই মনে হয়। কিন্তু এই গ্রন্থখানিতে পূর্ব রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। কেবল তাই নয়, প্রকাশক স্কুল-বুক সোসাইটিও গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ ইতিহাসও প্রারম্ভে ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থের মুখবন্ধটি স্বয়ং রামকমল সেন বা তাঁর সহযোগী রচয়িতার সহযোগিতায় হয়তো রচিত হয়ে থাকবে, কিন্তু তাঁরা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন লেখক ছিলেন, 'যেহেতু মনুষ্যেরদের ব্যবহার নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে' এই সত্যকে স্বীকার করে তদনুসারে গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে, এই মতাবলম্বীর সংখ্যা আমাদের কালে বিস্তর, সেকালে অল্পই ছিল মনে হয়। তারপর তাঁরা আরও বলছেন :

মনুষ্যের মধ্যে স্বাভাবিক কতক ব্যবহার ও দোষ আছে ; সে কাল বিশেষ ও দেশ বিশেষ ও জাতি বিশেষে কৃত নয়, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ.

এই সত্যকে কিন্তু অস্বীকার করার প্রবৃত্তি সমাজের উচ্চস্তরে অনেকের মধ্যেই এখনও প্রকাশ পায়। 'মানুষেরদের শিক্ষার কারণ হিতোপদেশের অধিক প্রয়োজন দেখা যায়.' এটা শিক্ষার অন্যতম উপায়ের কথা সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য। কিন্তু শিক্ষায় যদি মানুষের মানসিক সংস্কৃতিগুলি বিকশিত ও অসদ্বৃত্তিগুলি নিস্তেজ ও সংযত না হয় তাহলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? কেবল লিখন ও পঠনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়।

পাদ্রি উইলিয়াম কেরী রচিত 'ইতিহাসমালা'র একটি গল্পের নীতিবাক্য :

> অতএব কহি সকলে শ্রবণ কর যদি কোন অধম বংশজাত ব্যক্তিও উত্তম সংসর্গে থাকিয়া কৃতবিদ্য হয় তথাও তাহার বংশাধিক ক্ষমতা ও উত্তমতা প্রকাশ পায় না।

এই মতের বিরোধী মতাবলম্বী ব্যক্তি তখনও ছিলেন এবং যে কয়জন ছিলেন তাঁরা প্রগতিপন্থী একথা অন্তত আমরা স্বীকার না করে পারি না। তাঁদের চিন্তা ও মনোভাব পরবর্তীকালে ক্রমেই অধিকজনের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে একটি প্রবল শক্তিরূপে মনুষ্যসমাজকে নূতন ছাঁচে গড়তে উন্মুখ। উক্ত মত মনোবিজ্ঞানও স্বীকার করে না। পরিবেশ ও শিক্ষাই মানুষের মনোবৃত্তি গঠনের জন্য দায়ী। উক্ত মতটি শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার মনোভাবেরই ইঙ্গিত করে। রামকমল সেন ছিলেন তখনকার স্বল্পসংখ্যক প্রগতিপন্থিগণের অন্যতম।

হিতোপদেশের ৪৯টি গল্পের মধ্যে তিনটি এই :

(১) এক কাক আর মেষ.

> কোন প্রান্তর মধ্যে এক মেষ চরিতেছিল. তথায় এক কাক উড়িয়া যাইয়া তাহার পৃষ্ঠে বসিল ও ঠোকরাইতে লাগিল. ভেড়া পীড়িত হইয়া কাক প্রতি কহিলেক, যে অরে দুষ্ট কাক, আমি নির্বিরোধী আর কাহারো হিংসা করি না, আর তোমার স্থানে কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন দীন হীন নিরীহ আমাকে

পীড়া দেও. কাক কহিলেক যে আমি এই প্রকারে তাবৎ চতুষ্পদ পশুর উপর আরোহণ করিয়া থাকি. ভেড়া কহিলেক অন্য পশুর উপর চড়িয়া থাকিবে, কিন্তু কুক্কুরের উপর চড়িতে এতাবৎ ভরসা হয় না. কাক কহিলেক যে আমি স্থান বিশেষে উপদ্রোহ ও নম্রতা ও শিষ্টতা ব্যবহার করিয়া থাকি অর্থাৎ ক্ষীণের নিকট পরাক্রম প্রকাশ করি, আর প্রবলের নিকট শিষ্ট হই.

তাৎপর্য্য.

দুষ্ট ও ক্ষুদ্র মনুষ্যের রীতি এই যে যাহারা সহিষ্ণুতা করে তাহারদিগের উপর যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করে আর বলবানের নিকটেও যায় না.

(২) একজনের দুই স্ত্রী ছিল তাহার কথা.

এক ব্যক্তি অর্দ্ধ শ্যাম অর্দ্ধ শুক্ল কেশাবিশিষ্ট অর্দ্ধ বৃদ্ধ লোক দুই স্ত্রী বিবাহ করিল, তাহার মধ্যে এক স্ত্রী আপন সমবয়স্কা ও আর এক পত্নী আপন হইতে ন্যূনবয়স্কা, সে দুই স্ত্রী আপন ২ মনোমত করিবার জন্য বৃদ্ধা স্ত্রী স্বামীর কাঁচা কেশ ছিঁড়িতে লাগিল ও যুবতী স্ত্রী পাকা কেশ ছিঁড়িতে লাগিল, তাহাতে উভয়থা তাহার মস্তক কেশহীন হইল.

তাৎপর্য্য.

যাহার দুই ভার্য্যা হয় ও তাহারা আপন আপন মনোনীত ব্যবহার করিলে সে পুরুষের এইরূপ দুরবস্থা হয়.

সে কালে আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যেও পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। তবে বৃদ্ধা বিবাহের প্রচলন ছিল না। মূল গল্পটি বিদেশী। পাঠশালার ছাত্রদের এই গল্পটি পাঠে উপকার না হবারই কথা যদিও তখন 'পেটে পেটে সম্বন্ধ' হোত। হিন্দুদের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য বজায় রাখবার চেষ্টায় কিন্তু অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও করা হোত। গ্রন্থখানি কেবল পাঠশালার পড়ুয়াদের জন্য রচিত হয় নি, সেই সঙ্গে উদ্দেশ্য ছিল, 'লোকেরদের হিত প্রবোধের

রামকমল সেন ॥ পৃষ্ঠা ৮০ ॥

রাধাকান্ত দেব ॥ পৃষ্ঠা ৮৫ ॥
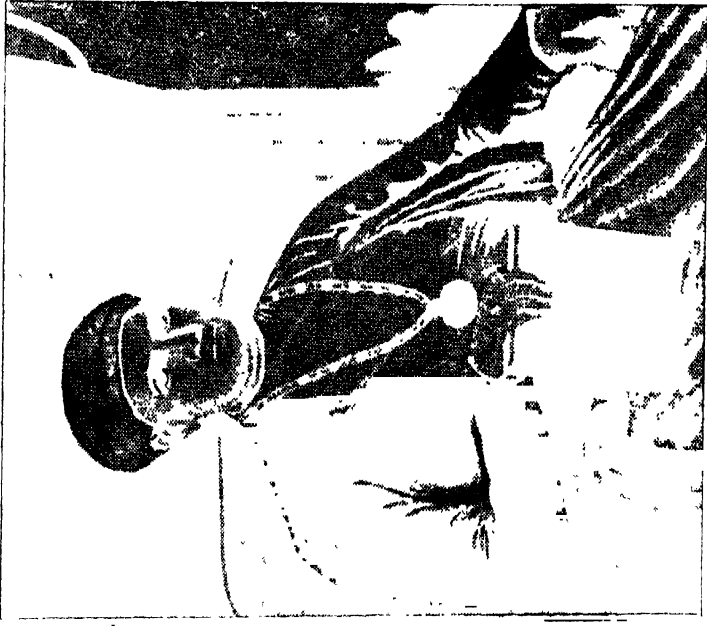
জন্যে'ও। প্রাপ্তবয়স্কদেরও বহুবিবাহের অন্যতম কুফল সম্বন্ধে এই গল্পে সতর্ক করা হয়েছিল।

(৩) এক মহাজন ও এক জাহাজির কথা.

এক মহাজন এক জাহাজিকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার পিতা কিরূপে মরিলেন, সে বলিল যে, আমার পিতা ও আমার পিতামহ সমুদ্রে ডুবিয়া মরিলেন, মহাজন পুনর্ব্বার কহিল যে তোমার কি ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই, জাহাজি উত্তর করিল যে তোমার পিতামহ কিরূপে মরিলেন। মহাজন উত্তর করিল যে শয্যায়, জাহাজি প্রত্যুত্তর করিল যেমন তোমার শয্যাতে যাইতে ভয় নাই, তেমন আমারও জাহাজে ভয় নাই.

তাৎপর্য্য.

যে ব্যক্তি যে ব্যবসায় করে মৃত্যুভয়ে সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে তাহার চলে না, যেহেতুক মৃত্যুভয় কোন সময়ে কোন ব্যক্তির না আছে.

রামকমল সেনের হিতোপদেশের কতকগুলি গল্প বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা'তেও অন্যরূপে পাওয়া যায়।

হিতোপদেশ নীতি শিক্ষা দানোদ্দেশ্যে রচিত হয় এবং বাঙলা ভাষা শিক্ষার জন্য রাধাকান্ত দেব 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' রচনা করেন। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮২১ খৃস্টাব্দ। বলা বাহুল্য যে, গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন স্কুল-বুক সোসাইটি।

এই গ্রন্থে বাঙলা বর্ণমালা, উচ্চারণ, বানান, প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, গণিতাদির সংকলন ছিল। গ্রন্থখানি রচিত হয় 'প্রাচীন-কালের পাঠশালার ব্যবহার্য্য'।

১৮২০ ও ১৮২১ খৃস্টাব্দে একদিকে বাঙালীর শিক্ষাজগতে নূতন ধারার আগমন এবং বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে সুন্দর ইমারত গঠনের সূত্রপাত আর সেই সময়েই অপরদিকে বাংলার এক অবিস্মরণীয় পুরুষের আবির্ভাব, যিনি সমাজ-সাহিত্য-

শিক্ষায় সংস্কার ও শক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন। বলছি, ১৮২০ খৃস্টাব্দ ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা। তাঁর আবির্ভাব বাংলার জাতীয় জীবনে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেব স্কুল-বুক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। দেববাহাদুরের গৃহে সোসাইটি তাঁদের মুদ্রিত পুস্তকগুলি মজুদ রাখতেন।

হিতোপদেশের প্রারম্ভে সোসাইটি এক জায়গায় বলছেন :

ইংলণ্ডীয় ভিন্ন এই সোসাইটির অন্তঃপাতী এই ২ মহাশয়েরা আছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন, মৌলবী হায়দরালী, মৌলবি মহম্মদ রসিদ, সৈয়দ কাজী আবদুল হামেদ, মীর তুফান আলী খাঁ, মৌলবী উলিয়ৎ হোসেন।

অবশ্য উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়াও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র ও মৌলবি কারাম হুসেনও সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তারিণী-চরণ মিত্র ও মৌলবি কারাম হুসেন ছিলেন সোসাইটির দেশীয় কর্মসচিব (Native secretary)।

যাহোক, 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে' যে প্রবন্ধগুলি আছে সেগুলির মধ্যে ঋতু বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু এগুলি যে মৌলিক রচনা নয়, একথা জোর করে বলা যায় না, যদিও প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রারম্ভে ইংরেজীতে প্রবন্ধটির নাম মুদ্রিত আছে এবং স্কুল-বুক সোসাইটির রীতি ছিল বিষয়টি প্রথমে ইংরেজীতে রচনা করে পরে তার বাঙলা তর্জমা করা। এইভাবে বাঙলা গদ্য একটি, বিশেষ করে ইংরেজীর, রূপ পায়। প্রবন্ধগুলি পাঠে মনে হয় ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা এবং বাক্য মধ্যে বা শেষে যতি চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না। পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে এই রীতি ব্যবহৃত হয় নি এবং সেগুলির ভাষাও ছিল অনেক সহজ।

আমাদের বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হোল।

Of the dewy Season—শিশির ঋতু বর্ণন

শিশিরে অধিক শীত হয় দিক সকল বাত বৃষ্টিতে আকুল হয় অধিক ধন দর্শনে দরিদ্রের যাদৃশ লোভ জন্মে ধূমশূন্য অগ্নি লোকের তাদৃশ লোভ জন্মায় বন্ধু লোকের কটু বাক্যের ন্যায় বায়ু অতিশয় পীড়াদায়ক হয় অপুত্রক ব্যক্তির পুত্র লাভে যাদৃক্ সুখ হয় সূর্য্যের কিরণ সকলের তাদৃক্ সুখদায়ক হয় সর্প দর্শনে যেমন ভয় জন্মে সুশীতল জল দর্শনেও তেমন ভয় হয়।

Of the clear Season—শরদৃতু বর্ণন

বর্ষাকালে জল নানা পথে গমন করে শরৎকালে আপনার স্বভাব পায় এবং নির্ম্মল হয়। লোক সকল নানা স্থানে গমনাগমন করে। পৃথিবীর কর্দ্দম অল্পে অল্পে দূর হয় মেঘ সমুদায় জল পরিত্যাগ করিয়া শুক্লবর্ণ হইয়া কোন ২ স্থানে দীপ্তি পায় আকাশ নির্ম্মল হয়। কোন ২ পর্ব্বতের ঝোরা হইতে পৃথিবীতে জল পড়ে। অগাধ জলেতে বাস করে যে জলচর তাহার দিগের সে জল ক্রমে ২ ক্ষয় হয় তাহা তাহার দিগের বোধ হয় না। লতা সমস্ত পরিপক্ক হয় সমুদ্র স্থির জল হয়। কর্ষক সকল আলি বান্ধিয়া ভূমিতে জল রাখে দিবাতে সূর্য্য কিরণে সন্তপ্ত যে সকল লোক তাহার দিগের সন্তাপ রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ে দূর হয়। আকাশ মেঘশূন্য হইয়া নির্ম্মল নক্ষত্রোদয়ে অতিশয় শোভা পায় পূর্ণচন্দ্র নক্ষত্রগণ সহিত অতিশয় দীপ্তি পান। কিঞ্চিৎ শীতোষ্ণ বায়ু পুষ্পগন্ধ যুক্ত হইয়া লোকের সন্তাপ হরণ করেন। গো মৃগ পক্ষি স্ত্রী রজস্বলা হইয়া নিজ নিজ পুরুষ যুক্ত হয়। সূর্য্যোদয়ে কুমুদ ব্যতিরিক্ত জলজ পুষ্পের প্রকাশ হয় নবান্ন ভক্ষণের নিমিত্তে লোকের নানা উৎসব হয়। বণিক এবং মুনিগণ ও রাজগণ নানা স্থানে গমন করিয়া আপনার দিগের অর্থ চেষ্টা করেন।

পত্রিকা ছাড়া পূর্বের গ্রন্থগুলিতে ঋতুবর্ণন দেখা যায় না এবং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধেরও অভাব। তবে 'মনোরঞ্জনেতিহাসে' পাঁচটি প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্বেই প্রসঙ্গত করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির ঋতুবর্ণন যে সংস্কৃত কবিদের, বিশেষ করে কালিদাসের ঋতুবর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। পাঠশালার ছাত্রগণের পক্ষে রচনাগুলি কি ভাষা, কি ভাব সব দিক দিয়েই অনুপযোগী, তা তারা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বালক হোলেও। তার ওপর জীবকুলের স্ত্রীজাতি ঋতুমতী হওয়ার অবস্থা ও সংবাদ আমাদের বিংশ শতাব্দীতে তো বটেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেও বালক-বালিকাদের কাছে গোপন রাখার রীতিই পালন করা হয়। এমন কি চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়া যে রচনায় যৌনসম্পর্কীয় কোনরূপ বর্ণনা বা সামান্য ইঙ্গিতও থাকে তা অশ্লীল বলে নিন্দিত হয়ে থাকে। সে রচনা পাঠ বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের—বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের—পক্ষে নিষিদ্ধ। একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে' লেখক ছাত্রদের অশ্লীলতাও শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলতে হবে, এটা তাঁর ওপর সংস্কৃত কাব্যেরই প্রভাব। আর সংস্কৃত কাব্য যে অশ্লীলতা দোষদুষ্ট তা বিদগ্ধজনেরা স্বীকার করেন না। তবে বিদ্যাসাগর-যুগে এ রীতি বিশেষ দেখা যায় না।

আলোচ্যমান গ্রন্থখানির দু' বৎসর পরে ১৮২৩ খৃস্টাব্দে কলকাতায় 'গৌড়ীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার অনুশীলন। এই সময়েই কলকাতায় ট্রাক্ট সোসাইটি, ক্রিশ্চিয়ান নলেজ সোসাইটি ও এশিয়াটিক সোসাইটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে'র প্রকাশের পর বৎসর কয়েকের মধ্যে আর কোনও শিশুপাঠ্য বাঙলা সাহিত্যগ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই না। স্কুল-বুক সোসাইটি প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায়ও সেরূপ কোনও গ্রন্থের নামও দেখা যায় না। তবে ফেলিকস কেরী রচিত জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগেসে'র বঙ্গানুবাদে 'যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' ১৮২১ খৃস্টাব্দে

প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থখানি শিশু-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। মূল গ্রন্থখানিও সাধারণত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণই পাঠ করেন। কিন্তু মূল ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। সে কারণ উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর ১৮২৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ছোট হেনরী' নামে গল্প পুস্তক। পুস্তকখানি রচনা করেন শ্রীমতী সিয়ার উড। গল্পটির নায়ক হেনরি একটি অনাথ বালক। অবিশ্যি গল্পটির রস খৃস্টধর্মোপদেশের দরুন কিছুটা ব্যাহত। এবং কিয়দংশ প্রচারমূলক হোলেও এখানি বাঙলা শিশু-সাহিত্যে নিছক গল্প পুস্তকরূপে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। তার ওপর গ্রন্থখানি বিদ্যালয় পাঠ্যও ছিল না, রচনায় লেখিকার কল্পনার অবকাশ ছিল। এই থেকে দেখা যায় সেকালে কেবল ইংরেজ পুরুষগণের মধ্যেই কেউ কেউ বাঙলা ভাষার চর্চা করতেন এবং বাঙলায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, মহিলাগণের মধ্যেও এ বিষয়ে কেউ কেউ উৎসাহী ছিলেন ও পারদর্শিতা লাভ করেন। শ্রীমতী সিয়ার উড বঙ্গললনাগণেরও পূর্বে বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলতে হয়। বাঙলা গদ্য রচনায় ও শিশু-সাহিত্যে তাঁর দান স্বীকার্য।

এই গ্রন্থের বারো বৎসর পরে, ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বিবিধ বিষয়ক নীতিগল্পমূলক গ্রন্থ 'জ্ঞানাঙ্কুর'। গ্রন্থখানি ছিল খুবই ছোট ; পত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ১৬ খানি। গ্রন্থখানিকে পূর্বের 'নীতি-কথারই' অনুকরণ বলা যায়।

এই বৎসরেই খৃস্টান ট্রাক্ট ও বুক সোসাইটি প্রকাশ করেন 'সদাচারদীপক'। গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৮ কিন্তু মূল্য ছিল মাত্র অর্ধ আনা। গ্রন্থখানি এতটা জনপ্রিয় হয় যে একাদিক্রমে ১৯শ বৎসর প্রচলিত ছিল। জনপ্রিয়তার কারণ, গ্রন্থের বিবিধ বিষয়ক গল্প। আবহমানকালই মানুষের মন গল্পপিপাসু। সকলেই অল্পবিস্তর গল্প বলে ও শোনে এবং যখন থেকে গল্প লেখা শুরু হয়েছে তখন থেকে পাঠকমহলও সৃষ্ট হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে

যেমন দু'-একজন করে বঙ্গভাষার লেখকের আবির্ভাব হচ্ছিল তেমনি বিস্তৃত ও গঠিত হয়ে পড়েছিল পাঠকমহলও। কাজেই তাদের গল্পরসপিপাসু চিত্ত যে গ্রন্থখানিকে সাগ্রহে গ্রহণ করবে এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তার ওপর তখন বাঙলা গল্পপুস্তক বিরল। 'সদাচারদীপকে'রও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সুকুমারমতি পাঠকমহলের নৈতিক চরিত্র উন্নত করা, তাদের ভগবদ্বিশ্বাসী সত্যবাদী, পরোপকারী ও সাহসী করে গড়ে তোলা। এইসঙ্গে কিছু পরিমাণে খৃস্ট মাহাত্ম্য ও খৃস্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টাও যে না ছিল তা নয়। তবুও গ্রন্থখানির দু'-একটি গল্পে সাহিত্যরসসৃষ্টির প্রয়াস স্পষ্ট। বিশেষত একটি বালক-ভৃত্যের মনে লোভ ও সততার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখিয়ে তার চরিত্রকে পরিস্ফুট করা হয়েছে তা মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের পর্যায়েই পড়ে। এই ধরনের গল্প পূর্বে আর একটিও পাই নি। তবে চরিত্রগুলির কোনটি রচয়িতার সৃষ্ট নয়। চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক চরিত্রও গল্প, নাটক ও কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। তার বহু প্রমাণ দেশী-বিদেশী সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অপরাপর শিশুপাঠ্য-গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থখানির উল্লেখ ১৩০২ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় দেখা যায়। সদাচারদীপকের নামপৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

> সুবাক্য মধুর চাকের ন্যায় অর্থাৎ মনের প্রতি মিষ্ট ও অস্থির বলদায়ক।

নিম্নে একটি গল্প উদ্ধৃত হোল :

পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টাকারি একজন নাবিকের কথা।

ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমাদের প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

১৭৭৭ শনে ফ্রান্স দেশের রোছেন নামক নগর হইতে আটজন নাবিক ও দুইজন চড়নদার লবণপূর্ণ এক জাহাজ লইয়া

রাত্রিযোগে ডিয়েপ নগরে আসিতেছিল। সে সময়ে বায়ু এমত প্রবল ও সমুদ্রের ঢেউ এমত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, যে পথপ্রজ্ঞ এক ব্যক্তি ঘাটে জাহাজ আনিবার নিমিত্তে চারিবার তাহার নিকটে যাইতে চেষ্টা করিলেও যাইতে পারিল না। পরে বুসার্ড নামক আর একজন সাহসী পথপ্রজ্ঞ দেখিলেন যে, জাহাজের অধ্যক্ষ সেই ঘাটে আসিতে পথ ভুলিয়াছে, তন্নিমিত্তে তিনি তূরির শব্দেতে ও ইশারা দ্বারা তাহাকে পথ জানাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ঘোর অন্ধকার ও প্রবলবায়ুপ্রযুক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইল না। ইতিমধ্যে সেই জাহাজ ঘাটে না আসিয়া তীর হইতে এক রসী দূরে এক প্রস্তরময় স্থানে ঠেকিয়া হেলিয়া পড়িল, তাহাতে নাবিকেরা অতিশয় ভীত হইয়া চেঁচাইতে লাগিল। বুসার্ড সাহেব নাবিকেরদের বিপদ দেখিয়া ও চীতকার শুনিয়া দয়ার্দ্র-চিত্ত হইলেন, এই জন্যে আপন স্ত্রী ও পরিবারের ও অন্য লোকের বাধা না মানিয়া প্রাণপণে নাবিক-দিগকে রক্ষা করণার্থে চেষ্টা করিলেন। ফলত কোমরে এক গাছ রসী বান্ধিয়া ও তাহার অগ্রভাগ তীরেতে বান্ধিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণপূর্ব্বক জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি প্রায় জাহাজের নিকটে পৌঁছেন এমতকালে হঠাৎ এক প্রবল ঢেউ আসিয়া তাহাকে একেবারে তীরেতে নিঃক্ষেপ করিল। এই প্রকারে তিনি অনেকবার জাহাজের নিকটে পৌঁছেন এবং তৎক্ষণাৎ তরঙ্গদ্বারা স্থলেতে নিঃক্ষিপ্ত হয়েন। ইতিমধ্যে একবার জাহাজের নিকট যাইতে ২ এক ঢেউ আসিয়া তাহাকে জাহাজের নীচে ডুবাইয়া দিলে তীরস্থ লোকেরা এই অনুমান করিল, এবার তাহার প্রাণনাশ হইয়াছে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি একজন জলমগ্ন নাবিকের সহিত ভাবিয়া উঠিয়া তাহাকে তীরে আনিলেন। শেষে তাহার জাহাজারোহণের চেষ্টা সফলা হইলে তিনি যে রসী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তদ্দারা আপনি এবং সকল নাবিকেরা নিরাপদে ক্রমে ২ তীরে আইল। পরে জাহাজের

সকল লোক রক্ষা পাইয়াছে বুঝিয়া তিনি তীর হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থ এক ঘরে বিশ্রামার্থ যাইয়া অনেক আঘাত প্রযুক্ত অতি দুর্ব্বল হইয়া সেখানে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। কিন্তু আত্মীয়বর্গ ঔষধাদিদ্বারা শুশ্রূষা করাতে তিনি শীঘ্র উপশম পাইয়া পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া উঠিলে পর সেখানকার কোন ব্যক্তি বলিল, বুঝি জাহাজের উপরে এখনও কেহ আছে, কারণ তাহাদের চীতকার শোনা যাইতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র ঐ দয়ালু সাহেব আপন শুশ্রূষাকারিরদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে লম্ফ দিয়া সন্তরণপূর্ব্বক জাহাজের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে জাহাজের উপর উঠিলে একজন চড়নদারকে পাইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা দুইজনেই নিরাপদে তীরে পৌঁছিল। পরে সেই নগরের কর্ত্তা এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তদ্বিষয়ে বাদসাহের প্রধান মন্ত্রির নিকটে পাঠাইলে সেই মন্ত্রি বাদসাহের আজ্ঞানুসারে স্বহস্ত লিখিত এক প্রশংসাপত্র পাঠাইলেন সেই পত্র এই।

হে সাহসিক মনুষ্য আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখে তুমি যে দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছ, তদ্বিষয় আমি পরশ্বোজ্ঞাত হইয়া কল্য শ্রীযুক্ত বাদসাহকে জানাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অতি প্রশংসাপূর্ব্বক তোমাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার ও ৩০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিতে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। হে সাহসিক মনুষ্য; তুমি পরের উপকারার্থে সর্ব্বদা এইরূপ কর্ম্ম করিও; সাহসিক লোকের পুরস্কারকারি আমাদের বাদসাহের মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকটে নিত্য নিত্য প্রার্থনা করিও। ইতি।

এই গ্রন্থের দু' বৎসর পরে ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় গোপাল-লাল মিত্রের 'জ্ঞানচন্দ্রিকা'। গ্রন্থখানির নামপৃষ্ঠায় প্রথমে ইংরেজীতে গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নিচে তার বাঙলা তর্জমা দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানচন্দ্রিকা ॥

অর্থাৎ

বহুবিধ উত্তম উত্তম ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক হইতে
নানাবিধ নীতি সংগ্রহপূর্ব্বক
শ্রীযুক্ত গোপাললাল মিত্র কর্ত্তৃক উত্তম গৌড়ীয় সাধুভাষায়
অনুবাদিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইল।
Calcutta
Printed by Brojomohan Chukravartee,
At the Goonankur Press
1838

ইংরেজী ভাষা থেকে বাঙলায় তর্জমা তখনও হোত, এখনও বিস্তর হয়। কিন্তু 'বাঙ্গালা পুস্তক হইতে' 'উত্তম গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত' কি করে হয় তা বোঝা যায় না। তখন নীতিবিষয়ক বাঙলা গল্প 'পুস্তকে'র সংখ্যাও ছিল নিতান্ত অল্প। যেগুলি ছিল সেগুলিও ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় নীতি গল্পের তর্জমা। মিত্র মহাশয় যদি সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য বাঙলা গ্রন্থের আভাস দিয়ে থাকেন তাহলে বলতে হয় আমরা যেগুলির কথা জানতে পেরেছি সেগুলির বাইরে তখন নীতিবিষয়ক বাঙলা গল্পগ্রন্থ আরও ছিল। আমাদের তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু জ্ঞানচন্দ্রিকায় 'অনুষ্ঠানপত্রে' গ্রন্থকার পুনরায় লিখছেন :

> এতদ্দেশীয় (বালকাদি সাধারণ জনসমূহের) কিতাবত কি ভাব. সাধারণ জ্ঞানানুশীলনার্থ সুললিত প্রচলিত সাধু সরল শব্দ সম্বলিত কোন বিশেষ পুস্তক প্রচারিত না থাকাতে ত্রিবিধ দোষের হেতু হইতেছে অর্থাৎ প্রথমতঃ কিয়দংশ উৎসাহান্বিত মহাশয়ের মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতা জন্য আক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সচ্ছাস্ত্রানভিজ্ঞ জনেরদের সর্ব্বদাই পরকান্তাধরামৃত পানেচ্ছাদি নানাবিধ নিন্দাজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তৃতীয়তঃ ভাষাভূষিত নীতিবিষয়ক গ্রন্থ বিরহে ...

যথাসাধ্য বিদ্যাবুদ্ধিক্রমে প্রচুর প্রযত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক বহুবিধ ইংরাজী নীতিবিষয়ক গ্রন্থ ও সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে উত্তমোত্তম পদার্থের তাৎপর্য্য সমুদায় সংক্ষেপে সার সঙ্কলন দ্বারা সংগ্রহ করিয়া যুক্তিযুক্তমতে পুঞ্জ প্রকরণে অভিনব রুচি রচনায় (জ্ঞানচন্দ্রিকানামিকা) এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটন করিলাম . ···

এই অবস্থায় গ্রন্থকার 'বাঙ্গালা' অথবা 'সংস্কৃত হিতোপদেশে'র মধ্যে কোনটি থেকে গ্রন্থের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝা দুষ্কর। আমরা যতটা জানি তখন বাঙলা গ্রন্থের অপ্রতুলতা ছিল। নীতিবিষয়ক যে কয়খানি বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশেরই উল্লেখ ও আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। তবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য হিতোপদেশাদির উল্লেখ ও আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজন বোধে বাদ দিয়েছি। অবিশ্যি সে সকল পুস্তক থেকেও বহু নীতিবিষয়ক গল্প বালকদের জন্য গ্রহণ করা হয়। কারণ তখন সমুদায় বাঙলা গদ্য সাহিত্যের অবলম্বনই ছিল প্রধানত ইংরেজী ও সংস্কৃত, বিশেষ করে হিতোপদেশাদি নীতিবিষয়ক গল্পপুস্তক।

গ্রন্থকার সম্ভবত বিনয়প্রকাশপূর্বকই লিখেছেন 'এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটন করিলাম'। ঘটনা কিন্তু এর বিপরীত। কারণ গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৯০ খানি। গ্রন্থখানি প্রধানত বালকদের জন্যই রচিত হয়। বহু উপাখ্যানে গ্রন্থকার বালকগণকেই সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থখানির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'স্বকীয় দেশ প্রতি স্নেহ।' গোটা প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

স্বকীয় দেশ প্রতি স্নেহ।

আপনার দেশ ও দেশস্থের প্রতি আদর ও মান্যতা ও ভক্তি ও স্নেহ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহার দ্বারা সাধুতা হয় সাধুতা দ্বারা পরম জ্ঞান তদ্দ্বারা পরম সুখ হয়। আর স্বদেশস্থ যদ্যপি নীচ ও

নিন্দনীয় হয় তথাপি তাহাকে আদর করিবেন এবং স্বদেশ যদি মরুভূমি হয় তথাপি তাহাকে প্রশংসা করিবে কারণ সকলের প্রতি স্নেহ করিলে লোক প্রীত হয় তাহাতে বসতির অতি সুখ হয় অপর আত্মীয়ানাত্মীয় সকলের সুখ চেষ্টা হেতু কোন জন সহ শত্রুতা থাকে না আর অতি প্রবল রিপু কাম ক্রোধ ও হিংসা প্রভৃতি থাকে না এবং সকলের সুখ চিন্তন দ্বারা সমভাবোদয় হয় তদ্দ্বারা শীঘ্র জ্ঞান ও পরম সুখ প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে জন্মস্থান ও বসতিস্থান ও জননীকে অধিক আদর করিবে আরো কহিয়াছেন যে স্বীয় দেশস্থ নীচ হইলেও তাহাতে বন্ধু জ্ঞান ও বন্ধুর ন্যায় আদর কর্ত্তব্য। ইহাও লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে দেখ অতি দূর দেশস্থ এক ব্যক্তির যদি স্বদেশীয় কোন জন সহ সাক্ষাৎ হয় তবে সেই প্রবাসস্থ ব্যক্তির যে কিরূপ আহ্লাদ জন্মে তাহা কি কহিব আপনারা অনুভব করিলে জানিতে পারিবেন। অপর স্বদেশস্থ যদি কেহ নীচ কিংবা শত্রুই হয় তথাপি কোন জনের আপদ উপস্থিত হইলে স্বদেশস্থ যে প্রকার তাহার আপচ্ছান্ত্যর্থে চেষ্টা পায় সেই প্রকার অন্য দেশস্থ ভদ্র ও বহুকাল সংসর্গ হইলেও করেন না। আর অনুভব করিবেন যে পশু পক্ষি প্রভৃতি যদি কোন কারণ বশত দেশান্তর গত হয় কিঞ্চিৎ-কালান্তর স্বদেশীয় কোন পশুপক্ষীর সহিত সংদর্শন হইলে সেই পশু পক্ষী অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েন। এবং সেই পশ্বাদি পুনর্বার আগমন করিলে তাহার বোধ হয় যে প্রাণ পাইলেন আর মনুষ্যাদির যে হইবে তাহার কি আশ্চর্য।

ইহার উদাহরণ। কাঞ্চিপুর নিবাসি করুণাশূন্য করুণাময় নামক এক রাজপুত্র ছিলেন তাঁহার সতত স্বদেশীয় জনের প্রতি দ্বেষ ছিল তাহাতে সকল সহ শত্রুতা ও বিরোধ হওয়াতে সর্ব্বদা অতিশয় অসুখ হইত অনন্তর একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে কিঞ্চিৎকাল দেশ ভ্রমণ কর্ত্তব্য। পরে বহু দিবসাবধি নানা দেশ ভ্রমণ করত ২ একদিন এক স্থানে এক

স্বদেশস্থ পরমরিপু সহ সংদর্শনে অতিশয় আহ্লাদে মগ্ন হইয়া স্বাগতাদি প্রশ্ন দ্বারা সেই শত্রুকে সন্তুষ্ট করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক স্বদেশপ্রতি করুণাময়ের করুণা হইল। অনন্তর করুণাময় ঐ শত্রুসহ স্বগৃহে আগমন করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশস্থের প্রতি অতি স্নেহ প্রকাশ করত ২ করুণাময়ের সকল শত্রু মিত্র হইলেন তাহাতে সর্ব্বদা সুখ হইলে করুণাময় স্বদেশস্থ সকলজনের প্রতি সমান জ্ঞান করত ২ কামাদি শত্রু সংঘের শমতাপূর্ব্বক পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইলেন অতএব তোমরা স্বদেশস্থের প্রতি সমান মতি করহ তাহাতে পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইবে।

এই প্রবন্ধটির পূর্বে আর কোনও বাঙালী লেখক রচনার মাধ্যমে বাঙালীর মনে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, এমন নিদর্শন আমরা পাই নি। কবি ঈশ্বর গুপ্তও তাঁর 'স্বদেশ' কবিতায় বাঙালীর অন্তরে দেশপ্রেম জাগ্রত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সে কবিতাটি প্রকাশিত হয় তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকরে'। সংবাদ-প্রভাকরের প্রকাশকাল 'জ্ঞানচন্দ্রিকা'র চার বৎসর পরে ১৮৪২ খৃস্টাব্দ (১২৪৯ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ মাসে)। কাজেই বলতে হয় জ্ঞানচন্দ্রিকা রচয়িতাই প্রথম বাঙালীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তবে এটা ইংরেজী শিক্ষারই ফল। জাতীয়তাবোধ ইংরেজদের মজ্জাগত। বিশেষত তারা যখন বিদেশে বাস করে তখন নানা ভাবে তা প্রকাশ পায়। ইংরেজী সাহিত্যে দেশাত্মবোধক রচনা বিস্তর। জ্ঞানচন্দ্রিকার এই প্রবন্ধটির সঙ্গে গুপ্তকবির 'স্বদেশ' কবিতার দু'-এক স্থানে চমৎকার মিল দেখা যায়। মনে হয় কবি প্রবন্ধটি পাঠ করেও থাকতে পারেন।

স্বীয় দেশস্থ নীচ হইলেও তাহাকে বন্ধুজ্ঞান ও বন্ধুর ন্যায় আদর কর্ত্তব্য।— জ্ঞানচন্দ্রিকা

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।' —স্বদেশ

কবি দেশবাসী সম্বন্ধে মিত্র মহাশয়ের চেয়েও উদার—'বন্ধুভাব' নয় তাঁর 'ভ্রাতৃভাব'। তবে তাঁর কবিতাটি বালক বয়সের পাঠকগণের

জন্য রচিত হয় নি যদিও এখন বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রগণেরই পাঠ্য।

জ্ঞানচন্দ্রিকার অনুষ্ঠানপত্রে লেখক লিখছেন :

সচ্ছাস্ত্রানভিজ্ঞ জনেরদের সর্ব্বদাই পরকান্তাধরামৃত পানেচ্ছাদি নানাবিধ নিন্দাজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি।

এই থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, তখন, আজ থেকে প্রায় এক শ' বিশ বৎসর পূর্বে, বাংলার জনসাধারণের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল? নতুবা গ্রন্থকার সে কথা দুঃখের সঙ্গে লিখবেন কেন? আবার এও দেখা যায় তখন নীতিশিক্ষা দানোদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকগণ সচেষ্ট। আজকের বাংলা দেশের অবস্থা আমরা চোখেই দেখছি। বর্তমানেও আমরা বালক-বালিকাগণকে নীতিশিক্ষা দানোদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করে থাকি। 'জ্ঞানচন্দ্রিকা'র অনেক পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে' নৈতিক অধঃপতনের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৫০ খৃস্টাব্দের বাঙলা সাপ্তাহিক 'সত্যপ্রদীপে'র একটি প্রবন্ধেরও শিরোনামা 'ডাকাইতি থামে না কেন?' আমাদের কালেও সংবাদ-পত্রেও ঠিক ঐ ধরনের প্রশ্ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সেকাল থেকে একালে বাঙালীর নৈতিক চরিত্র উন্নত বা সেই স্তরেই আছে? উপদেশের চেয়ে উদাহরণই অধিক কার্যকরী। আজকে নৈতিক চরিত্র উন্নত করার জন্য কোনটির প্রয়োজন অধিক, সাহিত্য অথবা উদাহরণ? বর্তমানের শিশু-সাহিত্যে নৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টার অভাব নেই এবং এমন কোনও শব্দ, ভাব বা বিষয়বস্তু রচনায় থাকে না যা সুকুমারমতি পাঠকবৃন্দের চিত্তবিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। সাহিত্যে এর সূত্রপাত করেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তবুও ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না কেন?

জ্ঞানচন্দ্রিকা যে কালে রচিত হয় সেকালটির ও আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের জীবনদর্শন এক নয় এবং তা হোতেও পারে না। নৈতিক মানবিচারে কতকগুলি বিষয়ে তাঁরা ছিলেন আমাদের চেয়ে উন্নত, আবার কতকগুলি বিষয়ে আমাদের কাল তাঁদের চেয়ে

উন্নত। আমরা সাহিত্যে শুচিতা রক্ষার প্রয়াসী। সেকালেও এমনটা হোত। তবুও সেকালের শিশুদের বর্ণপরিচয় ও বানান শিক্ষার পুস্তকে 'বেশ্যা', 'গণিকা' 'কামান্তক', 'মদোন্মাদিনী' প্রভৃতি শব্দও থাকতো (নীতিকথা, ১ম ভাগ) এবং 'বাঙ্গলা শিক্ষাগ্রন্থে' ঋতুবর্ণনায় স্ত্রীজাতির দৈহিক পরিবর্তনের কথাও শিশুদের শিখানো হোত। জ্ঞানচন্দ্রিকা 'নীতিকথা'র বিশ বৎসর এবং 'বাঙ্গলা শিক্ষাগ্রন্থে'র সতেরো বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। এই সময়ের মধ্যেও ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধেও শিশু-সাহিত্য রচয়িতার রুচির পরিবর্তন ঘটে নি! কেবল তখনই নয়, ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে খৃস্টান স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গীয় পাঠাবলী ৪র্থ ভাগে'ও গ্রন্থকর্তা ঋতুবর্ণনায় এই বিষয়টির উল্লেখ দোষের মনে করেন নি! তখন সাহিত্যে এখনকার মতো শ্লীলতা রক্ষার জন্য সরকার এতটা যত্নবান ছিলেন কি না জানি না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্লীলতা ও কুরুচির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচনায় ঐ ধরনের ভাব বা শব্দ তো দূরের কথা একটি কর্কশ শব্দও ব্যবহৃত হয় নি। যেমন শুচিশুভ্র উন্নত ছিল তাঁর হৃদয় তেমনি নির্মাল্যের মতো নির্মল ছিল তাঁর রচনাবলী। বঙ্গীয় পাঠাবলীর আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, তৎপূর্বে জ্ঞানচন্দ্রিকার রচনা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

জ্ঞানচন্দ্রিকার নীতিশিক্ষার আরও একটি উদাহরণের কিয়দংশ এই :

বিদ্বানের দোষ গ্রাহ্য নহে ইহার উদাহরণ।

কোন উত্তম বিদ্বান ব্যক্তি যদি দোষপ্রাপ্ত হয়েন তথাপি বিদ্যা গৌরবে মহাজনসমীপে মর্য্যাদাভাগী হয়েন। তার দৃষ্টান্ত এই যে মহামহোপাধ্যায় মহাকবি কালিদাস বেশ্যাসক্ত হইয়াও বিশিষ্ট জন ও পণ্ডিত সমীপে সর্ব্বদামান্য ছিলেন কারণ গুণসমূহ-মধ্যে এক দোষ গণনীয় হয় না যেমত চন্দ্রের বহুতর গুণ কলঙ্ক এক দোষ। অতএব বিদ্বানের দোষ গ্রহণ না করিয়া তন্মুখ নির্গত কথামৃত পান করা কর্ত্তব্য যেমত বিষ্ঠা ভোজন করে যে

গবী বিশিষ্টলোকেরা তাহার দুগ্ধ পান করেন। এবং মূর্খের কথা শ্রবণও করিবেন না যেমন কুশমূলভক্ষক বন্য শূকরীর স্তন্যরস পেয় নহে। অতএব ওহে বালকেরা বিবেচনা করহ মূর্খ হইলে তাহার অশেষ দোষ জন্মে। তাহার উদাহরণ এই। যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস না করে সে ব্যক্তি সর্ব্বজন কর্ত্তৃক নিন্দনীয় হয় এবং সে জন যদি সপ্তদ্বীপাধিপতি হয় তথাপি সর্ব্বজনে তাহাকে মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করেন। এবং মূর্খের সম্পত্তি দর্শন করিয়া কোন পুরুষ বিদ্যাতে উদাসীন হয় কিন্তু নানা রত্নযুক্ত মূর্খব্যক্তি কদাচও যশস্বী হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে তীরভুক্তি নামে এক রাজধানী তন্নিকটে একগ্রামে রবিধর নামে এক মূর্খ ও অত্যন্ত ধনী ব্রাহ্মণ বাস করেন কিন্তু তাঁহার বাক্যশ্রবণে সর্ব্বলোকে উপহাস করেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে মনুষ্যেরা কহেন তাম্বুল মুখের ভূষণ কিন্তু আমরা বোধহয় যে, সংস্কৃতবাক্যই মুখের ভূষণ অতএব মূর্খের নিরন্তর অশুদ্ধ কথন খণ্ডন হয় না এই নিমিত্ত সাধুজন সমীপে সর্ব্বদা উপহাস পায়। এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস ও যশঃ সঞ্চয় না করে সে ব্যক্তি জনক এবং জননীর ক্লেশজনকমাত্র সে ব্যক্তির জন্ম বৃথা…

আলোচ্য প্রবন্ধটির উপমা লক্ষণীয়। মহাকবি কালিদাস ও গবীর যে দোষের উল্লেখ করা হয়েছে এ কালের শিশু-সাহিত্যে ঐ ভাব ও শব্দগুলি একেবারেই অচল এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এই কলঙ্ক শিশু-সাহিত্য থেকে দূর হয়েছে। মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে যেগুলি গ্রাহ্য বলে মনে হয় না।

জ্ঞানচন্দ্রিকার দু' বৎসর পরে ১৮৪০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'নীতিদর্শন'।

গ্রন্থখানি রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হিন্দু কলেজ পাঠশালার অগ্রসর ছাত্রগণের সম্মুখে নীতিবিষয়ক যে বাঙলাপাঠ বক্তৃতা (লেকচার) দেন সেগুলিরই সমষ্টি। গ্রন্থখানি

দুষ্প্রাপ্য। সেজন্য দেখবার সুযোগের অভাবে তার ভাষা ও নীতি-বিষয় সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারি নি। কিন্তু প্রসঙ্গত হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপনের ইতিহাসটুকু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার মূলে ছিলেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। ছাত্রগণকে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে বাঙলা ভাষা শিক্ষার ক্ষতি হচ্ছিল। এই অবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপিত হয়। পাঠশালায় বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হোতে থাকে। বিদ্যাবাগীশ পাঠশালার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

এই পাঠশালা স্থাপনের এক বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০ খৃস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেন। এই পাঠশালাটিও প্রায় একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। তবে এখানে ছাত্রগণকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্মও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কারণ, খৃস্টান মিশনারিগণ তাঁদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে হিন্দুধর্মবিরোধী শিক্ষা দিতেন। তাদের কাছে যীশু ও খৃস্টানধর্ম মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। ফলে হিন্দু ছাত্রগণের মনে তাদের ধর্ম, দেশ ও ভাষা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা জাগছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত এই পাঠশালার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাঠশালাটির পড়ুয়াদের জন্য শিশু-সাহিত্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থও রচিত হোতে থাকে। সাহিত্যের সহায়তায় জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টা হয়। ফলে শিশু-সাহিত্য পূর্বাপেক্ষা কিছু সমৃদ্ধি লাভ করে। মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের কথা এখনও শোনা যায়! মাতৃভাষায় শিক্ষার অন্যতম ফল—স্বীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। এ সত্য শতাব্দী পূর্বেও আমাদের দেশের মনীষিগণ উপলব্ধি করেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। উভয়েরই জন্ম একই সনে, ১৮২০ খৃস্টাব্দে। বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষ ভাবে শিশু-সাহিত্যে তাঁদের দান অমূল্য ও অবিস্মরণীয়। বালকগণের

জন্য সাহিত্য রচনায় উভয়েরই যত্ন ও চেষ্টা ছিল অপরিসীম এবং উভয়েরই রচনা বহুকাল ছিল শিশু-সাহিত্যিকগণের আদর্শস্বরূপ। বাঙলা ভাষার উন্নতির মূলে ছিলেন উভয়েই। উভয়কেই মুখ্যত শিশু-সাহিত্য রচয়িতা বলা যায়। এটা সকলকালের শিশু-সাহিত্যিক-গণের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার ও অনুপ্রেরণার বিষয়। মাতৃভাষা ও দেশের প্রতি গভীর দরদের ফলে প্রথম তিনিই সেকালে বিরাট জনসভায় বাঙলায় বক্তৃতা দেন। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে এ কাজ ছিল অতি দুরূহ। কারণ বাঙলা ভাষা তখন নিজ দেশেই ছিল অনাদৃতা এবং অশিক্ষিতের বুলি। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে যে বিরাট জনসভা হয় অক্ষয়কুমার তাতেই বক্তৃতাটি দেন। বক্তৃতাটি কতকগুলি কারণে উল্লেখযোগ্য। এ কারণ কিয়দংশ উদ্ধৃত হোল। তিনি বলেন :

> ইদানীং কলিকাতা নগরে বঙ্গভাষা অনুশীলনের যে নানা প্রকার বিদ্যার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে, এবং তত্রত্য মনুষ্যেরা স্বদেশের মঙ্গলবৃদ্ধির নিমিত্তে যেরূপ উদযোগি হইতেছেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া দেশহিতৈষি ব্যক্তি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়েন, পরন্তু তৎপরক্ষণেই তিনি পল্লীগ্রামের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া পরম ক্ষোভযুক্ত হয়েন। যখন তিনি নগর এবং গ্রাম এই উভয় স্থলের অবস্থা বিবেচনা করেন তখন তাঁহার মনে কি অগণ্য বিপরীত-ভাবের উদয় হইতে থাকে। একদিকে তিনি দৃষ্টি করেন বিদ্যা অতি উজ্জ্বল বেশে দ্রুত বেগে আগমনপূর্ব্বক লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন, অন্যদিকে অজ্ঞানের পরাক্রমে লোকের অন্তঃকরণ জড়তায় আচ্ছন্ন হইতেছে। একদিকে মনুষ্যেরা স্বদেশীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া দেশের হিতোন্নতি করিতে চেষ্টিত হইতেছেন অন্য দিকে গ্রামবাসিরা দলাদলি দ্বেষ করতঃ একতার বিচ্ছেদপূর্ব্বক দেশের হিতকল্পে অনুরাগশূন্য রহিয়াছেন। …

এই থেকে তখনকার গ্রাম ও শহরের অবস্থার পার্থক্য বোঝা যায়। এখন অবস্থা কিছু বদলেছে। গ্রামকে সকল দিকে উন্নত করার একটা চেষ্টা দেখা দিয়েছে। তারপর তিনি বলছেন :

> ··· এক্ষণে যদিও কলিকাতা নগরস্থ এবং তাহার নিকটস্থ কতিপয় গ্রামবাসি অনেক যুবক ইংরাজি ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, তথাপি ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজী বিদেশীয় লোকের ভাষা, সুতরাং তাঁহারা যদি দৈবাৎ এ দেশ হইতে বিরল হয়েন তবে কোন ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবেক ? এবং স্বদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ এবং উপদেশকের অভাব সত্ত্বে কোন্ ব্যক্তি আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শক্ত হইবেক ? আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি। পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি এবং খৃস্টীয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এ দেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিছুকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় বিভেদ থাকিবেক না—তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের ভাষা হইবেক। ···

বর্তমানে ইংরেজ আর ভারতের শাসনকর্তা নয়। ভারত প্রজাতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র ও স্বাধীন। ইংরেজগণ এদেশে এখন 'বিরল'। কিন্তু বিষম সমস্যা দেখা দিয়েছে—ভারতের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে। অক্ষয়কুমার শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—'তাঁহারদিগের ভাষাই এ দেশের জাতীয় ভাষা হইবেক।' তাঁর শঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। অক্ষয়কুমারের অন্তর বিদেশী শাসনে অশান্ত হয়ে উঠেছিল, একথা তাঁর বক্তৃতা থেকেই জানা যায়। আরও জানা যায়, বিদেশীদের শাসন সুখের

ছিল না, সাধারণেও তা অনুভব করতো। নতুবা তিনি জনসভায় মুক্তকণ্ঠে তার উল্লেখ করবেন কেন? ঐ বক্তৃতার সময় অক্ষয়কুমারের বয়স ছিল মাত্র তেইশ বৎসর। বক্তৃতাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। অক্ষয়কুমারের শিশু-সাহিত্য রচনাবলীর প্রকাশ বিদ্যাসাগর-যুগে। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮৪০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানপ্রদীপ ১ম খণ্ড'। গ্রন্থ ভূমিকায় তর্কবাগীশ লিখছেন:

> কৈলাসদেব নামে কোন রাজ্যপাল ছিলেন তিনি মলয়দেব নামক স্বপুত্রকে নীতিশিক্ষা নিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় হরিহরাচার্য্যের নিকট সমর্পণ করেন অনন্তর হরিহরাচার্য্য উক্ত রাজকুমারকে জ্ঞানপ্রদীপে লিখিত বিষয় সকল শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা ইহা স্বীকার করিয়া জ্ঞানপ্রদীপ প্রস্তুত করিলেন। রচনাকারক অঙ্গীকার করেন, অন্যান্য মান্য লোকেরা যে সকল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন, জ্ঞানপ্রদীপাপেক্ষা তাহা উত্তম হইয়াছে এবং রচনা বিষয়ে অবশ্য তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে কিন্তু সাহস এই যে নির্ম্মলস্বভাব লোকেরা স্বভাবগুণে তাঁহাকে সাহস প্রদান করিবেন, বালকদিগের বঙ্গভাষা শিক্ষার্থ এই পুস্তক প্রস্তুত হইল এবং নীতি বিষয় লিখিত এই আরো চারিখণ্ড হইবে, গ্রন্থকর্ত্তা এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহা প্রাপ্ত হইলে আনন্দিত হইয়া চারিখণ্ড অবিলম্বে একাদিক্রমে প্রকাশ করিতে পারেন।

গ্রন্থ-ভূমিকা পাঠে জানা যায় গ্রন্থখানি রচিত হয় বালকদের জন্য এবং রচনার উদ্দেশ্য ছিল নীতিশিক্ষা দান। সে কারণ, গ্রন্থের কাহিনীগুলি নীতি বিষয়ক। কিন্তু গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হয় না এবং গ্রন্থকারের অভিলাষ সত্ত্বেও মাত্র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। আবার, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় প্রথম খণ্ডের বারো বৎসর পরে, ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ডের কোনও ভূমিকা ও নির্ঘণ্ট ছিল না। দ্বিতীয় খণ্ডের কথা যথাস্থানে বলা হয়েছে।

প্রথম খণ্ডের প্রথম কাহিনীর কিয়দংশ এই :

> এক সময়ে কোন গর্হিত ব্যাপার দর্শন করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাতে কালিদাস অপমানিত হইয়া বিক্রমাদিত্যের অধিকার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্দীপনরাজ্যে চন্দ্রকুমার নৃপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, পণ্ডিত লোকের নীতি আছে কোন রাজার সহিত সাক্ষাৎকালে কবিতা পাঠ করিয়া ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করেন সেই নিয়মানুসারে কালিদাস এক উত্তম কবিতা পাঠ করিয়া চন্দ্রকুমার নৃপতিকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন কিন্তু কবিতা পাঠে কালিদাসের যাদৃশ মর্য্যাদা অপেক্ষিত ছিল মহীপাল তাহা করিলেন না, কেবল সামান্য সমাদরে তাঁহাকে আসনমাত্র দিলেন তাহাতে কালিদাস অন্তর মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন ···

গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা। বাক্য শেষে পূর্ণবিরাম চিহ্নও ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠশালার পাঠ্য ছিল কি না এবং প্রকাশক কে তা জানা যায় না। তবে তখনকার শিশু-সাহিত্য ছিল পাঠ্যপুস্তক-ধর্মী। পত্রিকার বাইরে যা কিছু রচিত হোত সবই ছিল পাঠ্যপুস্তক।

১৮১৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খৃস্টাব্দ অবধি বাইশ বৎসরে বাঙলা শিশু-সাহিত্য কি ভাবে গড়ে উঠেছে তার মোটামুটি চিত্র এই। অবিশ্যি এই কালের মধ্যে শিশুপাঠ্য যে সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলিকেও ঐ সঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ হোল গদ্য সাহিত্যের বিকাশ, লিখিত কবিতা সাহিত্যের উন্মেষ কোথাও দেখা যায় না। তবে কোনও কোনও গ্রন্থের যেমন 'মনোরঞ্জনেতিহাস' ও সাময়িক পত্রিকা 'পশ্বাবলী'র কতকগুলি প্রবন্ধের প্রারম্ভে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দু'চার চরণ ছন্দোবদ্ধ শব্দ পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেগুলি কবিতা নয়। কবিতার ক্ষেত্রে এইরূপ শূন্যতার কারণ কি? অতীতে বাঙালী সুললিত ছড়া গেঁথেছে এবং অপরূপ রূপকথা রচনা করেছে। তখন এগুলিও নিশ্চয়ই মুখে মুখে

প্রচলিত ছিল। অনেক পরে এগুলি সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হয়। কিন্তু তখন শিশু-সাহিত্যে বাঙালীর কবি-প্রতিভা নিষ্প্রভ কেন? তখন শিশু-পাঠকগণের জন্য কেউ কবিতা লিখলেন না এর কারণই বা কি? গদ্যের আদর্শ ছিল ইংরেজী গদ্য। কবিতার ক্ষেত্রে আদর্শের অভাব অথবা ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী কৃষ্টির সঙ্গে তখন অবধি খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব না হওয়াই কি এই রিক্ততার মূলে বর্তমান ছিল? পরবর্তীকালে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই, বাংলার শিশু-সাহিত্যে কবিতার ক্ষেত্রে ক্রমে বিবিধ কবিতা-কুসুম প্রস্ফুটিত হোতে থাকে। এবং তাও ঘটে ইংরেজী শিক্ষার আওতায়, কতকটা ইংরেজীর আদর্শে। আরও কথা এই যে, ১৮১২ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খৃস্টাব্দ অবধি সময়টা কবি ঈশ্বরগুপ্তের কাল। কিন্তু তিনিও সুকুমারমতি পাঠকগণের জন্য কোনও কবিতাই রচনা করলেন না! সাহিত্যের স্রষ্টা মন। শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মনের বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন যা আয়ত্তে আনা সকলের পক্ষে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। এই বিশেষ অবস্থাটি লাভের জন্য অনুশীলনের আবশ্যক। কিন্তু গুপ্ত কবির প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁর পক্ষে শিশু-পাঠকগণের জন্য কবিতা রচনা কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। তিনিও এদিকে তাঁর প্রতিভা নিয়োগ করেন নি! অথচ মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথও শিশু-পাঠকগণের জন্য কবিতা রচনা করেছিলেন।

১৮৩০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার তেরো বৎসর পরে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির কর্মসচিব অষ্টম বার্ষিক সভায় তাঁর রিপোর্টে খেদ প্রকাশ করছেন ··· 'regret to say, that from the last Report your members (সদস্যগণের) have fallen off to less than a 100.' কিন্তু প্রথম দিকে সোসাইটির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০ জন। কর্মসচিব আবার বলছেন: '···and amongst that 100 I find the names of only 10 Native gentlemen.' অথচ এই বৎসরে দ্বারকানাথ ঠাকুর সোসাইটির সদস্য হন। পূর্বেই দেখা গেছে, ১৮২৩ খৃস্টাব্দে কলকাতায় ঐ ধরনের আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান

গড়ে উঠেছে। মনে হয়, কতকটা সেজন্য ও কতকটা এদেশীয়গণের মনে সোসাইটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় সোসাইটি এই ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পুস্তক প্রকাশ-ক্ষেত্রে তার প্রাধান্য খর্ব হোতে শুরু হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যে বাঙলা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশে সচেষ্ট হয় তার প্রমাণও পূর্বে কয়েকখানি বাঙলা পুস্তকের আলোচনাতেই আছে। সোসাইটি কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠান ছিল না। তার কাজ ছিল অষ্টম রিপোর্টের কথায় '......desire to afford books, the perusal of which may be the means of advance in the scale of civilisation of all the inhabitants of the British territories in India.'

সভ্যতার মান উন্নত করার কর্তব্যটা এদেশীয়গণের পক্ষে অসহনীয় বোধ হওয়ার হেতু সম্ভবত সোসাইটির দুর্বলতার আরও একটি কারণ ছিল। তথাপি সোসাইটির মৃত্যু ঘটে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকেও সোসাইটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে এবং পরে ঠিক কোন বৎসরে সোসাইটির বিলোপ ঘটে তা আমরা জানি না। তবে বিদ্যাসাগর-যুগেই তা ঘটে থাকবে। যে কারণগুলিই সোসাইটির দুর্বলতা ও পরে তার অবলুপ্তি ঘটাক বাংলার শিক্ষা ও শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রে তার দান স্বীকার্য ও অবিস্মরণীয়। সোসাইটি রচিত ও প্রকাশিত বাঙলা শিশু-সাহিত্যের রূপ সাহিত্যেরও নয়, শাশ্বতও নয়—পাঠ্যসাহিত্যের। সেজন্য তা কালগর্ভে বিলীন। তার ছন্দহীন ভাষা, শ্রীহীন রচনাশৈলী, পরানুকারিতা তার সার্থক হবার পথে বাধা ছিল। তবুও সোসাইটির লেখকবৃন্দ বর্তমান বাঙলা শিশু-সাহিত্যের পথিকৃৎ। বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্য, শিশু-সাহিত্যের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছে। সেই ভিত্তির উপরেই আজকের শিশু-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। মাতৃভাষা সম্বন্ধে সোসাইটির নীতি কি ছিল তা সোসাইটির কথায়ই জানা যায়।

'Let all the foreign tongue alone
Till you can read and write your own.'

১৮৪০ খৃস্টাব্দের পর থেকে কয়েক বৎসর বাঙলা শিশু-সাহিত্য কি ভাবে গড়ে ওঠে তা সেই সময়কার নূতন কোনও গ্রন্থের সন্ধান না পাওয়ায় আমরা জানতে পারি না। অনুমান, তখন কোনও মৌলিক রচনা সৃষ্ট হয় নি। কেন না তারপর অন্তত পঁচিশ বৎসর বাঙলা শিশু-সাহিত্য প্রধানত ছিল অনুবাদকর্ম। কিন্তু ক্রমেই তাতে বিবিধ বিষয়ের সংযোজন হোতে থাকে। আর তার প্রারম্ভ বিদ্যাসাগর মহাশয় থেকেই। তিনিই বাঙলা শিশু-সাহিত্যকে জড়তা মুক্ত করে প্রাণবান করে তোলেন। এবং আরও যাঁরা তাতে শক্তিসঞ্চার করেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

দুই

বিদ্যাসাগর-যুগ

।। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ — ১৮৯১ খৃঃ অঃ ।।

১৮৪৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ।' এই 'অজেয় পৌরুষ' বলেই তিনি পূর্বের গদ্য রচনাপদ্ধতির শৃঙ্খল চূর্ণ এবং রবীন্দ্রনাথের কথায় 'সর্ব্বপ্রথমে বাঙলা-গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।' ইংরেজী শিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে যে সকল পরিবর্তন আনয়ন করে তা স্পষ্ট হোতে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগে। এই পরিবর্তনের জন্য যাঁরা দায়ী তিনি ছিলেন তাঁদের সর্বাগ্রে। তাঁর মহৎ কর্মাবলীর প্রথম প্রকাশ সাহিত্যে—শিশু-সাহিত্যে। রচনার পুরানো পথ পরিত্যাগ করে তিনি বাঙলার সাহিত্যিক ভাষাকে নূতন পথে বইয়ে দেন। তাঁর ভাষা সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বলেছেন 'ইনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বাঙলা শিখাইয়াছেন, ইঁহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকারলাভ করেন।' বাঙলা ভাষা,

শিশু-সাহিত্যের ভাষা, তাঁর পূর্বে যে কেমন ছিল তার বহু নিদর্শন এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেখা গেল, তার না ছিল শ্রী, না ছিল ছন্দ। বাঙালীবরেণ্য বিদ্যাসাগরের বাংলা দেশে পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। কারণ সমাজে ও সাহিত্যে তাঁর নানা অক্ষয় কীর্তি বর্তমান। বাঙলা শিশু-সাহিত্য তাঁর 'অজেয় পৌরুষে' কেমন নূতন ভাবে গড়ে উঠেছিল আমাদের বক্তব্য তাই। যেমন সমাজের তেমনি সাহিত্যের। বাঙলা শিশু-সাহিত্যের তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা। এই যুগের আরম্ভ তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' থেকে, ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স সাতাশ বৎসর।

গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর মহাশয় যা লিখেছেন, তার বিশেষ বিশেষ স্থান উদ্ধৃত করা গেল :

> কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ, কোনও কোনও অংশ এরূপ দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইয়া উঠে না।...মহামতি শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।
>
> যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, বেতাল পঞ্চবিংশতি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী ব্যক্তি মাত্রেই আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ...
>
> দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। যে যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে, এবং অশ্লীল পদ, বাক্য ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ...

গ্রন্থখানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রগণের জন্য রচিত হোলেও 'প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত' হয়। যা শিশুপাঠ্য তাই বিদ্যালয়ে চলে এবং যা শিশুপাঠ্য তাকেই শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এ কথা সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধেই সত্য। সমাজে, সাহিত্যে ও শিল্পে পুরানোর সংস্কার, পুরানোর স্থানে নূতন পদ্ধতিতে নূতন ভাবে গঠন প্রগতিশীল মনেরই কাজ।

প্রগতিপন্থী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই দিক থেকে সে কাজ শুরু করেন। শিশু-সাহিত্য তাঁর কল্যাণময় করস্পর্শে নির্মল ও সুন্দর হয়, তার অশ্লীলতা কলঙ্ক বিদূরিত হয়ে নবরূপ ধারণ করে। এ কাজটি কোনও কালেই একার পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু তিনি একাই ছিলেন বহুর সমান।

'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচিত হয় হিন্দী পুস্তক বৈতালপচীসী অবলম্বনে। অবলম্বিত রচনা ও অনুবাদ এক নয়। অবলম্বিত রচনায় বিষয়বস্তু বজায় রেখে লেখক কিছুটা কল্পনার অবকাশ পান এবং নিজস্বভঙ্গীতে রচনা করেন। তবে মৌলিক রচনার সবটুকুই লেখকের ইচ্ছাধীন, রচয়িতা সেখানে সম্পূর্ণ মুক্ত। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসও অপরের রচনার বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে নিজস্ব পথে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সে পথেই অগ্রসর হয়ে তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। মূল সংস্কৃত ও হিন্দীর সঙ্গে এই গ্রন্থখানির কতটা মিল জানি না, কিন্তু মূলের কোনও কোনও উপাখ্যান ভাগও যে অশ্লীল বোধে পরিত্যক্ত হয়েছে এ কথা স্বয়ং রচয়িতাই লিখেছেন। ঐ দোষে বহু পদ ও বাক্যও পরিত্যক্ত হয়েছে। কাজেই রচনাটি বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল হোলেও অপরাপর বিষয়ে মৌলিক রচনার মতো মুক্ত।

বেতালপঞ্চবিংশতির গল্পগুলির আমাদের বাংলা দেশে বহুল প্রচার। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই তাঁর গ্রন্থখানিরও দশটি সংস্করণ হয়। পরবর্তীকালে আরও অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের কালে বেতালপঞ্চবিংশতির গল্পগুলি আরও

কয়েকজন লেখক রচনা করেছেন বটে কিন্তু সেগুলির ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্পগুলির ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। তদ্‌রচিত গ্রন্থখানি গ্রন্থাবলী ছাড়া পৃথক পাওয়া দুষ্কর। আলোচ্য বেতালের পঞ্চবিংশ উপাখ্যানটি এই :

বেতাল কহিল, মহারাজ!

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্ম্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানী অবরোধ করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষ প্রকার প্রতিকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ ক্রমে ক্রমে, স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া প্রাণরক্ষার্থে, মহিষী ও তনয়া সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রস্থান করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া, তিনজনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়া, আহারোপযোগী দ্রব্যের আহরণার্থে গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। রাজমহিষী ও রাজকুমারী, রাজার অনাগমনে, নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া, অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিনে, কুন্তিনের অধিপতি রাজা চন্দ্রসেন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, তাদৃশ নিবিড় অরণ্য মধ্যে, অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিস্ময়াম্বিত চিত্তে নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, পুংবিলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা, উহা স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, চরণচিহ্নদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দুই নারী অচিরে, এই স্থান দিয়া, গমন করিয়াছে। চল, চারিদিকে অন্বেষণ করি।

> পিতা পুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন, দুই পরম সুন্দর রমণী, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত, যূথবিরহিত, কুররীযুগলের ন্যায়, প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করিতেছে। অবলোকনমাত্র, উভয়েরই অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কারুণ্য রস আবির্ভূত হইল। তখন তাঁহারা স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ পুরঃসর, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও অভয় প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে রাজা কন্যার রাজকুমার রাজমহিষীর পাণিগ্রহণ করিলেন।
>
> ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে, তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবেক বল। রাজা বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এমন একখানি বিশুদ্ধ গল্পগ্রন্থ শিশু-সাহিত্যে পূর্বে আর রচিত হয় নি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পগুলি বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ, খাঁটি স্বদেশী। সেগুলি বাংলার কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত। পূর্বকালে যাদের উদ্দেশ্যেই রচিত হোক, যাদেরই সেগুলির সুমিষ্ট রসে পরিতৃপ্ত করুক, আমাদের কালে গল্পগুলি শিশু-সাহিত্য বলেই গৃহীত হয়েছে। তার পাঠক ও শ্রোতা বালক-বালিকাগণ। বেতালপঞ্চবিংশতির বেলায়ও এই কথা সত্য। কিন্তু এগুলি কেবল বাংলার নিজস্ব সম্পদ নয়, সর্বভারতীয় এবং খাঁটি স্বদেশী। বিদ্যাসাগর-যুগে মাত্র বিদ্যালয়ে নয়, বিদ্যালয়ের বাইরেও এর পাঠকের অভাব ছিল না। তবে বিদ্যাসাগরোত্তর যুগে আর বিদ্যালয়ের পাঠ্য নেই, তার বাইরেই শাশ্বত সাহিত্যরূপে গল্পপিপাসু শিশুচিত্তে মধুর রস দান করছে। শাশ্বত সাহিত্য সমগ্রভাবেই বা তার অংশবিশেষ বিদ্যালয়ের পাঠ্য হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্য তার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে বাইরে এই বাঙলা গ্রন্থখানি ছাড়া আর কোনও গ্রন্থকে আমরা প্রচলিত হোতে দেখি না। কাজেই বিদ্যাসাগরের

লেখনী যে প্রথমে অক্ষয় সাহিত্য রচনা করে এতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? এতে নীতির নিরসতা নেই, আছে নিছক গল্পের রস-মাধুর্য।

বিদ্যাসাগর-পূর্বযুগে শক্তিশালী এমন কোনও লেখকেরই আবির্ভাব হয় নি যাঁর রচনাশৈলী তখন বা তৎপরবর্তীকালে অপরের দ্বারা অনুসৃত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর-যুগে ও বিদ্যাসাগরোত্তর যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনারীতি অনেকের সম্মুখে আদর্শের মতো থেকে তাঁদের শিশু-সাহিত্য রচনায় সাহায্য করেছে।

বিদ্যাসাগর-যুগে 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' চতুর্থ ভাগে ঋতুবর্ণনায় কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্য থেকে রচনার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এবং তাতে এ বিচার করা হয় নি যে তা শিশুদের উপযোগী কি না, যৌনসম্পর্কিত কোনও বিষয় তাদের জানা উচিত কি না। যেমন বর্ষা বর্ণনায় :

> অনুরাগপরবশ কামুকী বিশেষ ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনে ও ঘোরতর অন্ধকারে ভীতা না হইয়াও বিদ্যুৎদীপ্তিতে পথ দর্শন করত রাত্রিতে প্রিয় নিকটে গমন করিতেছে।

এই গ্রন্থখানি কলিকাতা খৃস্টান স্কুল-বুক সোসাইটি ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে 'বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত' প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি প্রতিষ্ঠানটির 'হিতোপদেশের চতুর্থ ভাগ'। মাত্র এইখানেই শেষ নয়, ইসলাম ধর্মাপেক্ষা খৃস্টধর্ম যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে তারও প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে অত্যন্ত হাস্যকর ও আপত্তিকর যুক্তি ও বাক্য সাহায্যে। কিন্তু বিদ্যাসাগর-পূর্বযুগে শিশু-সাহিত্যে এ বালাই ছিল না, পরবর্তীকালেও দেখা যায় না। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা', 'জীবনচরিত', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচিত শিশু-সাহিত্য। এগুলির কতক অনুবাদ, কতক অবলম্বিত রচনা। যেমন, জীবনচরিত ও কথামালা অনুবাদ, অবশিষ্টগুলি অবলম্বিত রচনা। কথামালা

ঈশপের কতকগুলি গল্পের অনুবাদ। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলছেন :

> রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশে ঈশপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগর্ভ-গল্প রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ...গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।...এতদ্দেশীয় পাঠক-বর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর হইবেক না এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাততঃ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল...

আমাদের দেশাচারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি কথামালার অন্য খণ্ডে বিধবার স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী কুক্কুটীকে হংসীতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির একটি গল্প এই :

> এক দোকানে মধুর কলসী উলটিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে চারিদিকে মধু ছড়াইয়া যায়। মধুর গন্ধ পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া সেই মধু খাইতে লাগিল। যতক্ষণ এক ফোঁটা মধু পড়িয়া রহিল, তাহারা ঐ স্থান হইতে নড়িল না। অধিকক্ষণ তথায় থাকাতে, ক্রমে ক্রমে সমুদায় মাছির পা মধুতে জড়াইয়া গেল, মাছি সকল আর কোনমতে উড়িতে পারিল না; এবং আর যে উড়িয়া যাইবেক তাহারও প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা কি নির্বোধ ক্ষণিকের সুখের জন্য প্রাণ হারাইলাম।

এই সরল, সুমিষ্ট ভাষা শিশু-সাহিত্যের আদর্শভাষা যা পূর্বে আর কারও লেখনী থেকে নিঃসৃত হয় না। অবিশ্যি ঈশপের ইংরেজী গল্পগুলির ভাষাও সহজ। কিন্তু অনূদিত গল্পটি পাঠে মনেই হয় না যে, অনুবাদ। শুরু থেকে শেষ অবধি ভাষার এমনই স্বচ্ছন্দগতি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'জীবনচরিত'ও অনুবাদ। জীবনচরিতের ভাষা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। তবুও তাঁর অনুবাদ তাঁকেই তৃপ্তি দিতে পারে নি। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন :

বাঙ্গালার ইঙ্গরেজীর অবিকল অনুবাদ করা দুরূহ কর্ম্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনা-প্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতি বৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার আশায় অনেকস্থলে অবিকল অনুবাদ করি নাই; তথাপি এই অনুবাদে ঐ সকল দোষের ভূয়সী সম্ভাবনা আছে, সন্দেহ নাই।

···পাঠকবর্গের সৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে······অর্থ ব্যুৎপত্তিক্রম প্রদর্শিত হইল।

জীবনচরিত প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে। ব্লুমহারট কৃত ও ১৯০৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ দৃষ্টে জানা যায় পাদ্রি ডবলু. অ্যাডামস ও মারিয়া এজওয়ার্থ 'নীতিবোধক ইতিহাস' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানিও প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে। গ্রন্থখানির বিষয় ছিল নীতিমূলক কাহিনী—'রাজদূত' ও 'সরলতার পুরস্কার'। কাহিনী দুটি বিদেশী কিন্তু তাতে রূপ দেওয়া হয় বাংলার। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদের যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন ১৮৫০ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষানুবাদক সমাজও কতকটা সেই রীতি গ্রহণ করেন। তাঁদের মত ছিল 'অনুবাদ আক্ষরিক না হইয়া ভাবমূলক হইবে।' আমাদের সময়ে সকলে এই রীতিতে অনুবাদ করেন না। কেউ কেউ আক্ষরিক অনুবাদের পক্ষে।

জীবনচরিতের অনুবাদের কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

নিকলস কোপর্নিকস।

পূর্ব্বকালে কাল্ডিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল; কিন্তু খৃষ্টীয়

শাকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে, জ্যোতির্ম্মণ্ডলীয় বিষয় বিশুদ্ধ রূপে বিদিত হয় নাই। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী স্থির ও অন্তরিক্ষ-বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের মধ্যস্থিত; চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল, সূর্য্য, অন্যান্য গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল তাহার চতুর্দ্দিকে এক এক মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করে; আর তাহার দূরত্ব ও বেগের বিভিন্নতাপ্রযুক্ত, দিবসে ও রজনীতে নভোমণ্ডলের বিচিত্র আকার দেখিতে পাওয়া যায়। এইমত বহুকাল পর্য্যন্ত প্রবল ও প্রচলিত ছিল।…

জীবনচরিতে কোপর্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞান-সাধকগণেরও চরিতকথা আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে বিজ্ঞান-সাধকগণের চরিতকথা আর লিখিত হয় নি। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, তিনি বালকগণকে বিজ্ঞানশিক্ষাদানে আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁর বোধোদয়ও তার সাক্ষ্য দান করে। তাদের মনে অনুপ্রেরণা দানও চরিতকথাগুলি অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি ছিলেন যুক্তি ও বাস্তববাদী।

তাঁর বর্ণপরিচয় শিশু-সাহিত্য নয়, কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই কারণে যে তাতেও গল্প আছে। তাঁর বর্ণপরিচয় পূর্ববর্তী বর্ণপরিচয়গুলিকে কেবল সৌকর্যের দিকে নয়, ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রেও অতিক্রম করে একটি সহজপথের সন্ধান দিয়েছিল। সে কারণ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগের গল্পের ('কদাচ চুরি করা উচিত নয়') ভাষা শিশু-সাহিত্যেরই ভাষা। পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক-বালিকাগণ নিজেরাই পাঠ করে 'ভুবনে'র গল্পটির অর্থ ও রসগ্রহণে সক্ষম। প্রসঙ্গত বলা যায় কিয়দংশে এই গল্পটির মতোই একটি প্রাচীন বিদেশী গল্পও আমরা পাঠ করেছি। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্পটি মৌলিক রচনা। কারণ তার সঙ্গে এটির অনেক অমিলও আছে। ইংরেজ আমলে বাঙলা সাহিত্যে মৌলিক ছোট গল্পের প্রারম্ভ এই। এমন শক্তিশালী গল্প খুব কমই পাঠ করা যায়। ছোট গল্পের সকল লক্ষণই এতে বর্তমান। গল্পটির প্লট ও

সংলাপ সুন্দর। শিশু-সাহিত্য শাখায়ও এর পূর্বে এমন পূর্ণাঙ্গ মৌলিক ছোট গল্প আর রচিত হয় নি। গল্পটি সংকলনযোগ্য। সে কারণে উদ্ধৃত হোল :

একদা একটি বালক বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে ঐ বালকের পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন, তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে বলিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি ঐ পুস্তক ফিরাইয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। সে যতদিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই চুরি করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। কাহারও কোন দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অতিশয় সতর্ক হইত ; এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছুকাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহুকাল চোর হইয়াছে ; এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হইল। বিচারক ভুবনের ফাঁসি দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যেস্থানে অপরাধীদিগের ফাঁসি হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে বলিল, তোমরা দয়া করিয়া, এজন্মের মত একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন, এবং ভুবনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে ২ তাহার নিকট গেলেন। ভুবন

বলিল, মাসি, এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল ; এবং, জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল ; পরে সে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, মাসি, তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য এই পুরস্কার।

এককালে চোরকে শূলে দেওয়া হোত। কিন্তু উনবিংশ শতকে বিদ্যাসাগর মহাশয় চোরকে ফাঁসি দিয়েছেন। বিংশ শতকের চৌর্যাপরাধীদের পরম ভরসা যে তিনি একালে নেই, তবে তাঁর গল্পটি আছে।

স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা। তার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫০ খৃস্টাব্দ। এই স্কুলের ইতিহাসে অন্যান্যের সঙ্গে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। এদেশীয়গণ প্রথমে যখন এই স্কুলে তাঁদের কন্যাদের পড়তে দিতে অনিচ্ছুক তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়ই তাঁর দুই শিশুকন্যাকে এই স্কুলে পড়তে দেন। আমাদের বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে ঘটনাটির প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তর্কালঙ্কার মহাশয়-রচিত শিশু-সাহিত্যের সঙ্গে কিছু যোগ আছে। কারণ তাঁর রচিত, 'শিশুশিক্ষা' ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ এই স্কুলের পাঠ্য ছিল এবং কতকটা এই স্কুলের ছাত্রীগণের জন্যই যেন তিনি গ্রন্থ তিনখানি রচনা করেন। তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত তর্কালঙ্কারের জীবনচরিতে জানা যায়, গ্রন্থ তিনখানির রচনা-কাল ১৮৪৯ খৃস্টাব্দ। প্রকাশকালও ১৮৪৯-৫০ খৃস্টাব্দ। অন্তত তৃতীয় ভাগের প্রকাশকাল ১৮৫০ খৃস্টাব্দ এ কথা তর্কালঙ্কার-লিখিত মুখবন্ধে পাওয়া যায়।

তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেয়ে বয়সে তিন বৎসরের বড়

হোলেও তাঁর প্রিয় সুহৃদ ও সহপাঠী ছিলেন। তর্কালঙ্কারও ছিলেন অসাধারণ তীক্ষ্ণধী তদুপরি কবি। ১৮১৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শিশু-সাহিত্যক্ষেত্রে একটিও কবিতাকুসুম প্রস্ফুটিত হয় নি। অন্তত আমরা তার সন্ধান পাই নি একথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগেই তর্কালঙ্কারের লেখনী এমনই একটি কবিতাকুসুম প্রসব করে যা আজও অমলিন। হাজার শিশুর কণ্ঠে কবিতাটি এখনও শোনা যায় :

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি সোনার বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

কবিতাটি প্রভাতের মতো নির্মল, প্রভাতী সুরে স্নিগ্ধ। শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যে এইটিই আদি মৌলিক কবিতা। পরবর্তীকালের প্রভাতবর্ণনা সম্বলিত শিশুপাঠ্য কবিতাগুলিতেও এই দিবসের উষার নির্মল আলোকের প্রতিফলন দেখা যায়।

তৃতীয় ভাগের যে সংস্করণখানি আমরা দেখেছি তা 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংশোধিত ও পরিবর্তিত, একোনত্রিংশদধিকশত সংস্করণ'। সুতরাং প্রথম সংস্করণের সঙ্গে তার মিল না থাকারই কথা। কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কার লিখিত প্রথম সংস্করণের 'মুখবন্ধ'টি অপরিবর্তিতই আছে। তর্কালঙ্কার তাতে লিখেছেন :

> কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত, শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত, হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থলী ও কাষ্ঠভার দর্শনে, ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ডের বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া, কাকের স্বীয় মধুরস্বর-পরিচয় দান প্রভৃতি অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া, সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।

আর বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখছেন :

> অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের বোধসৌকর্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্দ্ধিত, কোনও কোনও অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি কতকগুলি উপদেশ ও জন্তুজানোয়ারের বৃত্তান্ত সম্বলিত। পূর্বে এমন গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমরা জানতে পারি না। না হওয়াই সম্ভব। কারণ দেখতে পাই কি ভাষায়, কি বিষয়-নির্বাচনে শিশু-সাহিত্য ক্রমেই নূতন ও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছিল। বিদ্যাসাগর-যুগ থেকেই এই অবস্থার আরম্ভ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এ দিকের অগ্রপথিক। এই যুগারম্ভের পর দশ-বারো বৎসরের মধ্যে এমন কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেগুলি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সেগুলির পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে।

'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগে জন্তুজানোয়ারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতে যে রীতি অবলম্বিত হয়েছে তা এই :

> গণ্ডার হস্তী অপেক্ষা আকারে ছোট ; কিন্তু বল ও বিক্রমে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। গণ্ডার হিংস্রক জন্তু নহে ; অথচ ভাল পোষ মানে না। কখন কখন ইহার এমন রাগ উপস্থিত হয়

যে, কোনও মতে সান্ত্বনা করা যায় না। একবার, একটা গণ্ডারকে, জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথের মধ্যে কোন কারণে রাগ উপস্থিত হওয়াতে, সে জাহাজখান ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপ আরও একটা গণ্ডার, জাহাজ ভাঙিয়া ফেলিয়া, সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছিল।

গণ্ডারেরা, কাদায় পড়িয়া, খেলা করিতে বড় ভালবাসে। এজন্য, যেখানে মানুষের যাতায়াত নাই, এমন জলা, বিল ও নদীর তটে, সচরাচর বাস করে।···

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে পশ্বাবলীতেও জন্তুর এমনি বাস্তব বিবরণ দেওয়া হোত। তবে তাতে অবিশ্বাস্য গল্পও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু পশ্বাবলীর রচনা ইংরেজীর অনুবাদ, শিশুশিক্ষার রচনা মৌলিক, তর্কালঙ্কারের ভাষায় 'প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত'। কবি মদনমোহন বাস্তববাদী অক্ষয়কুমারের মতোই বালক-বালিকাগণকে বাস্তব বিষয় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তর্কালঙ্কার অক্ষয়কুমারের দু' বৎসর পূর্বেই এ দিকে অগ্রসর হন। তৃতীয় ভাগের অধিকাংশ রচনা প্রাণি-বিদ্যা বিষয়ক।

বিংশ শতাব্দীতে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও অনেক খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্য রচয়িতাকেই শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাতে লিখতে দেখা যায়, পরে তাঁদের সে রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বস্তুত সাময়িক পত্রিকাই মুখ্যত তাঁদের রচনার বাহন হয় এবং পত্রিকার সাহায্যেই তাঁদের যশ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর-যুগে কয়েকখানি শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্র ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বা অক্ষয় দত্ত কেউই সে সকল পত্রিকায় লেখেন নি। কেবল তাই নয়, উনিশ শতকের শিশুসাময়িকে প্রকাশিত কোনও রচনা, এক দিগ্‌দর্শনের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি ছাড়া, সেকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হোতেও দেখা যায় না। তবে বিংশ শতাব্দীতে সেগুলির কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে পৃথক ভাবে বিক্রয় হোতে দেখা যায়।

মনে হয়, এর কারণ তখন পাঠকের অভাব। সেকালে শিক্ষার এতটা বিস্তার ছিল না, অভিভাবকগণও বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থের বাইরে, সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করতেন না। ইংরেজী সাহিত্য পড়ানোর দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল। কারণ, ভাল ইংরেজী জানলে চাকরির ক্ষেত্রে সুফল ফলানো যেতে পারতো। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকৃত 'নীতিরত্নে'র ভূমিকার এক জায়গায় ভট্টাচার্য মহাশয়ও লিখছেন : 'বঙ্গদেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষালয়ে বালকগণকে অধিক দিন রাখেন না···।'

বিদ্যাসাগর-যুগে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্য ছিলেন—শ্রীযুত অনারিবল জে. ই. ডি. বীটন সাহেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ. গ্রোট সাহেব, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত প্রভৃতি গণমান্য ব্যক্তিগণ। কমিটির বাঙালী সদস্য ছিলেন মাত্র ঐ তিনজন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল 'গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ—Bengali Family Library।' অনুবাদক সমাজের নাম ছিল—'Vernacular Literature Committee.' গার্হস্থ্য বাঙলা পুস্তক সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানে স্কুল-বুক সোসাইটির পুস্তকও পাওয়া যেতো।

প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনের উদ্দেশ্য, 'ট্রাক্ট সোসাইটি কিম্বা খৃস্টান নলেজ সোসাইটি কি ইস্কুল বুক সোসাইটি কিম্বা আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার নিয়মতে সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম ২ যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটি প্রকাশ করিবেন।···'

কমিটির প্রথম প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থ—'রাবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত'। অনুবাদ করেন, জান রাবিনসন (জন রবিনসন)। আমরা তৃতীয় মুদ্রণের সন্ধান রাখি। সেখানি ১৮৬০ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। মনে হয় গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ ১৮৫২-৫৩ খৃস্টাব্দে। দ্বিতীয় গ্রন্থ—'শেকস্‌পীয়ার কৃত গল্প'। অনুবাদক ডক্টর বেয়ার। মূল ইংরেজী গ্রন্থগুলি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পড়ুয়ারাও পাঠ করে থাকে। এখনও বহু বাঙালী লেখককৃত এগুলির বঙ্গানুবাদ পাওয়া

যায় এবং বালক-বালিকারাই পাঠ করে। সে কারণ গ্রন্থগুলি শিশু-সাহিত্যে অনুবাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেকালে সকল বয়সের পাঠক-পাঠিকাগণই এই সকল গ্রন্থ পাঠ করতেন। তবুও গ্রন্থগুলিকে শিশু-সাহিত্য বলা যেতে পারে।

১৮৫০ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র কর্মকার কৃত 'বালকবোধকেতিহাস' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি শ্রীরামপুরে 'চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত' হয়েছিল। এই পুস্তকের আরও কয়টি ভাগ প্রকাশিত হয় আমাদের জানা নেই, তবে আলোচ্যখানি 'প্রথম ভাগ'। গ্রন্থে সর্বসাকুল্যে সতেরোটি উপদেশ ও সতেরোটি গল্প বা কাহিনী আছে। গল্পগুলি উপদেশের ব্যাখ্যা বা উদাহরণস্বরূপ। প্রত্যেক গল্পের শিরোনামায় একটি করে ছন্দোবদ্ধ উপদেশ। কয়েকটি এই :

১। কুক্রিয়া কুব্যবহার করে যেই জন।
নম্রতা হইলে হয় দোষ বিমোচন॥

২। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য করিয়া।
শেষে চেষ্টা আপনারে অসার ভাবিয়া।

৩। বল হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জানিবা নিশ্চয়।
বলের অসাধ্য বুদ্ধি প্রভাবেতে হয়॥

বালকবোধকেতিহাসের দুটি কাহিনী :

৩। বল হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জানিবা নিশ্চয়
বলের অসাধ্য বুদ্ধি প্রভাবেতে হয়॥

এক মদোন্মত্ত সিংহ আপন শক্তি অতিক্রম করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জনে বনের লতাপাতা ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, এমতকালে ঐ স্থানে এক ধূর্ত্ত শৃগাল গর্ত্ত হইতে বহির্গমন করিবামাত্রই সমাগত সিংহকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া বিবেচনা করিল ; যে এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত ; কিন্তু নীতিশাস্ত্রে কহে যে, উপস্থিত বিপদ দেখিয়া অবসন্ন না হইয়া, বিপদুত্তীর্ণ হওনের জন্যে আপন

বুদ্ধ্যানুসারে কোন উপায় চেষ্টা করিবেক; যেহেতু শক্তিদ্বারা আমি উহাকে কোনক্রমেই পরাভব করিতে পারিব না। এতদ্বিবেচনায় অতি নম্র হইয়া বিনয়পূর্ব্বক সিংহকে ছলবাক্য কহিল; হে পশুরাজ, আপনকার বিপদ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অদ্য তিন দিবস গত হইল অনাহারে গর্ত্তে পড়িয়াছিলাম; যেহেতুক রাজার বিপদে প্রজারও বিপদ হয়। যাহা হউক, অদ্য রাজ দর্শনে বড় প্রীতি পাইলাম।

সিংহ এতাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর ক্রোধান্বিত হইয়া শৃগালকে বলিল, ওরে শৃগাল আমি পশুরাজ আমার বিপদ কি? তাহাতে শৃগাল কহিল, আপনি কি কূপে পতিত হন নাই? তবে বুঝি অন্য কোন সিংহ আসিয়া থাকিবেক, সে ঐ কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছে দেখুন। তাহাতে সিংহ হস্তপদাস্ফালন করিয়া ঐ কূপে দৃষ্টি করিবামাত্র আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনেতে অন্য সিংহ জ্ঞান করিয়া ক্রোধে তাহাতে পড়িয়া মরিয়া গেল। তাহাতে শৃগাল বুদ্ধিদ্বারা অনায়াসে আপনার প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পাইল। ইতি।

২। ব্যবহার অধিক স্তব করে যেই জন।
প্রত্যয় না করিবেক তাহার বচন॥

কর্ণাট দেশে কালীকৃষ্ণ নামক এক রাজা রাজ্য করিতেন, তিনি সর্ব্বদা প্রিয় ও সদ্বক্তা ও সদাচারী ও সরস চিত্ত ও শিষ্ট ও সমদর্শী ছিলেন। এবং ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি রিপুকে জয় করতঃ অতিশয় খ্যাতাপন্ন হইয়া সতত সদ্বিচার ও প্রজা পালন করিতেন; তাহাতে ঐ কালীকৃষ্ণের অতি সুখে কালযাপন হইত, প্রজারাও স্বচ্ছন্দে সুখ সম্ভোগ করিত। কিয়ৎ দিবসান্তর নবীন নামা এক ব্যক্তি ঐ রাজার সভায় উপস্থিত হওত সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় থাকিয়া উপাসনাদ্বারা কালীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছিল।

এক দিবস ঐ নবীন রাজার সহিত কথোপকথন করিতে ২ বলিল, মহারাজ আপনার গমন সন্দর্শনে গজগণের গর্ব্ব খর্ব্বতা পাইয়াছে। এবং হস্তপদের নখ দেখিয়া চন্দ্র আকাশে পলায়ন করিয়াছেন। এবং উরু দর্শনে মনের অভিমানে রম্ভাতরু সারহীন হইয়াছে। এবং চমরীগণ তোমার (?) চুল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া নিবিড় বনে প্রস্থান করিয়াছে। আর সর্ব্ব প্রাণহিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণ নিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রচিত্ত মহাশয়ের তুল্য কেহই নাই। এবং আপনার যাদৃশী বুদ্ধি বিদ্যা তাদৃশী বুদ্ধি বিদ্যা মনুষ্যের হয় না; ইত্যাদি নানাপ্রকার আরোপিত বাক্যদ্বারা রাজাকে মুগ্ধ করিয়া কহিল, মহারাজ তোমার মন্ত্রী প্রভৃতি অতি কুৎসিত অতএব ইহার দিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত করণের আজ্ঞা হয়। তাহাতে ঐ রাজা নবীনকে সকল রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণ অন্তঃপুরীতে থাকিতেন এবং যদ্যপি কোন দিবস বিচার করণে প্রবৃত্ত হইতেন; তথাপি নবীনের কুমন্ত্রণায় প্রায় অবিচার হইয়া উঠিত, তাহাতে প্রজাদিগের ধনক্ষয় ও অন্য ২ পীড়া হইতে লাগিল; এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে নির্ধন হইল। ইতি।

তদনন্তর রাজার এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বস্থিত মন্ত্রিগণ এক দিবস রাজসন্নিধানে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, সারহীন কাংস্য পদার্থ যাদৃশ শব্দ করে সুবর্ণ তাদৃশ করে না, অতএব এই নিশ্চয় যে ব্যক্তি অধিক কথা কহে সে সারহীন ও আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে; আর বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ঐ নবীনের এই গ্রন্থের নানা প্রকার আরোপিত কথায় বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তদ্দ্বারা রাজকার্য্য সমাধা হওয়া দূরে থাকুক সম্প্রতি মহাশয়ের রাজ্যচ্যুত হওনের সম্ভাবনা দেখিতেছি। তাহাতে রাজা স্বান্তঃকরণে বিবেচনা করতঃ ঐ নবীনকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া স্বীয় মন্ত্রীগণ (?) সমভিব্যাহারে

সতর্ক হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা ধন ও যশ ও মান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতি।

রচনা দুটি কোনও গ্রন্থোক্ত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কর্মকার মহাশয় নামপৃষ্ঠায় গ্রন্থখানিকে সংকলন বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থে কোনও ভূমিকা ছিল না। তবে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব মুক্ত। রচনাটির শব্দপ্রয়োগ, বাক্যব্যঞ্জনা ও যতিচিহ্ন ব্যবহারই তার প্রমাণ। কিন্তু এখানি সেকালের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। মনে হয়, সমাদৃতও হয়েছিল।

পূর্বে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ও গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের (Bengali Family Library) কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সকল পুস্তকই সাধারণ পাঠক বা বালক-বালিকাদের জন্য রচিত হয় নি। কতকগুলি পুস্তক ছিল সাধারণ ও বয়স্ক পাঠক-গণের জন্য, যেমন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ পুস্তকাবলী', মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান', 'পুত্র শোকাতুরা দুঃখিনী মাতা' এবং 'নায়ক শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা' প্রভৃতি। 'সুশীলার উপাখ্যান' রচিত হয় বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ—বালকগণের জন্য নয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রারম্ভে লিখেছেন: 'বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ-বালিকাগণের কিরূপ গুণযুক্ত হওয়া উচিত সুশীলার বাল্যচরিত্র লিখিয়া তাহা আমি প্রথম ভাগে প্রকাশ করিয়াছি।' গ্রন্থখানির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে। তিনি এই পুস্তক রচনা দ্বারা অনুবাদকসমাজের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার জন্য ঘোষণা অনুসারে দু'শ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু ও রচনা মৌলিক এবং সেকালের একখানি উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য উপন্যাসরূপে সর্বত্র সমাদৃত ছিল। গ্রন্থখানি তিনটি খণ্ডে রচিত ও প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের রচনা বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রশংসা অর্জন করে।

অনুবাদক সমাজের প্রথম গ্রন্থ জন রবিসনের 'রাবিনসন ক্রুসোর

জীবন বৃত্তান্তে'র ভাষা এমন সাবলীল ও স্বচ্ছ যে অনুবাদ বলে ধারণাই হয় না। গ্রন্থখানির প্রারম্ভ এই :

> রাবিনসন ক্রুসো আপনি আত্মপরিচয় দিতেছেন। ১৬৩২ সালে ইয়র্ক নগরে আমার জন্ম হইয়াছিল। আমার পিতা বিদেশীয় ভদ্র বংশজাত এক ভদ্রলোক ছিলেন। প্রথমে তিনি হল নগরে থাকিয়া ব্যবসায় করত বিস্তর ধনোপার্জ্জন করেন, পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইয়র্ক নগরে বাস করা ভদ্রবংশজাতা রাবিনসন নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করেন, তাহাতে তাঁহার তিন সন্তান হয়। জ্যেষ্ঠ সন্তান ইংরাজী পল্টনে সেনাপতি পদ পাইয়া ইস্পানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে হত হন। মধ্যম কোথায় গিয়াছিলেন বা কি করিয়াছিলেন, আমি কখন জানিতে পারি নাই। আমার নাম রাবিনসন ক্রুসো।
>
> কনিষ্ঠ হওয়া প্রযুক্ত কোন প্রকার ব্যবসায় আমার শিক্ষা করা হইল না, অতএব যৌবনকালাবধি বিদেশে গমন করিতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইল। বালকেরা পাঠশালায় না গিয়া বাড়ীতে যে প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে, সেই প্রকার শিক্ষা পিতা আমাকে নিজগৃহে দেওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে আমি উকিল হই, কিন্তু আমার বাসনা কোন জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া বিদেশে যাই। পিতামাতা জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই অতি স্নেহের বাক্যে নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু বিদেশেগমনের উৎকট বাসনাতে সকল বাক্যই আমি তুচ্ছ করিলাম। অদৃষ্টক্রমে আমার এই অনুরাগ অতি প্রবল হওয়াতে পরে অত্যন্ত বিপত্তি ঘটিল।

গ্রন্থখানি সচিত্র। এতে চৌদ্দখানি উডকাট ছবি ছিল। ছবিগুলি একজনের খোদাই করা নয়। মাত্র চারখানির নির্মাতাগণের নাম পড়তে পারা যায়—Adolph Bess, Quartley, Evans ও P. B. পূর্বের আর কোনও গ্রন্থে চিত্র দেখা যায় না, তবে মাসিক

পত্রিকায় দেখা যায়। এতে মনে হয় তখন এদেশীয়গণ উডকাট চিত্র নির্মাণে আগ্রহশীল ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'জীবনচরিতে'র দু' বৎসর পরে ১৮৫১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত 'নীতিবোধ'। নীতিবোধও ছিল, জীবনচরিত। গ্রন্থখানির দশম সংস্করণে ও প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জানা যায় :

> রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বার্স বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইঙ্গরেজী ভাষায় মরাল ক্লাস বুক নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া সঙ্কলিত হইল ; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। ···শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ···তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। ···কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করেন।

বিজ্ঞাপনে আরও জানা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকজনের জীবনচরিত রচনাও করেন। কিন্তু প্রকাশে নিরস্ত হন। সে সকল ব্যক্তির চরিতকথাও আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আছে।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থখানির ভাষা ও রচনাশৈলীতে নূতনত্ব ছিল না, তাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই পন্থা অনুসরণের চেষ্টা পরিস্ফুট। তবে সেটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনীস্পর্শেও হওয়া সম্ভব। গ্রন্থের একটি গল্পের কিয়দংশ পাঠেই তা বোঝা যাবে :

আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার মাতা

> যদিও মাতা অতিকর্কশ ও অবোধ হয়েন, তথাপি তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ক্ষমা প্রদর্শন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জননী ওলিম্পিয়া সকল বিষয়েই হস্তার্পণ ও আধিপত্য করিতে চাহিতেন এবং আপন পুত্রকে সতত বিরক্ত করিতেন ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতেন; তথাপি তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তেও বিরক্ত হইতেন না; বরং যৎকালে দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়াছিলেন, জয়লব্ধ দ্রব্যজাত মধ্য হইতে দৃঢ়তর মাতৃভক্তির প্রমাণস্বরূপ ভূরি ভূরি উপহার প্রেরণ করেন। তিনি পত্রদ্বারা জননীকে এই মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তার্পণ না করিয়া আমার নিয়োজিত কর্ম্মকর্ত্তা এণ্টিপেটরকে অব্যাঘাতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে দিবেন। তাঁহার মাতা এইরূপ ন্যায়ানুগত অভ্যর্থনাতেও সাতিশয় কুপিতা হইয়া অতি কর্কশ বচনে ঐ পত্রের উত্তর প্রেরণ করেন। আলেকজাণ্ডার কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না এবং প্রত্যুত্তর প্রেরণকালে কোন প্রকার কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলেন না। ···

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী শিশু-সাহিত্যে যা কিছু স্পর্শ করেছে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং তার অধিক প্রচলন ঘটেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'আখ্যানমঞ্জরী'ই বোধ করি বাংলার শিশু ও কিশোর-সাহিত্যে তাঁর শেষ অবদান। গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে। প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন: 'আখ্যানমঞ্জরী পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত হইল।' সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণের 'ভাষাজ্ঞান ও আনুসঙ্গিক নীতিজ্ঞান' দানোদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত হয়। জীবনচরিতের মতো আখ্যানমঞ্জরীরও বহুল প্রচার হয়।

১৮৫২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগ। বিদ্যাসাগর-যুগে শিশু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'চারুপাঠ'। এমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসাহিত্য শিশু-সাহিত্যে তখন ও পরবর্তী-

কালেও আর রচিত হয় নি। বলা বাহুল্য রচনার বিষয়বস্তু ইংরেজী-গ্রন্থ থেকে সংকলিত কিন্তু রচনাশৈলী অক্ষয়কুমারের নিজস্ব। তবে রাজনারায়ণ বসু তাঁর বক্তৃতার একস্থানে উল্লেখ করেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করে দিতেন। অক্ষয়কুমার চারুপাঠের ভূমিকায় বলেছেন :

> …যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, একটি প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।…

এ সকল বিষয়ের আলোচনা, অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক গল্প পাঠ অপেক্ষা সমধিক কল্যাণকর তাহার সন্দেহ নাই।

> …বাঙ্গালাভাষার সুপ্রণালী সিদ্ধ পুস্তক অতি অল্প। এ সময়ে বালকদিগের পাঠোপযোগী দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে, এই বিবেচনায় চারুপাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।…

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাঠক ছিলেন বয়স্কগণ। রচনাগুলি কেবল বালকগণের উপযোগী ছিল না, তাঁদেরও পাঠযোগ্য ও জ্ঞাতব্যবিষয়ে পূর্ণ ছিল। এমন সার্বজনীন রচনা অক্ষয়কুমারের পূর্বে ও পরে আর দেখা যায় না। বয়স্কদের পত্রিকায়, বয়স্কদের উদ্দেশ্যে রচিত রচনা বালকগণের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ সেই প্রথম। চারুপাঠে নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছিল। প্রথম ভাগের একটি সাধারণ বিষয়ক প্রবন্ধ সেকালের শিশু-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত হোল :

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

> একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করা যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এমন আর কোন জন্তুর নহে। যদিও অন্যান্য প্রাণীরও এ প্রকার স্বভাব দৃষ্টি করা যায়, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান ও একত্র গমনাগমন করিতে ভালবাসে, কিন্তু মনুষ্য যেরূপ সকল বিষয়ে পরস্পর সাপেক্ষ, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ

৯

নহে। আমাদিগকে সকল বিষয়েই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক, তাহাই অন্যের যত্ন-সাধ্য ও অন্যের সাহায্য সাপেক্ষ। এমন কি, যে দেশে বা যে জনপদে বাস করা যায়, তত্রত্য লোকে যে পরিমাণে কর্ম্ম-দক্ষ, জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল হয়, সেই পরিমাণে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃষকেরা কৃষি-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উত্তমরূপ শস্য, ফল, মূলাদি উৎপাদন করিতে না পারিলে, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না। শিল্পকারেরা শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া সুখ-সম্ভোগের উপযোগী উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে, এবং নাবিক ও বণিকগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া নানা দেশীয় দ্রব্য জাত আনয়ন করিতে পারগ না হইলে আমরা সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না। স্বদেশে উত্তমোত্তম বিদ্যালয় সংস্থাপিত ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রচলিত না থাকিলে, তাহাদের সহবাসে থাকিয়া যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোন জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অধার্ম্মিক মূর্খ লোকের সহিত নিরন্তর একত্র বাস করেন, তাহা হইলে কোনক্রমেই সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন না। তিনি আত্মসদৃশ সদ্বিদ্যাশালী, ধার্ম্মিক লোকের প্রতিবাসী হইলে, যে প্রকার পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, অজ্ঞানী ধার্ম্মিক লোকে পরিবেষ্টিত থাকিলে কোনমতেই সেরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না।

অতএব জন-সমাজে অবস্থিতিপূর্ব্বক অপর সাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধনার্থ চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আত্মোদর পরিপূর্ণ, পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। প্রতিদিবস আপন আপন নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থ ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান,

ধর্ম্ম, স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, তদর্থে সচেষ্ট হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবার প্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থে যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি পরিচালনা করাও যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল লোভ কামাদি রিপু সমুদায়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে যে বিশিষ্ট রূপে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন তাহার মত কি কার্য্য করিতেছি ইহা সকলেরই একবার চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয়, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। এই রকম মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সকলের কর্ত্তব্য। আপন আপন জীবিকানির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করা যেরূপ আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ বিমোচন ও সুখ সম্পাদনার্থে যত্ন ও চেষ্টা করাও আবশ্যকতা।

রচনাটি পুরোপুরি শিশু-সাহিত্যোপযোগী নয়। পরিণত মন ছাড়া অপরের পক্ষে প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য সকল উপলব্ধি করা একরকম অসম্ভব। কিন্তু স্বদেশের উন্নতি করা যে প্রয়োজন প্রবন্ধটি পাঠে এই সার কথাটি কিশোর পাঠকগণ অবশ্যই বুঝবে। বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন না হোলে এমন প্রবন্ধ রচনা সম্ভব নয়। অক্ষয়কুমার বাস্তববাদী ছিলেন। প্রবন্ধটির মধ্যে তাঁর শ্রেণী-চেতনার আভাস পরিস্ফুট। কৃষক, শিল্পকার ও অপরাপর শ্রমজীবিগণের উপর সমাজকে নির্ভর করতে হয় এমন কথা পূর্বের লেখকগণ বোঝাবার চেষ্টাই করেন নি। বস্তুত ধনোৎপাদন করে তারাই। তাদের হিত ও উন্নতি চিন্তা করা এবং সেজন্য সচেষ্ট হওয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন এমন কথা সেকালের শিশু-সাহিত্যে নূতন বৈকি! অক্ষয়কুমার বাস্তব ঘটনার দিকে বালক-বালিকাগণকে সচেতন করতে

উৎসুক ছিলেন। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও তাঁর 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগে এই সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ও এই সৎকাজে অগ্রসর হয়েছেন, এটা আমরা দেখেছি।

চারুপাঠের পর, ১৮৫৩-১৮৫৬-এর মধ্যে প্রকাশিত ছ'-সাতখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের কথা আমরা জানতে পারি। তবে সেগুলি ছাড়াও আরও কিছু কিছু গ্রন্থ যে ঐ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় নি এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ তখন কলকাতায় আরও কতকগুলি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন নূতন গ্রন্থকারকেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তখনকার অনেক গ্রন্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় কিছুই জানবার উপায় নেই। যে কয়জন গ্রন্থকারের তখন খ্যাতি ছিল কেবল তাঁদেরই রচিত শিশু-সাহিত্যের অন্তত নামও জানবার উপায় এখনও আছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বা তর্কবাগীশের জ্ঞানপ্রদীপের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় চারুপাঠ প্রথম ভাগের পর ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগের ভাষা প্রথম ভাগের মতো সংস্কৃত ঘেঁষা নয়, কিছুটা সহজ। সম্ভবত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার প্রভাবই এমন হবার কারণ। দ্বিতীয় ভাগের ভাষার কিঞ্চিৎ পাঠেই বিষয়টি বোঝা যাবে :

> চন্দ্রপ্রভা নামক মহারাজ্যে উগ্রতপা নামা এক ভূপতি ছিলেন ঐ পৃথ্বীপাল স্বীয় প্রবল প্রতাপরূপ মহীবেদীর উপরি-ভাগে সিংহাসন স্থাপন করিয়া সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হইলেন, ফলতঃ সুশিক্ষিত সৈন্যাধ্যক্ষতা ও সংগ্রাম ক্ষমতায় উগ্রপ্রতাপ মহীপতির শাসন সময়ে, সমকালীন লক্ষ ২ ভূপাল মধ্যে এমত ক্ষমতাবান ছিলেন না উক্ত মহারাজকে বিপক্ষভাবে লক্ষ করেন, রাজামাত্রই মহাপ্রতাপান্বিত উগ্রপ্রতাপ রাজ্যেশ্বরকে ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিয়া কর প্রদান করিতেন অতএব দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ উগ্রপ্রতাপ মণ্ডলেশ্বর ধরণী মণ্ডলে কাহাকেও ভয় করিতেন না।...

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তর্কবাগীশের 'নীতিরত্ন'। নীতি-রত্নের ভূমিকায় তর্কবাগীশ বলেছেন :

> রামায়ণ পুরাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি নানা গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হইল আমি তাহাদের মধ্য হইতে বাছনি করিয়া সার ২ শ্লোক সকল লিখিয়াছি এবং আপনি ভাষা কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছি, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শব্দে লিখিত হইয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোকাদি সকলের পাঠযোগ্য হইবে, ···।

প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোক পরে পদ্যে তার অর্থ—এইভাবে গ্রন্থখানি রচিত। পদ্যগুলি সংস্কৃত শ্লোকের মতোই। গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য—'নীতিশিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত হয় নাই।' পূর্বের নীতিবিষয়ক গ্রন্থগুলি পাঠকগণের জীবনে ফলপ্রদ হয় নি অথবা সেগুলির রচনা নিকৃষ্ট এবং বিষয়বস্তু অপ্রয়োজনীয় ছিল, তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁর মন্তব্যটি দ্বারা এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন কি না জানি না। তাঁর গ্রন্থখানিকে ভূমিকায় তিনি নিজেই 'মহারত্ন' বলে উল্লেখ করেছেন। সেকালের শিশুরা যে কিরূপ মহারত্ন লাভ করেছিল তার একটি পাঠেই বোঝা যাবে :

> বৃদ্ধৌ চ মাতা পিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
> অপকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥৬॥
>
> বৃদ্ধাবস্থা পিতামাতা আর ভার্য্যা সতী।
> আত্মজ দুহিতা শিশু নাহি অন্য গতি ॥
>
> যদ্যপি করিতে হয় অপকর্ম্ম শত।
> তথাচ পালন যোগ্য মনু অভিমত ॥৬॥

এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার না হওয়াই সম্ভব।

শিশু-সাহিত্যে তারাশঙ্কর তর্করত্নের দানও স্বীকার্য। বস্তুত তাঁর রচনাশৈলী সেকালে পাঠকসাধারণের চিত্তজয় ও বঙ্কিমচন্দ্রেরও

প্রশংসা অর্জন করে। তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' একালে অপ্রচলিত কিন্তু তার নামটি এখনও মোছে নি। তারাশঙ্করের কাদম্বরী মূল সংস্কৃত গদ্যগ্রন্থ কাদম্বরীর অনুবাদ। গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় গ্রন্থকার তা স্বীকার করেছেন, অবলম্বনে রচিত নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতি ও জীবনচরিতের পর এমন সুন্দর সাহিত্যগ্রন্থ আর একখানিও রচিত হয় নি। ভাষার আশ্চর্য উজ্জ্বলতা, শ্রী ও শব্দের ঘটা। গ্রন্থখানি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও, ১৯১৮ খৃস্টাব্দের পূর্বে, বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে সাহিত্যগ্রন্থরূপে পাঠ্য ছিল। গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে।

কাদম্বরীর উপক্রমণিকা ভাগের কিয়দংশ পাঠে জানা যাবে বিদ্যাসাগর-যুগে কেমন উৎকৃষ্ট শিশু-সাহিত্য রচিত হয়।

> ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে ভগবান অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। যেস্থানে ত্রেতা-বতার ভগবান রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটিতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে স্থানে দুর্বৃত্ত দশানন প্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক জানকীর নিকট হইতে রামচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল। যেস্থানে মৈথিলীবিয়োগবিধুর রাম ও লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে ও গদগদবচনে নানাপ্রকার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া তত্রস্থ পশুপক্ষীদিগকেও পরিতাপিত করিয়া-ছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে পম্পানামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিমতীরে ভগবান রামচন্দ্র শরদ্বারা যে সপ্তুতাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে, বোধহয় যেন, আলবাল রহিয়াছে। উহার শাখা-প্রশাখাসকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধহয় যেন হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক গগন মণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে।

স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধহয় যেন, একেবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিবার আশায় মুখ বাড়াইতেছে। ···

এই ১৮৫৪ খৃস্টাব্দেই কলিকাতা খৃস্টান স্কুল-বুক সোসাইটি 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামে একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আমরা ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড দেখেছি, ১ম ও ২য় খণ্ডের সন্ধান পাই নি। সেকারণ শেষোক্ত গ্রন্থ দুখানি কোন সালে প্রকাশিত হয় এবং সে দুখানির বিষয়বস্তু কি ছিল বলা সম্ভব নয়। অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে তাঁর নিজস্ব রচনা-সংকলন। বঙ্গীয় পাঠাবলীর ৩য় খণ্ডের রচনাবলীও প্রাপ্তবয়স্কগণের পাঠ্য সংবাদপত্র যেমন সংবাদ কৌমুদী, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞানসার সংগ্রহ, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি সাতখানি পত্রিকা ও হিতোপদেশ থেকে সংকলিত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সেকালে ঐ সকল পত্রিকায় এমন রচনা প্রকাশিত হোত যাকে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অথবা সেকালের শিশু-সাহিত্য ও বয়স্কগণের পাঠ্য সাহিত্যের কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদৌ পার্থক্য ছিল না, সেগুলির রূপ ছিল এমনই সার্বজনীন। তার একটি উদাহরণ এই :

মেগপনা।

১৮২৬ সালে ভরতপুর অধিকার হওনের পর প্রকৃত ঠগী ব্যাপার হইতে উৎপন্ন এই নূতন ঠগী ব্যাপারে অতি ঘৃণ্য নাম ঠগ, যাহারা সম্পত্তি লুঠ করিবার নিমিত্ত মানুষ হত্যা করে, কিন্তু মেগপনা লোকেরা বালক লুঠ করিয়া গোলামের ন্যায় বিক্রয় করণার্থ পথিক লোকের দিগকে বধ করে। এই কুব্যবহারের সরদার ক্ষমা জমাদার নামক ব্যক্তিকে লোকেরা এমত ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত যে, সে ধরা পড়িবার পরও গ্রামের মধ্যে একটি অগ্নি লাগাতে গ্রামস্থ লোকেরা অগ্নি নির্ব্বাণার্থ প্রার্থনা করিল, তাহাতে সেই ব্যক্তি ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করাতে কাকতালীয়বৎ তৎক্ষণাৎ অগ্নি থামিল, এই ঘৃণিত দুরাচারে যাহারা লিপ্ত আছে

তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহারদের এমত দৃঢ় বোধ আছে যে এই ব্যবহার আমরা মা কালীর অনুগ্রেতে করি। এবং ঠগেদের বিশেষ লক্ষণ এই, যে তাহারা হত্যা করণার্থ যাত্রাতে পরিবার শুদ্ধাই গমন করে এবং তাহারদের স্ত্রীলোকের এই কর্ম্ম যে পথিকের দিগকে ভুলায় এবং যে পর্য্যন্ত পথিক বালকেরা লুঠিত হইয়া বিক্রীত না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। তাহারা সামান্যতঃ দরিদ্র পথিক ব্যক্তিদিগের সহিত বাচনিক কলহ করিয়া তাঁহাদের প্রতি এইরূপ করে, যেহেতুক ধনি লোক অপেক্ষা দরিদ্র লোকেরদের হারাণ বিষয়ে সন্দেহ অল্প হয় এবং ধনি লোক অপেক্ষা দরিদ্র লোককে হত্যা করিয়া বালক পাওয়াতে ঠগেরদের অধিক লাভ ও নিরুদ্বেগ আছে, তাহারা হতপিতৃমাতৃক বালকদিগকে ক্রয় করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং ক্রীত বালকদিগকে প্রধান ২ নগরের বেশ্যালয়ে কিম্বা ধনি লোকদিগের নিকটে অনায়াসে বিক্রয় করে। আপন বালক ভরণপোষণ করণে অক্ষম এমত দরিদ্র পিতামাতার স্থানে এই বালিকা ক্রয় করা গিয়াছিল, ইহা কহিয়া বিক্রয় সময়ে সন্দেহ দূর করায়, এই কুব্যাপার এত অল্প দিন আরম্ভ হইয়াছে, যে উপরি দোয়াব ও দিল্লী প্রদেশ ও রাজপুতানা ও আলবার রাজ্যের অতিরিক্ত প্রদেশে ব্যাপে নাই। তাহাদের রীতি আছে যে, হত ব্যক্তির শব নিকটস্থ নদীতে ফেলিয়া দেয় এবং লোকেরা ঐ সব দেখিয়া চিনিতে না পারে এমত দূরে তাহাদিগকে লইয়া যায়, এই প্রযুক্ত ঐ ঠগেরদের দোষ দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করিতে অনেক ব্যাঘাত জন্মে।

কাহিনীটি ১৮৩৯ খৃস্টাব্দের জ্ঞানান্বেষণ নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় পাঠাবলী বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল কিন্তু কোন কোন শ্রেণীতে তা আমরা জানতে পারি নি। ইতিহাসের ছাত্রগণ উপরোক্ত কাহিনী অবশ্যই জানেন। রচনাটির ভাষা ও বাক্যগঠন প্রণালীর সঙ্গে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের শিশু-সাহিত্যের

শিবনাথ শাস্ত্রী

॥ পৃষ্ঠা ১৩৭ ॥

(শ্রীসত্যজিৎ রায় ও সিগনেট প্রেসের সৌজন্যে)

ভাষা ও বাক্যগঠন প্রণালীর অনেক তফাত। তখন বিদ্যাসাগরের লেখনী ভাষা-তরঙ্গিণীকে সুখাতে বইয়ে নিয়ে চলেছে। কাহিনীটির মধ্যে বীভৎস রস বর্তমান। লোমহর্ষক কাহিনী শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেইসঙ্গে তাকে ভয়ে অবশও করে থাকে। তারই মধ্যে সে আনন্দরসপানে তৃপ্ত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকথাকার অ্যানস অ্যানডারসেন তখনও জীবিত (১৮০৫-১৮৭৫ খৃস্টাব্দ)। তাঁর সুমধুর গল্পগুলির কয়েকটি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ইংরেজী থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেন। মধুসূদন ছিলেন অনুবাদক সমাজের সহকারী কর্মসচিব। দিনেমার ভাষা থেকে ইংরেজীতে, ইংরেজী থেকে বাঙলায় তর্জমা হওয়ার ফলে গল্পগুলির রস কিছুটা ব্যাহত হোলেও গ্রন্থগুলি পাঠকসমাজে আদৃত হয়। কারণ তখন বাঙলায় কোনও উৎকৃষ্ট গল্পগ্রন্থ ছিল না। শিশু-সাহিত্যের এই গল্পগুলিই অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক সকল শ্রেণীর পাঠকের গল্পরসপিপাসু মনকে সম্ভবমতো আনন্দ দান করতো। এই গ্রন্থগুলির পূর্বে শিশু-সাহিত্য ছিল বিদ্যালয়পাঠ্য। মধুসূদনের এই সকল গ্রন্থ সে সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়। 'হংসরূপি রাজপুত্র' ও 'চকমকি বাক্স' নামক গল্প দুটি সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' মন্তব্য করেছেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে লোকে এই গ্রন্থগুলি পাঠে সন্তুষ্ট থাকতো। এই অবস্থা শিশু-সাহিত্যের পক্ষে গৌরবের বা পাঠকসাধারণের পক্ষে অগৌরবের তা জানি না। কিন্তু একথা রসিকজনমাত্রেই স্বীকার করে থাকেন যে, অ্যানস অ্যানডারসেনের রচনাগুলির আবেদন সার্বজনীন। যাহোক, মধুসূদনের এই সকল গ্রন্থের মুদ্রণকাল ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। কয়েকখানি তার পরেও মুদ্রিত হয়। শিশু-সাহিত্য রচয়িতা মধুসূদন বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে পাঠকসমাজে তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন।

ইংরেজীতে 'মারমেড', 'নাইটিংগেল', 'সোয়ান প্রিনস্' ও 'আগ্‌লি ডাকলিংয়ে'র বাঙলা মধুসূদন করেছিলেন যথাক্রমে 'মৎস্যনারীর

উপাখ্যান,' 'চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ', 'হংসরূপি রাজপুত্র' ও 'কুৎসিৎ হংসশাবক'।

চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণের মধুসূদন যা অনুবাদ করেন তার কিয়দংশ এই :

> বুলবুল উত্তর করিল, বনমধ্যে আমি যেমন উত্তমরূপে গীত গাহিতে পারি, তেমন আর কোথাও পারি না। তথাপি রাজা স্বয়ং তাহার গীত শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এ জন্য সে ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে রাজসভাতে চলিল। এখানে [illegible] সমারোহের পরিসীমা নাই। একে উহার প্রাচীর এবং মেঝ্যা সকল কাচদ্বারা নির্ম্মিত, তাহাতে সহস্র সহস্র সোনার ঝাড় পরিদীপ্যমান হইয়া অতিশয় ঝক্‌মক্ করিতেছিল। দুর্লভ পুষ্পগুলী (?) পথের স্থানে ২ স্থাপন করিয়া তাহাতে ক্ষুদ্র ২ ঘণ্টা লাগান ছিল। বায়ুসঞ্চালন এবং লোকদিগের ইতস্ততঃ গমনাগমনদ্বারা ঘণ্টাগুলীন এমন ঠুন ঠুন করিতেছিল যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক কেহ আপনার কথা আপনি শ্রবণ করিতে পারিত না। রাজসভার মধ্যস্থলে মহারাজ স্বয়ং বসিয়াছিলেন। তাঁহারই সম্মুখ ভাগে বুলবুলের নিমিত্ত সোনার পিঞ্জর প্রস্তুত ছিল। প্রধান প্রধান সকল লোকেই সভাতে বর্ত্তমান। পূর্ব্বোক্ত দরিদ্রা বালা রাজপাচিকা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতে অনুমতি পাইয়াছিল। উপস্থিত লোকমাত্রেই উত্তমোত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া পাংশুবর্ণ ঐ ক্ষুদ্র পক্ষীর প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করাতে, রাজা মস্তক লাড়িয়া বুলবুলকে গান গাইতে আজ্ঞা করিলেন। বুলবুল যথাসাধ্য অতিশয় পরিশ্রম করিয়া মধুর স্বরে গীত গাইতে আরম্ভ করিল। ভূপাল তাহা শ্রবণ করিয়া এমন মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পতন হইতে লাগিল। দেশাধিপতির গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে বুলবুল তাহা অবলোকন করিবামাত্র আরও উত্তম সুর লাগাইয়া গান গাইতে লাগিল, ইহাতে সকলেরই

অন্তঃকরণ একেবারে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। পক্ষিরবে মহারাজ বিহ্বল হইয়া আজ্ঞা করিলেন, সোনারপাতে বুলবুলের গলদেশ বাঁধাইয়া দাও।

'নাড়িয়া' ক্রিয়াপদটিকে 'লাড়িয়া' লেখা হয়েছে। এইরূপ 'লড়া', 'লড়ে' ইত্যাদির ব্যবহার মধুসূদনের রচনায় পাওয়া যায়।

আর হংসরূপী রাজপুত্রের কিয়দংশ এই :

হংসরূপি রাজপুত্র

পূর্ব্বকালে কোন দেশে দুর্ব্বুদ্ধি নামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার একাদশ পুত্র এবং মনোরমা নামে এক কন্যা ছিল। সেই দেশ আমাদের দেশের মতো নহে; এখানে আমরা প্রতিদিন নানা বর্ণের নানা পক্ষী দেখি। কিন্তু সেখানে কেবল পক্ষীর মধ্যে শত শত রাজহংস বিবিধ প্রকারে কেলি করিয়া বেড়ায়। বড় লোকের বড় চাইল, একাদশ রাজপুত্রেই হার, বালা, বাজু প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া পাঠশালায় বিদ্যা-শিক্ষা করিতে যাইত। রাজকুমার বলিয়া তাহাদের পার্শ্বে একখানি তরবারিও ঝুলিত। তাহারা সোনার দোয়াতে ও সোনার কলমে লিখিত। এবং পাঠ গ্রহণ করিয়াই অনায়াসে অভ্যাস করিয়া ফেলিত; তাহাদের দেখিলেই লোকের বোধ হইত যে, তাহারা যথার্থই রাজকুমার বটে। মনোরমাকে রাজামহাশয় বাল্যকালেই বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে শিক্ষকের নিকট হইতে অবকাশ পাইলেই একখানি আয়নার সম্মুখে বসিয়া নানাপ্রকার ছবিযুক্ত পুস্তক পাঠ করিত।

উদ্ধৃতিটি দ্বিতীয় সংস্করণের। প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং মন্তব্য করেছেন: '...এই গ্রন্থখানি ইংরাজী হইতে অবিকল অনুবাদই করিয়াছিলাম। সুতরাং প্রথমবারে ইহার ভাষা প্রণালী তাদৃশ উত্তম হয় নাই। বস্তুতঃ কোন বিজাতীয় ভাষা হইতে অবিকল ভাষান্তর করিলে, তাহার প্রণালী সুসঙ্গত হইবার সম্ভাবনাও নাই,

ইহা প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গেও স্বীকার করিয়া থাকেন।…' হংসরূপী রাজপুত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে। গ্রন্থগুলি সচিত্র, কিন্তু মাত্র একখানি করে উডকাট ছবি আছে। 'মৎস্যনারীর উপাখ্যানে'র ছবিখানির একধারে লিখিত আছে :

> মৎস্যনারীর সাহায্যেতে এই রাজকুমার রক্ষা পাইয়াছিলেন। শ্রীরামধন দাস স্বর্ণকারের খোদিত। সাং সিমুল্যা।

রামধন দাস অন্য গ্রন্থগুলির চিত্রও খোদিত করেন।

কেদারনাথ মজুমদারকৃত ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বাংলার সাময়িক সাহিত্যে' জানা যায় কলিকাতা খৃস্টান স্কুল-বুক সোসাইটি ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ৩য় খণ্ডের আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। আমরা 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' চতুর্থ খণ্ড দেখেছি। পুস্তকখানি 'Calcutta Christian School Book Society' কর্তৃক ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত। আবার, এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৫২ খৃস্টাব্দ। ছাপাখানার নাম এসাইক্লোপিডিয়া প্রেস, কলি। প্রকাশিত গ্রন্থখানিকে বলা হয়েছে 'হিতোপদেশের চতুর্থ ভাগ'। মজুমদার মহাশয়ের সংবাদে জানা যায়, দিগ্দর্শনের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি রামমোহন রায়ের রচনা এবং বঙ্গীয় পাঠাবলীতে সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু কোন খণ্ডে তা তিনি বলেন নি। এমন কি, অন্যান্য খণ্ডের উল্লেখও করেন নি। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নিবন্ধগুলি রামমোহন রায়ের পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদীতে' পুনর্প্রকাশিত হয়। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, নিবন্ধগুলি রাজা রামমোহন রায় রচিত। আমরা কিন্তু চতুর্থ খণ্ডে নিবন্ধগুলিকে দেখি নি, ৩য় খণ্ডেই কয়েকটি দেখেছি এবং এই গ্রন্থের পত্রিকা বিভাগে সে সম্বন্ধে আলোচনাও করেছি। সেই আলোচনা পাঠে জানা যায় দিগ্দর্শন ও বঙ্গীয় পাঠাবলীর ঐ সকল রচনায় পার্থক্য বর্তমান।

বঙ্গীয় পাঠাবলী চতুর্থ খণ্ড সম্বন্ধে পূর্বে অন্য প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে নানা বিষয়ের কথা ও কতকগুলি পদ্য আছে। তবুও মনে হয়, গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য ছিল যীশুখৃস্ট ও তৎপ্রচারিত ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন। গ্রন্থখানির রচনাবলী সংকলন নয়, কিন্তু দু'-একটি ছাড়া অবশিষ্টগুলির রচয়িতা কে তা সঠিক বলা যায় না :

গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে পাঠকের প্রতি উপদেশ। তার ভাষাও যাকে খৃস্টানী বাঙলা বলা হয়, তাই। কিছু উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যাবে :

> হে পাঠক, আপনার তত্ত্বানুসন্ধান কর। তুমি কোন ইহা বিবেচনা কর। তোমার হিতজনক অনেক প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ···কিন্তু হে পাঠক, তুমি পাপি ও পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যত দোষ হয় সেই সকল দোষ হইতে এবং অন্তঃকরণস্থ দুষ্টতা হইতে তোমার মুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থে পাপ এবং মুক্তি বিষয়ক বিশেষতঃ মনুষ্যের ত্রাণকর্ত্তা যে যীশুখৃষ্ট তাঁহার দয়া বিষয়ক অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। ···

গ্রন্থখানি অনেকের রচনায় সমৃদ্ধ মনে হয়। ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য ও তারতম্য চোখে পড়ে। গ্রন্থের '৩৪শ সংখ্যা'র বিবরণটির কিয়দংশ উদ্ধারযোগ্য :

৩৪শ সংখ্যা

বেলুন।

> গত মাসের মধ্যে মেং কাইট নামা একজন সাহেব শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের উদ্যান হইতে বেলুন যোগে আকাশবিহারী হওয়াতে কলিকাতার লোকেরা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, রবার্টসন নামক একব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে একবার উড্ডীন হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উঠিবার অনতিবিলম্বেই নামিয়াছিলেন,

আর তাহা চৌদ্দ বৎসর গত হওয়াতে বর্ত্তমান যুবক লোকদের তদ্বিষয় স্মরণ নাই, সুতরাং কাইট সাহেবের আকাশগমন দেখিয়া প্রায় সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। ···

(বেলুনটির বর্ণনার পর)

পূর্ব্বোক্ত মেং কাইট সাহেব ৫ নবম্বর দিবসে উড্ডীন হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দমদমার উপর প্রকাশমান হয়েন, পরে বায়ুদ্বারা সাগরের নিকট বাহিত হয়েন, অবশেষে বাতাসের বিপরীত সঞ্চার হওয়াতে তিনি জাগুলের সন্নিদ্ধ কোটরা গ্রামে আসিয়া অবরোহণ করেন। কাইট সাহেব আপনার আকাশ বিহারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, কেননা অতিশয় শীতল বাতাস পাওয়াতে তাঁহার কর্ণকুহর কণ ২ করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি একটা চুরুট জ্বালিয়া ধূমপান করত কালহরণ করিতে লাগিলেন। পরে অবরোহণ করিবার মানসে গ্যাস বাহির করিবার সূত্র আকর্ষণ করাতে তাহা ছিন্ন হইয়া গেল কিন্তু দৈবাৎ তাহার নিকট এক বড়শা ছিল, তদ্দারা বেলুনের কোন ২ অংশ বিদীর্ণ করাতে তাহা নীচে নামিতে লাগিল।

অপর সমুদ্রের জল এবং প্রবল তরঙ্গধ্বনি তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়াতে তিনি পুনশ্চ বেলুন বিদীর্ণ করত অবরোহণ করিতে লাগিলে পরে অনুকূল বায়ুর সঞ্চার হওয়াতে তিনি পুনশ্চ বেলুন বিদীর্ণ করত অবরোহণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে প্রায় ১ ঘটিকার সময় কোটরা গ্রামের সন্নিকটস্থ হওয়াতে, লৌহময় নঙ্গর নিক্ষেপ করিলেন তাহাতে বেলুন স্থগিত হইল। তখন কৃষক লোক সেই স্থলে থাকাতে তাহারা রজ্জু ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইল।

তিনি জাগুলে নিবাসী বাবু রাধাবল্লভ বিশ্বাসের বাটীতে আসিয়া সেই রাত্রি প্রবাস করেন, পর দিবস প্রাতঃকালে শকটারোহণ করিয়া কলিকাতায় আইসেন।

রচনাটি দুঃসাহসিক অভিযানকাহিনী। এই ধরনের কাহিনী সকল বয়সের মানুষকেই আকৃষ্ট করে। এগুলি বীরগাথা পর্যায়ের, কাজেই কিছুটা শাশ্বত রূপ আছে।

বঙ্গীয় পাঠাবলী চতুর্থ খণ্ডের 'বহুরূপী' নামে কবিতাটি পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। কবিতাটি সে সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল মনে হয়। কারণ, পঁচিশ বৎসর পরেও কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'পদ্যপাঠ' তৃতীয় ভাগের পঞ্চবিংশতি সংস্করণেও কবিতাটি দেখা যায়। যদুগোপালের কবিতাবলী সেকালের, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও, শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেতো। তবে কবিতাগুলি ছিল কিঞ্চিৎ গুরুগম্ভীর। যদুগোপাল কবিতা রচনা করতেন বালক-বালিকাদের জন্য। তাঁর গ্রন্থে তিনি সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণকে কবিতায় ছন্দ, উপমা ও অলঙ্কারাদি বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শিশু-সাহিত্য রচয়িতা।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশক পর্যন্ত শিশু-সাহিত্য অনুবাদে সমৃদ্ধ। আর সে সবই গদ্য। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠাবলী চতুর্থ খণ্ডে—পূর্বেই বলেছি ১ম ও ২য় খণ্ডগুলির কথা আমাদের জানার সুযোগ ঘটে নি—অনূদিত কবিতাও পাওয়া যায়। আমাদের শৈশবে, প্রবীণ শিক্ষক মহাশয়ের মুখেও নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি শুনেছি :

উৎকৃষ্ট স্থানের বিষয়।

১। তব মুখে শুনি শ্রেষ্ঠ স্থানের বিষয়।
তথাকার শিশু নাকি অতি সুখী হয়॥
বল গো বল গো ওমা কোথা সেই তীর।
তত্ত্ব করি সুখী হব ফেলিব না নীর॥
কমলা লেবুর ফুল ফুটে যেই খানে।
অথবা জোনাকী পোকা থাকে যেই স্থানে॥
সেই বুঝি রম্যস্থান জিজ্ঞাসি জননি।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি॥

২। তবে বুঝি যে ভূমিতে তালগাছ হয়।
তপনের তাপে যথা খর্জ্জুর পাকায়॥
অথবা হরিতবর্ণ দ্বীপ যে সাগরে।
সুগন্ধি পুষ্পের বন সুবাতাস করে॥
নানা পক্ষী সুন্দর বিচিত্র পাখা ধরি।
বিভূষিত বিবিধ বর্ণেতে শোভাকারী॥
মনোহর স্থান সেই বলি গো জননী।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি॥

৩। পূর্ব্বতন কোন খণ্ডে এ দেশ কি হয়।
স্বর্ণময় বালুকায় নদীধারা বয়॥
যথা পদ্মরাগ মণি অতি দীপ্তি করে।
হীরক জলয়ে যথা আকর ভিতরে॥
নদীর তীরস্থ ভূমি পূর্ণ প্রবালেতে।
মুকুতার ছটা শোভে তাহার মধ্যেতে॥
সেই কি উৎকৃষ্ট স্থান বল গো জননি।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি॥

৪। চক্ষু নাহি দেখে তাহা শুন প্রাণধন।
শ্রবণে না করে কভু সে গীত শ্রবণ॥
স্বপনে অশক্ত তার ছবি লিখিবারে।
শোক মৃত্যু তথায় প্রবেশ নাহি করে॥
অমালিন্য মুকুল, নিয়ত হয় যথা।
কালের কুটিল কর নাহি যায় তথা॥
ঘন স্থানাভাব যথা সমাজ না শুনি।
তথায় তথায় হয় অরে যাদুমণি॥

বিদ্যাসাগর-যুগের যে কয়েকজন খ্যাতিমান শিশু-সাহিত্য রচয়িতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থ টেলিমেকাসের বঙ্গানুবাদ করেন তিনিই। টেলিমেকাস ফরাসী সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। চতুর্দশ লুইর পৌত্রকে বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা দানোদ্দেশ্যে ফেনেলঁা কর্তৃক গ্রন্থখানি রচিত হয়।

ঐ বালকটি ছিল অত্যন্ত উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। বাংলার শিশু-সাহিত্য রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টেলিমেকাস' দ্বারাও সমৃদ্ধ হয়। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে। কাজেই গ্রন্থখানি মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের গল্পপুস্তকগুলির সমকালীন। সে সময়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপেও প্রচলিত ছিল কি না জানা যায় না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছুকাল বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর বাঙলাগ্রন্থের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল।

গ্রন্থখানির 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার লিখছেন :

> এই গ্রন্থ অবিকল অনুবাদ নহে; আমার ক্ষমতা ও বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা অনুসারে যতদূর সম্ভবিতে পারে, ইহাতে মূল গ্রন্থের তাৎপর্য্য মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশাধন করিয়া দিয়াছেন। ···

মূল গ্রন্থ তো ফরাসী ভাষায় রচিত। তবে কি তিনি ফরাসী ভাষা থেকে 'তাৎপর্য্যমাত্র সংকলন' করেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় ফরাসী ভাষাও জানতেন এ কথা বিদ্যাসাগরচরিত বিশেষজ্ঞেরা বলেন না। তবে তিনি গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন করেন কিরূপে? সম্ভবত ভাষার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে থাকবেন। ঘটনা যাই হোক, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টেলিমেকাস' শিশু-সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

গ্রন্থখানির 'প্রথম সর্গে'র প্রারম্ভ পাঠেই সমগ্র অনুবাদের স্বচ্ছতা সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।

> টেলিমেকাস।
>
> প্রথম সর্গ।
>
> ইউলিসিস প্রস্থান করিলে কালিপ্সো তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই এই আক্ষেপ করিতেন, হায়! কেন আমি অমর হইয়াছিলাম; অমর হইয়া চিরকাল

কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল; কখনও যে এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইব তাহার সম্ভাবনা নাই। তদবধি তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া একাকিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাল যাপন করিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। তাঁহার পরিচারিকা অপ্সরাগণ নিস্তব্ধ হইয়া দূরে দণ্ডায়মান থাকিত, সাহস করিয়া সম্মুখে আসিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিত না। তদীয় আবাসদ্বীপে সতত বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ছিল; সুতরাং উপবনবর্ত্তী তরু ও লতা সকল নিরন্তর নব পল্লবে ও পুষ্প ফলে সুশোভিত থাকিত। তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া শোকোপনোদন মানসে সর্ব্বদাই একাকিনী সেই পরম রমণীয় উপবনে ভ্রমণ করিতেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার বিরহানল নির্ব্বাপিত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কখনও কখনও তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ নয়নে অর্ণবতীরে দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং যে দিকে প্রিয়তমের অর্ণবযান ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছিল, সেইদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পরাশি বিগলিত হইত।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিরচিত 'নবনীতিসার' নামে গ্রন্থখানিও প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে। পুস্তকখানি ঈশ্বরচন্দ্র কবিরত্ন সংশোধন করেন। রচয়িতা গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' লিখছেন:

এই মহীমণ্ডলের মধ্যে বহু গুণবান ও জ্ঞানবান মহাশয়গণ সাধারণ মানবগণের হিতার্থে বহুবিধ সুনীতি বিষয়াদির নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন আমি তন্মধ্যে নবপ্রকার নীতি কথন প্রয়োগ করিয়া তাহাতে নব ২ উদাহরণদ্বারা নব প্রকার প্রমাণ সহিত নবনীতিসার নামক পুস্তক গদ্য প্রবন্ধে প্রস্তুত করিলাম এই পুস্তক পাঠ এবং শ্রবণে সাধারণ জনগণের ও বালকদিগের সুনীতি প্রীতি এবং সাতিশয় বোধোদয় হইবে।...

প্রথমে একটি নীতিবাক্য, তারপরে একটি উদাহরণে তার ব্যাখ্যা এই রীতি অনুযায়ী সমগ্র গ্রন্থখানি রচিত। কেশবচন্দ্র কর্মকার

প্রথমে এই রীতি অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অনুসরণ করেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তাঁর দু' বৎসর পরে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যও সেই পথে অগ্রসর হন। কালীকৃষ্ণের সময়ে বাঙলা গদ্যরচনার রীতি অনেক উন্নত, ভাষা কিছুটা সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত ও ইংরেজী ঘেঁষা এবং বাক্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু কালীকৃষ্ণ যতির ব্যবহার করেন না, তাঁর রচনাও সংস্কৃত ঘেঁষা ও আড়ষ্ট। মনে হয়, গ্রন্থখানি এই সকল কারণে পাঠকমহলে বহুল প্রচারিত হয় না। কিন্তু রচনা মৌলিক, অনুবাদ নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর-যুগে শিশু-সাহিত্যে দু'-একটি করে মৌলিক গ্রন্থও রচিত হোতে শুরু করে।

গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য সাধারণের সঙ্গে বালকদিগের হিতসাধন হোলেও দু'-তিনটি প্রবন্ধে যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে যেগুলি আজকালকার শিশু-সাহিত্যে অচল। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়পাঠ্য ছিল না বলেই মনে হয়। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের অন্তত গল্পানুবাদ-পুস্তকগুলিও তাই ছিল। নবনীতিসারের একটি রচনার কিঞ্চিৎ পাঠেই তার বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্বন্ধে জানা যাবে।

তৃতীয় ইতিহাস।

বালকসকলের শৈশবকালগতে অর্থাৎ তাহাদের ভোজন এবং গমনাদির যে স্বাধীনতা তৎসময়ের পরাবধি বিদ্যা শিক্ষাদি বিষয়ে পরিশ্রম না করা অতি অনুচিত আর শিশুসকলকে নিত্য ২ উত্তম দ্রব্য ভোজন ও উত্তম শয্যা ও উত্তম বসনাদি প্রদান ও ভৃত্যদ্বারা সেবন কেবল এই সকল অভ্যাস করান কর্ত্তব্য নহে এবং যুবাপুরুষের প্রতিও ঐ সকল অবিধেয় কারণ দৈবাধীন ধনহীন হইলে সুখ সেবাদির অভ্যাস দোষ পরিশ্রম করিতে অসমর্থ ইহজগতে তাহাদিগকে নানা ক্লেশে কাল যাপন করিতে হয়।

ইহার প্রমাণ।

গৌড়দেশে গোপীনাথপুর গ্রামনিবাসী জগদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় নামা এক বিপ্র ক্রমে দুই বিবাহ করিলেন কিছু-কাল পরে দুই রমণীর দুইটি পুত্রোৎপত্তি হইল, জ্যেষ্ঠের পুত্রের নাম প্রেমানন্দ ও কনিষ্ঠার নাম রামানন্দ সেই পুত্রদ্বয়ের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহাদের পিতা জগদানন্দ দ্বিজ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন তাহার তৃতীয় বৎসর পরে রামানন্দের মাতা চরমকালোপস্থিতি জানিয়া নিজ সপত্নী প্রতি অতি বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন ভগ্নি গো দেখ আমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম ···

বিদ্যাসাগর-যুগের পক্ষেও এই রচনারীতি ও ভাষা পুরাতন এবং অতীতের বস্তু! যুগকে অস্বীকার করলে রচনাও যুগোপযোগী হোতে পারে না, পুরাতন পথেই চলে।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিচার'ও প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে। 'বিচার' রচিত হয় 'বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের দোষ পরীক্ষার' উদ্দেশ্যে। কিন্তু রচনা মৌলিক নয় অনুবাদ। বিদ্যালয়ের বালকগণের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে যেমন তখন তেমনি তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরেও অভিভাবকগণ চিন্তাকুল হন। তার প্রমাণও একখানি শিশুপাঠ্যগ্রন্থ। পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আবার আমাদের কালে, বিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগের প্রথমেও ঐ একই সমস্যা। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ছিল গদ্যে-পদ্যে নীতিপ্রধান। এ কালে তা নয়, সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিবিধ। এমন কি বালক-গণকে দুঃসাহসী করবার চেষ্টাও সাহিত্যের মাধ্যমে ঘটে। 'বিচারে' কতকগুলি দুরন্ত ছাত্রের একটি অন্যায়কার্যের কাহিনী ও তাদের বিচারের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠে সুকুমারমতি পাঠকগণ কতটা সংযত ও শুদ্ধ হয়েছিল জানা যায় না। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়পাঠ্য ছিল বলে মনে হয় না। কাজেই বলতে হয়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ই তাঁর গ্রন্থগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে

সাহিত্যের মুক্তপ্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। এদিকের অগ্রপথিক তিনিই। আর এটা ঘটে প্রগতিপন্থী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগেই।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বালক-বালিকাদের জন্য সাহিত্যগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা মধুসূদনের ছিল, এমন কথা তাঁর পুস্তক থেকে জানা যায় না, যেমন জানা যায় বিদ্যাসাগরোত্তর-যুগে ১৮৯২ খৃস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পুস্তকখানির ভূমিকায় তাঁর পরিকল্পনার কথা। যোগীন্দ্রনাথ পরিকল্পনামতোই এই পথে প্রথম অগ্রসর হন। পরে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বিচারের এক বৎসর পরে ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের 'হিতকথাবলী'। গ্রন্থখানি আমাদের হাতে না আসায় তার বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা গেল না।

'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও শিশু ও কিশোর-সাহিত্য সমৃদ্ধিকল্পে ছয়-সাতখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ কয়খানির নাম, 'নীতিসার ১ম, ২য় ও ৩য়', 'রোমরাজ্যের ইতিহাস', 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' ও 'উপদেশমালা ১ম ও ২য়'। তাঁর প্রথম গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৫৬ খৃস্টাব্দ, শেষ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ। নীতিসার কতকটা কর্মকার মহাশয়ের 'বালকবোধকে-তিহাসে'র অনুসরণে রচিত—প্রথমে একটি উপদেশ, পরে গল্পাকারে উদাহরণ। গল্পগুলি সরস না হোলেও মৌলিক। তবে বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রধানত প্রবন্ধকার ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ইতিহাস রচনার একটু ইতিবৃত্ত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় তিনি ইতিহাস দুখানির রচনায় প্রবৃত্ত হন। 'কারণ সুলিখিত পাঠ্যপুস্তকের একান্ত অভাব।' আর 'উপদেশমালা' সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখছেন: 'আমি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার্থ পদ্যে কতকগুলি নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া উপদেশমালা নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম।' লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পূর্ববর্তী লেখকগণ কেবল বালকদের জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'বালক-

বালিকাদিগের শিক্ষার্থ' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কারণ ১৮৮২ খৃস্টাব্দের অনেক পূর্ব্বেই বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়।

বঙ্গানুবাদক সমাজ বা Vernacular Literature Society তরুণ পাঠকগণের জন্য কেবল গল্পপুস্তকই অনুবাদ করান নি। কয়েকখানি ছোট ছোট গ্রন্থও প্রথমে ইংরাজীতে রচনা করে পরে সেগুলির অনুবাদ করিয়ে নাম দেন, 'অদ্ভুত ইতিহাস'। অদ্ভুত ইতিহাস ঠিক ইতিহাস নয়, দিগ্বিজয়ীর বিজয়কাহিনী। কতকটা এই ধরনের ঐতিহাসিক কাহিনী আমাদের কালেও রচিত হয়েছে। আমরা দুখানি অদ্ভুত ইতিহাস দেখেছি—একখানি 'তৈমুরলঙ্গ বৃত্তান্ত', অপরখানি 'সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়'। প্রথমখানির প্রকাশকাল ১৮৫৬ খৃস্টাব্দ, দ্বিতীয়খানির ১৮৬০ খৃস্টাব্দ। দুখানি গ্রন্থই সম্ভবত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনুবাদ করেন। অন্তত প্রথমখানিতে অনুবাদক হিসাবে তাঁর নাম মুদ্রিত দেখা যায়। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনুবাদক হিসাবে প্রশংসাও অর্জন করেন। গ্রন্থ দুখানি বিদ্যালয়পাঠ্য ছিল কি না জানা যায় না। এই গ্রন্থখানি দেখেই কি বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথকে 'রোম' ও 'গ্রীসের' ইতিহাস রচনা করতে বলেন? গ্রন্থ দুখানিতে গল্পই আছে। মনে হয় আরও দু'-একজন দিগ্বিজয়ী যেমন চেঙ্গিজ খাঁর কাহিনীও ঐ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

তৈমুর লঙ দিল্লী আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অধিবাসিগণকে নরনারী নির্বিশেষে হত্যা করেন। 'অদ্ভুত ইতিহাসে' এই নিষ্ঠুর দিগ্বিজয়ীর দিল্লী আক্রমণের বিবরণ থেকে কিছু উদ্ধৃত হোল :

> সেপ্টেম্বর মাসে তৈমুর সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইলেন। দিল্লী নামক প্রধান শহরে পঁহুছিতে তিন ক্রোশ আছে, এমন স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সম্মুখ যুদ্ধের আয়োজনে তৎপর হইতে লাগিলেন। যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সভাস্থ সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সময়ে যাত্রিক লগ্ন অবধারিত হইতে পারে কি না?" দৈবজ্ঞগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়া উত্তর করিলেন, "গ্রহ সকল এক্ষণে বড়

অনুকূল নহেন, অতএব এই যাত্রা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা অতি কর্ত্তব্য।" তৎকালে এই বিচক্ষণ গণকগণের মতে সম্মত না হইয়া তিনি অতিশয় সাহসপূর্ব্বক তাহাদের কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করিলেন এবং কহিলেন, "আমি গ্রহ নক্ষত্র কিছুই মানিনা। যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যের শাসনকর্ত্তা, যিনি যাবদীয় পদার্থের নিয়মকর্ত্তা, তিনি আমার অন্তঃকরণে যে প্রকার বিবেক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই বিবেকশক্তিদ্বারা দর্শন মাত্রেই কি কেমন বস্তু তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারি; কোন কর্ম্ম কখন করিতে হয় তাহা বুঝিতেও বড় আয়াস পাইতে হয় না। আমার মনই আমার প্রধানমন্ত্রী। পরমেশ্বর আমার মনকে নিয়ম করিতেছেন এবং পরমেশ্বরই আমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা শিখাইতেছেন। যদি তিনি কি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে পারেন, তখন কি করিতে হইবেক তাহাও শিখাইয়া দেন। এখন আমার মন আমাকে বলিতেছে, যুদ্ধ যাত্রা কর, গেলেই জয়ী হইবে।" এই সকল কথার পরে তিনি কোরানের পুথিখানি খুলিয়া কহিলেন, "এই দেখ, কোরানে লিখিয়াছে, রাত্রিযোগে সিংহের মতো যাত্রা কর, এবং যাহাকে লক্ষ্য করিবে অন্ধকারে তাহাকে আক্রমণ কর।"

যখন এই সকল কথোপকথন হয়, তখন বেলা অবসানপ্রায় হইয়াছিল। সম্মুখে হিন্দুস্থানীয় সেনাগণ প্রায় নয় ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। তাহারা অনুমান করিয়া দেখিল, যে দিবা অবসান হইয়াছে, তৈমুরের আর এ সময়ে আসিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কালি প্রাতঃকালে আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা। মনে মনে এই প্রকার কল্পনা করিয়া প্রস্তুত হইতে শৈথিল্য করিল। এদিকে ঠিক সূর্য্য অস্ত হইবার সময়ে বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ যুদ্ধ-যাত্রার অনুমতি প্রকাশ করিলেন এবং তদনুসারে প্রধানাংশ সেনাও সেই স্থান আক্রমণ করিতে প্রস্থান করিল।

তৈমুরের সেনাগণ দেখিতে পাইল, যে অসংখ্যেয় হিন্দু-স্থানীয় হস্তী সকল পৃষ্ঠের উপর বড় বড় হাওদা বাঁধা, এবং সেই

সকল হাওদায় অতি পরিপক্ক ধনুর্ধারী সকল, তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে এবং ভয়ঙ্কর বৃংহিতধ্বনি হইতেছে। তৈমুরের সেনারা আর কখনই হস্তী দেখেন নাই। সহসা এইরূপ রণসজ্জা দেখিয়া তাহাদের আত্মাপুরুষ এককালে শুষ্ক হইয়া উঠিল, এবং মনে মনে বিলক্ষণ প্রত্যয় করিল যে, এমত জন্তুর গাত্রে তীরও প্রবেশ করিতে এবং তলবারের আঘাত লাগিতে কদাচ পারিবে না। বিশেষতঃ উহাদিগকে এমত বলবান বোধ হইতেছে, যে উহাদের চলিবার সময়ে পৃথিবী পর্য্যন্ত কাঁপিবেক, তাহাতে গাছ সকল উপড়িয়া পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এবং রণস্থলে মানুষ ও ঘোড়াগুলা অতি উচ্চে শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে পারিবেক। এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়টিই তৈমুরের সেনাগণকে নিরাশ করিয়া ফেলিল। যে কয়েকজন বড় বড় সাহসিক সৈনিক পুরুষ ছিলেন, দেখিয়া সকলেরই উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পড়িল। তৈমুর তাহাদিগকে নির্ভয় করিবার জন্য আপনার দুই ঔরসপুত্র ও ঔগলেব নামক এক দত্তক পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুত্রেরা সেই আহ্বানে কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া পঞ্চাশজন মনোমত যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তৈমুরলঙ্গ তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং সেই কয়েকজন যোদ্ধামাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া সাহস পূর্ব্বক সেই সম্মুখীন হস্তীর উপর আক্রমণ করিলেন। ঔগলেব ঠিক সেই পশুর মস্তকে আঘাত করিতে মনস্থ করিলেন। রণহস্তী আহত না হইতেই অনবরত দন্তাঘাতে তাঁহার ঘোড়াটাকে বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া শুণ্ডের দ্বারা এককালে পায়ের নীচে নিক্ষিপ্ত করিল। তৈমুর একধার দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সেই হাতীর শুণ্ডে এক তলবারের আঘাত মারিলেন। তাহাতে সেই শুণ্ডও তৎক্ষণাৎ দুই খণ্ড হইয়া পতিত হইল। হাতীটা জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অতিশয় বৃংহিতধ্বনি পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করত অতিবাদ ক্ষিপ্ত ভাবে অপর

হস্তীদলের মধ্যে প্রবেশ করিল। চীৎকার আর গোলমালের আর ইয়ত্তা রহিল না। তৈমুরের যোদ্ধারা দেখিল যে, মহা-গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া আইল; এবং উপস্থিত সেনাদলকে আক্রমণ করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে তৈমুরের পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাসকল প্রকাণ্ড দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যত যত বাধা হইতে লাগিল সমুদায়ই খণ্ডন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, ধনুর্দ্ধর ও পদাতিক সকল এলোমেলো গোলমাল করিয়া পলাইতে লাগিল। সেই সময়ে হাজার হাজার লোক পড়িতে ও হাতীর পায়ে পিষিয়া মরিতে লাগিল। কত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিজয়ী তৈমুর স্বহস্তে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং অসংখ্যেয় মৃত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের মধ্যে সুষুপ্তিনিদ্রায় অভিভূত হইয়া সমস্ত রাত্রি অবসান করিলেন। ···

বাঙলা সাহিত্যে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আসন বিশিষ্ট। কিন্তু শিশু-সাহিত্যে তাঁর দান 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' নামে দুখানি বিজ্ঞানগ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। তাঁর প্রবন্ধাবলী ঠিক শিশু-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। তবে সেগুলির কতক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর চিন্তাশীল ছাত্র-ছাত্রীগণের পাঠযোগ্য হোতে পারে বটে। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' সেকালে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। গ্রন্থ দুখানির প্রকাশকাল ১৮৫৮-৫৯ খৃস্টাব্দ।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত 'জীবন-চরিতে'র বহুল প্রচার ছিল। সম্ভবত তদ্দৃষ্টে মথুরানাথ তর্করত্নও কয়েকজন বিখ্যাত বিদেশীর জীবনকথা সম্বলিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে একটি স্বদেশী চরিত্রও আছে, আকবর শাহের। গ্রন্থখানি অনুবাদ। গ্রন্থভূমিকায় তর্করত্ন মহাশয় লিখছেন :

জীবনবৃত্তান্ত পাঠে যেরূপ মহোপকার লাভ হয়, তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করা সহজ নহে। কোন কোন মহাত্মারা

অতিপ্রেতার্থ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যত্রূপ অপরিসীম পরিশ্রম ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এককালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ তত্তৎদেশের রীতিনীতি প্রকৃতি পরিজ্ঞান হয়। অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থ লাভ হয়, তাহাকে শিক্ষাকার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক সন্দেহ নাই, এই আশয়ে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু আপাততঃ কেবল ওয়াট, কূরিয়র, হাওয়ার্ড, মঙ্গোপার্ক, আকবর সাহ, বোনাপার্টি ও কলম্বস এই কএক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।...

কিন্তু তিনি অবিকল অনুবাদ করেন না, কারণ অবিকল অনুবাদে 'রীতি বৈলক্ষণ্য ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে'। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৫৯ খৃস্টাব্দ অর্থাৎ বিদ্যাসাগর রচিত জীবনচরিতের দশ বৎসর পর। ছয় বৎসরে প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায় বোঝা যায় গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হয় না। না হওয়ার কারণ সম্ভবত 'জীবনচরিত' ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'নীতিবোধ' এবং গ্রন্থের ভাষায় কিঞ্চিৎ রুক্ষতা ও জড়তা। তবুও গ্রন্থের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হোল :

জেমস ওয়াটের জীবনবৃত্তান্ত।

পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড, ফ্রানস প্রভৃতি নানা জনপদের লোকে বাষ্প-যন্ত্রদ্বারা জল উঠাইয়া অনেকানেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু বাষ্পের যে কি পর্য্যন্ত সামর্থ্য, তাহার অনেক অংশই যন্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ জ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হয় নাই। এই ভূমণ্ডলে বহু পণ্ডিতগণ বিবিধ প্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া মানবগণের যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহার বর্ণন বাহুল্য। বিশেষতঃ বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা মনুষ্যের যাদৃশ উপকার সম্ভব ও যত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তত

আর অন্য কোন যন্ত্রদ্বারা হয় না। বাষ্পদ্বারা অনায়াসেই ভূরি ভূরি অদ্ভুত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে ···

এই বৎসরেই (১৭ই আশ্বিন, ১২৬৬ সাল) প্রকাশিত হয় বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত রচিত সচিত্র 'প্রাণিবৃত্তান্ত'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বের হিন্দুকলেজ পাঠশালারই পরে নাম হয় বাঙ্গালা পাঠশালা। এই গ্রন্থেরই প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল পশ্বাবলী। তারপর দীর্ঘকাল আর কেউই প্রাণিবিজ্ঞান রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। অথচ শিশু-সাহিত্যে প্রাণিবিজ্ঞান অত্যাবশ্যক বিষয়। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে জীবজন্তুর গল্পে অত্যন্ত আকৃষ্ট হোতে দেখা যায়। প্রাণিবৃত্তান্তের ভূমিকায় লেখক লিখছেন :

প্রাণিবৃত্তান্ত প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিবেত্তা কৌণ্ট, ডি, বুফন এবং মেকেঞ্জি, হোর্ট, গোলডস্মিথ প্রভৃতির নেচরেল হিষ্ট্রী নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল। প্যাটার্সন এবং মিলনি, এডোয়ার্ডস্ প্রণীত গ্রন্থ হইতেও দুই একটি বিষয় নীত হইয়াছে। সুকুমারবুদ্ধি বালকদিগের পক্ষে সহজ হইবে এ নিমিত্ত অতি সরল ভাষায় লিখিতে অনেক প্রয়াস পাইয়াছি। ···

আলোচ্য বিষয় বিবিধ বিদেশী লেখকের রচনা থেকে সঙ্কলিত হোলেও গ্রন্থখানি অনুবাদ নয়; গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। কিন্তু বন্যপশু সম্বন্ধে সকল তথ্যই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নয়, বিশেষত তাদের স্বভাব বিষয়ে। এই ত্রুটি প্রাণী-বিবরণ সম্বলিত অনেক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের প্রথমেই সিংহের বিবরণ। তার প্রথম অংশ এই :

পশুদিগের বিবরণ।

সকল পশুর মধ্যে সিংহ অতিশয় বলবান ও পরাক্রান্ত, এজন্য লোকে ইহাকে পশুরাজ কহে। ইহার শরীর পিঙ্গলবর্ণ

চিক্কণ লোমে আবৃত, ঘাড়ে লম্বা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া লোম আছে, তাহাকে কেশর কহে। সিংহের শরীর উচ্চে তিনহাত ; চক্ষু প্রায় গোল, বৃহৎ এবং হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল ; কর্ণ বিড়ালের মত গোল ; দন্ত ও নখর অতিশয় ধারাল। আসিয়া ও আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহারা জন্মে। যে সকল নিবিড় বনে কিম্বা পর্ব্বতগুহায় মনুষ্যের গতায়াত নাই সিংহ তথায় বাস করে ; ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মস্থান ত্যাগ করে না।

সিংহ মাংশাসী পশু, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত না হইলে শিকার করিতে যায় না। মহিষ, গো, করভ, বন্যবরাহ প্রভৃতি পশুরা তাহার দর্শনমাত্র প্রাণভয়ে পলায়ন করে। এজন্য সিংহ কোন নদী অথবা পথের পার্শ্বে বনমধ্যে লুকাইয়া থাকে, কোন পশুকে নিকটস্থ দেখিলে তাহার উপর পড়িয়া দন্ত ও নখর প্রহারে তাহার শরীর খণ্ড করিয়া ফেলে। যদি একেবারে না পারে, উপর্য্যুপরি দুই তিনবার আক্রমণ করে, কিন্তু দুই বা তিনবার না পারিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। ইহারা সদ্য মাংস পাইলে প্রায় বাসি মাংস খায় না। ···

গ্রন্থখানির প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে একখানি করে কাঠখোদাই চিত্র আছে। খোদাইকার 'Kally and Nemy'। এঁদের নাম পূর্বে বা পরে আর কোনও চিত্রে দেখা যায় না। এঁরা কোন দেশের লোক তাও নাম থেকে বোঝা দুষ্কর। গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হয়। কারণ দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রাণিবৃত্তান্ত' প্রথম ভাগের চারমাস পরে প্রকাশিত হয় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচিত 'জীবরহস্য' প্রথম ভাগ। গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯, স্মল পাইকা হরফে ছাপা। গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মূল বিষয়টি রচনা করেন পাদ্রি জে. লঙ। পাদ্রি লঙের শ্রদ্ধেয় নাম, তাঁর মহৎ কর্মাবলী দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে আমাদের দেশে অবিস্মরণীয়। তিনি যে আমাদের দেশের শিশু-সাহিত্যও তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের একটি মূল্যবান সম্পদে সমৃদ্ধ করেন, একথা

স্বল্প লোকেরই জানা আছে, মনে হয়। অনুবাদক মহাশয় গ্রন্থখানির যে বিস্ময়কর ইতিহাস ভূমিকায় ব্যক্ত করেছেন, তা এই :

অনুবাদক সমাজের মহোৎসাহী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রেভরেণ্ড জে. লং সাহেবের উৎসাহ-সহকারে জীবরহস্যের প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের দেশ-হিতৈষী বন্ধু-মহোদয় রেভরেণ্ড মহাশয় কহিয়াছিলেন, "আমি কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেকানেক গ্রামের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে প্রাকৃতিক সামান্য জীব এবং সামান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থসকলের বিষয় অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। পল্লিগ্রামের অশিক্ষিত কৃষক এবং মূর্খ ধীবর প্রভৃতি নীচ জাতিরা এ বিষয়ে যেরূপ সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর প্রদান করে ইহারা সেরূপ পারেন না। ইহাতে বোধহয়, এদেশে সামান্যোপজীবী মূর্খ লোকেরা কেবল দর্শনাদি বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যবহার করিয়া নিত্যদৃষ্ট প্রাকৃতিক সামান্য পদার্থ-বিষয়ের যেরূপ জ্ঞান লাভ করে অহর্নিশি বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ সেরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অতএব পাঠশালার বালক-বালিকাগণের ব্যবহারোপযোগী উদ্ভিজ্জ ও জীবরহস্য পুস্তক করা···(খণ্ডিত) বিশেষ···প্রয়োজন হইয়াছে।"

রেভরেণ্ড মহাশয়ের এই প্রস্তাবে আর আর অধ্যক্ষগণ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। বহুতর ইংরাজী পুস্তক হইতে উহা সংকলন করণের ভার বিজ্ঞবর রেভরেণ্ড মহাশয় আপনি গ্রহণ করিলেন ; আর সঙ্কলিত বিষয়গুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করণের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল। তদনুসারে বহুতর যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা নানা ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া, শ্রীযুত রেভরেণ্ড মহাশয় উদ্ভিজ্জ ও জীবরহস্যের প্রস্তাবগুলীন সঙ্কলন করিয়া আমিও যথাসামর্থ্য চেষ্টাদ্বারা জীবরহস্যের কএকটি প্রস্তাব অনুবাদ করিয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। যদি বিদ্যালয়স্থ বালক-বালিকাদিগের এই খণ্ড গ্রহণে আগ্রহ দেখিতে পাই, যদি

বিদ্যানুরাগী মহানুভব গৃহস্থ মহাশয়গণ, এই পুস্তক পাঠে বালক-বালিকাদিগের উপকার দর্শিবে এমন বিবেচনা করিয়া ইহার এক একখানি পুস্তক ক্রয় করেন, তবে অচিরে আর ২ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া জীবরহস্যের দ্বিতীয় খণ্ড এবং উদ্ভিজ্জরহস্যের পুস্তক প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যেই শেষ হয়। গ্রন্থখানিতে জীব সম্বন্ধে বাইশটি প্রস্তাব আছে। এই খানিকেই শিশু-সাহিত্যে প্রথম দ্রুতপাঠ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ বলা যেতে পারে। কারণ, এখানির পূর্বে যে দু'-একখানি বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সে সবই ছিল বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য। এখানি ছিল ইচ্ছাধীন। গ্রন্থখানি গ্রহণের জন্য 'বালক-বালিকাগণের' ও 'গৃহস্থ মহাশয়গণের' নিকট আবেদন করা হয়েছে। গ্রন্থখানির প্রথমেই সর্পের বিবরণ। তার কিয়দংশ পাঠে বোঝা যাবে পাদ্রি লঙ গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু সংগ্রহে ও রচনায় কত যত্ন ও শ্রম স্বীকার করেন।

কেটসবি সাহেব লিখিয়াছেন, আমেরিকা দেশীয় কালসর্প সকল তন্নিবাসী লোকদিগের বড়ই উপকারক হয়। তাহারা গৃহস্থিত বড় বড় ইন্দুর এবং ক্ষুদ্র ২ মূষিক প্রভৃতি নষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদিগের গতিশক্তি এমনই প্রবল যে, কোনমতেই ঐ অনিষ্টকারী জন্তুরা পলাইয়া বাঁচিতে পারে না। কি গোলা, কি মরাই, কি গর্ত্ত, কি ছাদ, মূষিকেরা যেখানে যায়, উহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাহাদের প্রাণবধ করে। আমেরিকা-খণ্ডের কৃষকমাত্রেই কালসর্পকে বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন পায়, এবং যাহাতে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া পালবৃদ্ধি পায়, এমত চেষ্টা করে। কখন ২ এই জাতীয় সর্প সকল উক্তখণ্ডের কৃষক-স্ত্রীদিগকে বড়ই বিরক্ত করে; মাখন খাইবার জন্য তাহারা দুগ্ধের বেসালি ভাঙ্গিয়া একেবারে খণ্ড ২ করিয়া ফেলে। কুক্কুটীদিগের বাসা হইতে ডিম্ব অপহরণ করিয়া আনে। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুক্কুটীগণ নিজ ২ নীড়ে উপবেশন করিয়া থাকিলেও

কালসর্পেরা লাঙ্গুল দ্বারা তাহাদিগের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করে। বালকদিগের সঙ্গে ইহারা এক পাত্রে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, অধিক দুগ্ধ পান করিলে কখন ২ বালকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের মস্তকে চামচের আঘাত করে তথাপি তাহারা তাহাদিগের কিছুমাত্র হানি করে না।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী প্রসাদপুরে গ্রামে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে .এক ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রী পুত্র কন্যাদি কিছুই ছিল না, এজন্য তিনি অন্যান্য জন্তু পালন করিয়া প্রাকৃতিক অপত্য-স্নেহ তদুপরি স্থাপন করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার গৃহমধ্যে একটি গোকুরা সর্প ছিল, ঐ সর্প প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গাভী দোহন সময়ে বাহির হইত, এবং যতক্ষণ ব্রাহ্মণ তাহাকে একটি বাটি করিয়া দুগ্ধ পান করিতে না দিতেন, ততক্ষণ ঐ সর্প পুনর্ব্বার গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিত না। যদি কোন কার্য্যান্তরে গৌরীকান্ত অন্য কোন স্থানে যাইতেন, তবে তৎপালিত গাভী, কপোত, সর্প এবং অন্যান্য জন্তুগণের অসুখের আর পরিসীমা থাকিত না। সর্পটি তাঁহার দ্বারের নিকট পড়িয়া থাকিত, কোন ব্যক্তি সেই ভয়ে তাঁহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার পালিত জন্তুগণ বড়ই আহ্লাদিত হইত, সর্পটি লাঙ্গুলদ্বারা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিত। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে কোন কোন দিন ঐ সর্প বাহির হইয়া দাবায় পড়িয়া থাকিত, ব্রাহ্মণ ধমক দিয়া বিষধরকে তিরস্কার করিলেই সে পুনরায় গর্ত্তে প্রবেশ করিত। কোন কোন দিন সর্পটা তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, ব্রাহ্মণ ঘুমের ঘোরে কতবার উহাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, তথাপি ওটা একবারও তাঁহাকে দংশন করে নাই। গৌরীকান্তের পরলোক হইলে সর্প দুই তিন দিন রাত্রিকালে বাহির হইয়া কেবল ফোঁশ ২ শব্দ করিয়াছিল, তৎপরে সে যে কোথায় গেল, কেহ তাহা নিশ্চয় করিতে পারে না।

পাদ্রি লঙের মূল রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। আর মধুসূদনও লঙের রচনার অনুবাদ দ্বারা উদ্ভিজ্জ পুস্তক প্রকাশ করেন কি না তা জানা যায় না। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামের তালিকায়ও মধুসূদনের রচিত অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে 'উদ্ভিজ্জ' বা ঐ ধরনের কোনও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুটি কিশোর 'বিদ্যাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করেন (এই গ্রন্থের 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য)। তাঁদের একজনের নাম প্রিয়মাধব বসু। প্রিয়মাধব বসুর বাস ছিল কলিকাতার সিমলে (সিমুলিয়া) অঞ্চলে। তিনি 'জ্ঞান রত্নমালা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৫৮ খৃস্টাব্দ। বসুমহাশয়ের বয়স তখন আঠারো-উনিশ বৎসর মাত্র। তিনি যে প্রগতিপন্থী ছিলেন আলোচ্য গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু পাঠেই তা জানা যায়। গ্রন্থে তিনি সমাজের বিবিধ দোষের যেমন কৌলীন্যপ্রথা, সুরাপান, বালবিধবার বিড়ম্বনাময় জীবনের বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থখানি সেকালের শিশু-সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু গ্রন্থখানির প্রথম প্রবন্ধ 'বাল্যকাল'। প্রবন্ধে বালকগণকে সম্বোধন করে লিখিত হয়েছে :

> এই বাল্যকাল বিদ্যোপার্জ্জনের নির্দ্দিষ্ট সময়। এইকালে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, যৌবনকালটি সুখস্বচ্ছন্দে বিগত করা কঠিন। অতএব হে বালকগণ! তোমরা এইকালে বিদ্যার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ কর। দেখ, যে ব্যক্তি বিদ্যাধনে বঞ্চিত হয়, তাহার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। জ্ঞানীব্যক্তিরা তাহার সহবাস হইতে পলায়ন করেন।...

গ্রন্থখানির অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা 'স্বাধীনতা'। মনে রাখা দরকার, গ্রন্থখানির প্রকাশ কাল ১৮৫৮ খৃস্টাব্দ—সিপাহীবিদ্রোহের এক বৎসর পর। গ্রন্থখানিকে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যে আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ প্রথম প্রবন্ধই বালকগণের উদ্দেশ্যে রচিত। সিপাহী-

বিদ্রোহের অগ্নিতে তরুণ গ্রন্থকারেরও অন্তর যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, 'স্বাধীনতা' রচনাটি তার সাক্ষ্য। সে সময়ে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশেও নিতান্ত সাহসের দরকার ছিল। লেখক অতি সংযত ভাষায় যা লিখেছেন তার কিঞ্চিৎ পাঠেই তাঁর অন্তরের কথা বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন :

> ···স্বাধীনতা যে স্থানে বিদ্যমান নাই তথায় জ্ঞানরূপ শক্তি ভ্রমেও অবস্থান করে না। স্বাধীনতার সময়েই মনুষ্যদিগের জ্ঞাননেত্র রুন্মিলন এবং বিদ্যার অনুশীলন বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে আমাদিগের এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা উচিত, যেহেতুক এ স্থানেও স্বাধীনতা এককালীন বিদ্যমান ছিল। ···যে সময়ে এই দেশ স্বাধীনাবস্থায় ছিল, সেই সময়ে জ্ঞানী মহাত্মারা স্বাধীনতার প্রভাবে শিল্প বিদ্যার সাহিত্য বিদ্যার এবং দর্শন শাস্ত্রের যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাতে অদ্যাবধিও তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু হায়, এখনে সেই হিন্দুরা কি দুরবস্থাতেই পতিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সে একতাও নাই এবং সে প্রকার জ্ঞানালোচনাও নাই। অতএব হে দেশস্থ বন্ধুগণ, আপনারা আর কত দিবস অধীনতারূপ কালনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবেন, গাত্রোত্থান করুন। সকলে একবাক্য হউন, তাহা হইলে জ্ঞানের অনুশীলনী বৃদ্ধি পাইয়া স্বাধীনতা রূপ সুখ লাভে সক্ষম হইতে পারিবেন।···

এই বিজ্ঞান-গ্রন্থেরই পর বৎসর প্রকাশিত হয় সিকান্দার সাহের দিগ্বিজয়। তার কিয়দংশ এই :

> সিকন্দর সাহ মনে করিয়াছিলেন, অগ্রে লাম্পসাকস্ শহর ধ্বংস করিয়া তথাকার বিদ্রোহিগণের যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান করিবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি সেই শহরের অভিমুখে গমন করিতেছেন, কিছুদূর থাকিতে সেই শহরবাসি আলেকসিমিনিস্ নামক একজন প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক

পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঐ ব্যক্তি সিকন্দর সাহের পিতা ফিলিপের প্রাচীন মিত্র। তদভিন্ন সিকন্দর সাহ যখন শিশু ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট তাঁহার বিদ্যাভ্যাস হয়। সিকন্দর সাহ পাছে সেই পণ্ডিত সেই দেশ রক্ষার জন্য কোন অনুরোধ করেন, এই আশঙ্কায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কদাচ কাহারো অনুরোধের কথা শুনিব না। পরে সেই প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় করিবার জন্য একজন পুরোহিতকে ডাকাইয়া দেবতার নিকট এই শপথ করিলেন যে, 'ঐ ব্যক্তি যে প্রার্থনা করিতে উদ্যত আছে, তাহা কদাচ গ্রাহ্য করিব না।' আলেকসিমিনিস্ সিকন্দর সাহের নিকট কহিলেন, 'আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যে তুমি এই লাম্পসাকস্ শহর এখনি ধ্বংস করিয়া ফেল, এবং ইহার প্রজাবর্গকে যাবজ্জীবনের মতো দাসত্ব শৃঙ্খলায় বদ্ধ রাখ।' সুচতুর আলেকসিমিনিসের এইরূপ চাতুরীতে সে দেশ রক্ষা পাইল।

গ্রন্থশেষে লেখক যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য এজন্য উদ্ধৃত হোল :

'ধন্য জগদীশ্বর, তোমার কৃপাতে এক্ষণে পূর্ব্বের মতো যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমার কৃপাতেই সেই ভয়ানক রক্তারক্তি নিবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যাঁহারা কেবল যুদ্ধ ও দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেন, ইতিহাস গ্রন্থে তাঁহাদিগকেই সর্ব্বপ্রধান ও মহামহিম বলিয়া বর্ণনা করা হইত। এখন তোমার কৃপাতে সেই সকল স্থানে যাঁহারা কেবল মনুষ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁহারাই নিবেশিত ও বর্ণিত হইবেন।

দেখা যাচ্ছে, অদ্ভুত ইতিহাসের ভাষা পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থগুলির ভাষার অপেক্ষা অনেক সাবলীল এবং শিশুপাঠকগণের উপযোগী।

অতঃপর ১৮৬১ খৃস্টাব্দে তারকব্রহ্ম গুপ্ত 'প্রাণিবিদ্যা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাটি উৎকৃষ্ট না হোলেও

মৌলিক। কিন্তু শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যে প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মৌলিক রচনায় অগ্রপথিক ছিলেন সাতকড়ি দত্ত।

গ্রন্থভূমিকায় গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন :

> …এ পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়েই প্রায় রীতিমত প্রাণিবিবরণ শিক্ষা দিতে দেখা যায় না, এই নিমিত্ত আমি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রাণিবিদ্যা সঙ্কলিত করিয়া মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে কেবল মেরুদণ্ডী প্রাণিদিগের বিবরণ লিখিত হইল। …যদি এই পুস্তক বঙ্গবিদ্যানুরাগী মহাশয়গণের মনোনীত হয় তবে দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ মেরুদণ্ড বিহীনদিগের বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইব। …

গ্রন্থখানির দ্বিতীয় ভাগ সম্ভবত প্রকাশিত হয় না। তার কারণ কিছু পরেই জানা যাবে। আর এই গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রেরণা ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত সাতকড়ি দত্তের প্রাণিতত্ত্ব ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'জীবরহস্য' থেকেই আসে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। কারণ মধুসূদন জীবরহস্যের দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় লিখছেন :

> গ্রন্থখানি (প্রথম ভাগ) প্রকাশ করিয়া মনে ২ আমাদের এই আশংসা (?) হইয়াছিল যে, লোকে উহার বিশেষ ফলোপধায়ক-গুণ বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং গ্রন্থ ও গ্রন্থ-কর্ত্তাদিগের প্রতি অননুরাগ প্রকাশ করিবে। কিন্তু সে আশংসা আমাদিগের একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; কি বালক কি বালিকা কি যুবক কি যুবতী সকলেই ঐ পুস্তকপাঠে ও পুস্তক-বৃত্তান্ত শ্রবণে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে। সুশীলার উপাখ্যান ব্যতিরেক অনুবাদক সমাজের প্রকটিত কোন পুস্তক এতদ্রূপ গৃহীত হয় নাই। …

আমাদের বাঙালীর জাতীয় স্বভাবে অনুকরণস্পৃহা দেখা যায়। গুপ্ত মহাশয়ের ক্ষেত্রেও সম্ভবত তার ব্যতিক্রম ঘটে নি, হয়তো

জীবরহস্যের চেয়েও উৎকৃষ্টতর গ্রন্থরচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। তার ফলে তিনি যা লিখেছেন তার কিঞ্চিৎ :

পক্ষিজাতি।

পৃথিবীতে যতপ্রকার মেরুদণ্ডী আছে তন্মধ্যে পক্ষিজাতি সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর, ইহাদিগের শরীরে নানা প্রকার বর্ণ থাকাতে যেমত দেখিতে সুশ্রী হয় তেমনি ইহাদের মধ্যে অনেকেরই স্বর সুমিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের সকল অঙ্গই আমাদিগের ন্যায়, কেবল আমাদিগের করক্রিয়া ইহারা পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, আর আমাদিগের শরীর লোমশ হয়, উহাদিগের তৎপরিবর্ত্তে পক্ষ হইয়া থাকে। পক্ষীদিগের পঞ্জরাস্থি সকল সম-সংখ্যক হয় না। অর্থাৎ চড়ুই পাখির পঞ্জরাস্থি ৯ খান কিন্তু সোয়ানের (?) ২০ খান করিয়া হয় কিন্তু সচরাচর ১২ হইতে ১৫ খান পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারা যে কেবল উহাদিগের শরীর রক্ষা হয় এমত নহে উহাতে উহাদিগের সৌন্দর্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে। পক্ষিজাতির পাদের দৈর্ঘ্যানুসারে উহাদিগের গ্রীবা ও চঞ্চু দীর্ঘ হয় নতুবা উহাদিগের আহারের ও উড়িবার অনেক ব্যাঘাত হইতে পারিত। পক্ষিদিগের গলদেশের অস্থি গ্রন্থি সকল শৃঙ্খলাবৎ হইবাতে উহারা সকল দিকেই গ্রীবা আবর্ত্তন করিয়া আপনাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় কণ্ডূয়ন ক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে ···

এই বৎসরই প্রকাশিত হয় পাদ্রি লঙ রচিত ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'জীবরহস্য' দ্বিতীয় ভাগ। এই গ্রন্থখানিও মূলের রচয়িতা ও অনুবাদকের জনপ্রিয়তার দরুন সাধারণের কাছে আদৃত হয়। উপরন্তু অনুবাদও হয় স্বচ্ছ। সে কারণ সুখপাঠ্য। এই সকল কারণেই গুপ্ত মহাশয়ের 'প্রাণিবিদ্যা'র বহুল প্রচার হয় না। তবে প্রাণিবিদ্যা ও জীবরহস্য উভয় গ্রন্থেই জীবদেহে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ, কলাকৌশল ও কার্য্যাবলীর কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, উনবিংশ শতাব্দীতে নীতিশিক্ষা প্রদানের দিকে প্রয়াস ছিল যথেষ্ট এবং গ্রন্থ দুখানির রচয়িতাগণের কেউই বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। আর, পাদ্রি লঙ ছিলেন ধর্মযাজক। উভয় গ্রন্থেই জীবের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প আছে, কিন্তু মধুসূদনের গল্পগুলিতে বেশ নৈপুণ্য দেখা যায়। তাঁর দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে পক্ষীবিষয়ক রচনা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হোল :

> …এতদ্দেশীয় বাবুই পক্ষীর সুচারু নীড় সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাদিগের এক তালা, দেড় তালা, দোতালা এবং কদাপি তিন তালা বাসা যে কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত রচিত হয় তাহাও অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে রজনীযোগে বাবুই পক্ষীরা যথার্থ বাবুয়ানার নিয়মে, আপন আপন গৃহ দীপালোকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে; এবং বিলাতী কাচের দেয়ালগিরির অভাবে বাসার দেয়ালে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে জোনাকি পোকা সংলগ্ন করত স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধ করে। গৃহপালিত বাবুই পক্ষীরা আপন ২ প্রতিপালক দিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের আজ্ঞানুসারে বারুদ পুরিয়া পিস্তল ছুড়িতে পারে। শ্রুতি আছে যে পশ্চিমাঞ্চলে কোন ২ সুচতুর নায়কেরা এই পক্ষী প্রেরণ করত দূরস্থ নায়িকার মস্তক হইতে টীকাভরণ অপহরণ করিয়া থাকে।
>
> উত্তর আমেরিকায় এই পক্ষীর নাম বালটিমোর, গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে ইহারা নগরে আগমন করত উচ্চ বৃক্ষাগ্রে আপন আপন মনোহর নীড় নির্ম্মাণ করে। এতৎ সময়ে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অতি সাবধানে রেশম ও সূত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক করেন, কেননা অবকাশ পাইলেই এই পক্ষীরা ঐ সূত্রাদি চুরি করিয়া আপন ২ আবাস নির্ম্মণার্থে লইয়া যায়। …

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বালক-বালিকাদের বিজ্ঞানমুখী করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে বিজ্ঞানের রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার শাখায় জ্ঞানদানের চেষ্টা সেরূপ হয় নি। এই দুটি শাখায় পরীক্ষা-

নিরীক্ষার প্রয়োজন। আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের অভাবই সম্ভবত এমন হবার কারণ। অতঃপর প্রায় চল্লিশ বৎসর প্রাণিবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের অপর শাখার জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে বাংলার শিশু-সাহিত্যে কোনও গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

কলকাতা ও শ্রীরামপুর, প্রধানত এই দুটি শহরেই তখন পর্যন্ত শিশু-সাহিত্য রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বালবোধ'। পুস্তকখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য ছিল কি না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সেকালের অবস্থা বিবেচনায় অনুমান, গ্রন্থখানি বিদ্যালয়-পাঠ্যই ছিল। কারণ, আমরা যতগুলি শিশু ও কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ দেখেছি সেগুলির সমস্তই বিদ্যালয়-পাঠ্য। একালে নানারকমের লোকপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থের প্রচলন দেখা যায়। সেগুলি শিশু ও কিশোরবয়স্ক পাঠকগণ অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য পাঠ করে। সেকালের অবস্থা এমন ছিল না। যে দু'-একখানি সাময়িক পত্রিকা থাকতো তাই পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত ও চিত্তবিনোদন করতো। মনে হয়, শিশু-সাহিত্যে লোকপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা শুরু হয় পাদ্রি লঙ কৃত ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'জীবরহস্য' থেকেই।

প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত 'বালবোধে'র রচনা কতকটা একালের লোকপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থের মতো। তবে তিনি মনুষ্যের দেহযন্ত্রে পরমেশ্বরের কলাকৌশল দেখেছেন, 'জীবরহস্যে' সর্পের বিবরণেও আদি মানবদ্বয়ের সর্পের কারসাজিতে পতনের কথাও কিঞ্চিৎ আছে। 'বালবোধ' মনুষ্য, বায়ু, অগ্নি, জল, শিশির, জ্যোতিষ্ক ও উদ্ভিদ, এই সাতটি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থের ভাষায় বেশ সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা। 'শিশিরে'র কিঞ্চিৎ পরীক্ষায় তা জানা যাবে :

শিশির

অনেকের এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, শিশিরও এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃষ্টি, মেঘ হইতে পতন হইয়া থাকে। বাস্তবিক উহা

বৃষ্টি নহে এবং মেঘ হইতেও পতন হয় না। দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী হইতে বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া নিকটস্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে, আর পৃথিবীস্থ বস্তু সকল সূর্য্যের তেজ গ্রহণ করিয়া উষ্ণ হয়। সমস্ত রাত্রি ঐ সকল বস্তু তেজ পরিত্যাগ করিয়া শীতল হয়। তখন ঐ বস্তু সকলের চারিদিগের বায়ু শীতল হয় ও ঐ বায়ুস্থ বাষ্প ঘন হইয়া শিশির রূপে পড়িতে থাকে। ···

লক্ষ্য করবার বিষয় যে পাঁচ বৎসরে পাঁচ-ছয়খানি শিশুপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যা সেকালের পক্ষে আশ্চর্যের।

বিদ্যাসাগর-যুগে ক্রমেই দু'-একটি করে শিশুপাঠ্য কবিতা-গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হোতে থাকে, কিন্তু প্রথম দিকে সেগুলির রচনা উৎকৃষ্ট হয় না এবং বিদ্যালয়ের বাইরেও প্রচারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। গদ্যের মতো পদ্য-গ্রন্থও বিদ্যালয়-পাঠ্য না করলে সেকালে তার ক্রেতা পাওয়া দুর্লভ ছিল। সে সকল কবিতায় নীতিশিক্ষার প্রচেষ্টা দেখা যায় অল্পই এবং ছন্দোবৈচিত্র্যও একরূপ ছিলই না। অধিকাংশেরই অবলম্বন ছিল পয়ার। এইরূপ একখানি গ্রন্থ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় রচিত ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'লঘুপাঠ পদ্য'। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি এই :

সন্ধ্যাকাল।

ধরাতল সুশীতল রবি অস্ত যায়।
শীতল বাতাস বয় শরীর জুড়ায়॥

সন্ধ্যা হলো পাখী সব উড়িয়া চলিছে।
কলরবে নিজ নিজ কুলায় পশিছে॥

পান্থ সব পান্থশালা করে অন্বেষণ।
গোষ্ঠ হতে গাভীদল ধায় নিকেতন॥

মল্লিকা মালতী যূথি বিবিধ প্রকার।
ফুটিতেছে নানা ফুল বিচিত্র আকার॥

আহা! নানা রঙ্গে শোভে দেখিতে সুন্দর।
গন্ধবহ গন্ধ বয় অতি মনোহর॥

অলিকুল তেজি ফুল উড়িয়া চলিছে।
দিবা গেল রাত্র এল চাকেতে বসিছে॥

খেলা তেজ শিশুগণ যাও মার কাছে।
ক্রমে অন্ধকার ঘোর ঘেরিবেক পাছে॥

যে পাঠ শুনিলে অদ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে।
অভ্যাস কর গে তাই স্মরণ করিয়ে॥

বিদ্যায় করিলে হেলা জীবন বিফল।
ধনমান এ সংসারে বিদ্যাই সকল॥

কবিতাটি পাঠে মনে হয়, তর্কালঙ্কারের প্রভাত বর্ণনায় এর জন্ম এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে' নীতি বাক্যে এর শিক্ষা।

এই গ্রন্থের এক বৎসর পূর্বে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের বালকপাঠ্য কবিতাপুস্তক 'কবিতা কৌমুদী' ১ম ভাগ। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পত্রিকা সোমপ্রকাশ গ্রন্থসম্বন্ধে মন্তব্য করেন 'ইহাতে কতকগুলি মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর নীতিপূর্ণ পদ্য আছে। ইহা বালকদিগের অনুপযোগী হয় নাই।' অতঃপর কবিতা কৌমুদীর ২য় ভাগ ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে এবং ৩য় ভাগ ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মিত্র মহাশয় ঢাকাবাসী ছিলেন।

ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থান বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম কি না এই প্রশ্নটি কয়েক বৎসর যাবৎ, বিশেষত বর্তমানে, অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে, ভারতে শিক্ষিত সাধারণের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। বর্তমানের ঐতিহাসিকগণও প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছতে পারেন নি। সকলে ঘটনাটিকে জাতীয় অভ্যুত্থান বলে স্বীকারও করেন না। তাঁদের মতের সমর্থন পাওয়া যায়, সিপাহী বিদ্রোহের দশ বৎসর পরে, ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'চরিতমঞ্জরী' নামে একখানি গ্রন্থে। গ্রন্থখানির রচয়িতা ছিলেন, কালীপ্রসন্ন রায়।

গ্রন্থখানির নামপৃষ্ঠায় লিখিত আছে—'ভারতবর্ষের কতিপয় প্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনরলের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহাতে মিউটিনির বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।' কিন্তু গ্রন্থখানি জীবন-চরিতও নয়, ইতিহাসও নয়, উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণে একখানি বিশিষ্ট সাহিত্য পুস্তক।

গ্রন্থখানি সম্বন্ধে 'বিজ্ঞাপনে'র একাংশে গ্রন্থকার নিজ বক্তব্য বলছেন :

> ···আমি এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সকলের উপযোগী করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি এবং যাঁহারা ইংরাজী জানেন না অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইংরেজী পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি একত্র সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করা যাঁহাদের পক্ষে সুসাধ্য নহে তাঁহারাও সহজে বিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জানিতে পারেন, ইহাও আমার অভিলাষ। এক্ষণে চরিতমঞ্জরী সাধারণে পরিগৃহীত হইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব।

গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় গ্রন্থখানি তিনি সকল বয়সের পাঠকগণের জন্য রচনা করেন। তবে অপরিণতমনা বালক-বালিকাগণের জন্য বিদ্যালয়-পাঠ্য এবং বয়স্কগণের জন্য স্বেচ্ছাপাঠ্য গ্রন্থ যাতে হয় সে ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের যে ঘটনাগুলি গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি পাঠে স্বভাবতই মনে হয়, সিপাহীরা ইংরেজ সরকারের দু'-একটি কাজ ভুল বুঝে এবং সন্দেহবশে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় এবং ইংরেজ নরনারীর প্রতি চরম নৃশংস ব্যবহার করে। ইংরেজ সরকারও যে বিদ্রোহদমনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সে সকল ঘটনার একটিরও কথা কিন্তু গ্রন্থে নেই। এতেই মনে হয়, সত্যকে ইচ্ছা করেই গোপন করা হয়েছে ; আর এ কাজে বোধ হয় কোনও পক্ষের উৎসাহ ও সমর্থন ছিল। যা প্রকৃত নয় বা যার অর্ধেক সত্য বালক-বালিকাগণকে তা বিশ্বাস করাবার, শিক্ষা দেবার চেষ্টা যে কোনও সরকারের বা কারও

করা নিন্দার্হ। যা হোক, বিষয়টি আমাদের আলোচ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। তখনকার দিনে বালক-বালিকাগণকে এই গ্রন্থে পরিকল্পনা মতো মিথ্যা শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা হয়, এই কথা বলবার উদ্দেশ্যেই বিষয়টির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হোল।'

সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ থেকেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হোল। তা পাঠে বোঝা যাবে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে শিশু-সাহিত্যের ভাষা কতখানি সাবলীল ও সহজ হয়ে আসে। গ্রন্থখানি অনুবাদ নয়। লর্ড ক্যানিং-এর চরিত কথার একাংশ এই :

> …২৯শে মার্চ তিপান্ন সংখ্যক রেজিমেণ্টের পঞ্চাশ জন গোরা কলিকাতা হইতে চাণকে প্রেরিত হয়। ইহাতে চাণকের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাইরা আরও ভীত হইল। উহাদের মধ্যে মোগল পাঁড়ে নামক এক ব্যক্তি ঐ দিবস ভাঙ খাইয়া উন্মত্ত হইয়াছিল। সে ইউরোপীয় সেনাগণের উপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া স্থির করিল, আমরা যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা এক্ষণে উপস্থিত। এত দিনের পর আমার জাতি গেল। গোরারা আমাদিগকে খ্রীষ্টান করিতে আসিয়াছে। মোগল পাঁড়ে এইরূপ স্থির করিয়া সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া কহিল, যদি তোমরা টোটা কাটিয়া ধর্ম্মনাশ করিতে না চাও তবে সত্বর আমার সঙ্গে আইস।…

গ্রন্থের প্রারম্ভে এই আছে—'যে মহানুভব ভারতবর্ষে বৃটীশ সাম্রাজ্যের মূল পত্তন করেন, তাঁহার নাম রবার্ট ক্লাইব।' এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, গ্রন্থখানির কোনও কোনও অংশ 'অবোধবন্ধু'র লেখক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ। বিজ্ঞপ্তি থেকে একথা জানা যায়।

এই গ্রন্থের এক বৎসর পরেই ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে কালীময় ঘটক সঙ্কলিত 'চরিতার্থক' নামে একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপনে পরবর্তী কয়েক খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পূর্বে শিশু-সাহিত্য রচয়িতাগণের মধ্যে বিশিষ্ট বিদেশী ব্যক্তিগণের চরিতকথা রচনার আগ্রহ দেখা যায়। তবে

এই সকল চরিত্রের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। ঘটক মহাশয় কিন্তু সে রীতি পরিত্যাগ করে দেশবরেণ্য প্রধান ব্যক্তিগণের চরিতকথা রচনা করেন। তাঁকে এই কাজে নিয়োজিত করেন স্বদেশ-প্রেমিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পরে, আরও কয়েকজন ঘটক মহাশয়ের পথ অনুসরণ করেছিলেন। বালক-বালিকারা নিকটের আদর্শই গ্রহণ করে। এর দ্বারা তাদের অন্তরে স্বদেশপ্রীতিও বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থকার ওজস্বিনী ভাষায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে চমৎকার চরিত্র-চিত্র লিখেছেন, তার কিয়দংশ এই :

পাঠকগণ, হরিশবাবু কিভাবে আপন গৃহে অবস্থিতি করিতেন, আমি তোমাদিগকে তাহার এক চিত্রপ্রদান করিলাম। ঐ দেখ! অত্যাচারপীড়িত প্রজাগণকে বিচারালয়ে যাইবার জন্য দরখাস্ত লিখিয়া দিতেছেন, প্রবল লোকদিগের নিকট হইতে সাহায্য দেওয়াইবার উপায় করিতেছেন, এবং উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সদ্বিচার লাভে সমর্থ করিতেছেন। আর ঐ দেখ! রোরুদ্যমান রাইয়তগণে তাঁহার বাড়ী কোলাহলময় করিয়াছে; তিনি অবাক হইয়া তাহাদের দুঃখকাহিনী শুনিতেছেন, তাঁহার চক্ষুজল রাইয়তের রোদনে উত্তর দিতেছে। তাহাদিগকে আপনার বিপন্ন ভ্রাতৃগণ মনে করিয়া পরমযত্নে আহারাদি করাইতেছেন এবং তাহাদিগের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দানের সঙ্কল্প করিতেছেন। ···

হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে চাষীরা যে গান রচনা করে তারও কয়েকটি কলি লেখক ঐ ... দিয়েছেন :

ভাসছে মন, মনের হরিষে
আগে লুটে খেত এক হরিশে—এখন বাঁচালে এক হরিশে
বুনে ২ নীল কত্তো জমী খীল,
এখন হতেছে তায় অড়ল-কলাই-সরিষে। ···

মাইকেল মধুসূদনও তাঁর দুর্দিনে অর্থার্জনের আশায় বালক-বালিকাদের জন্য কয়েকটি নীতিমূলক কবিতা রচনা করেন।. কবিতা-

গুলি দিয়ে মাইকেলের কোন শিশুপাঠ্য কবিতাপুস্তক প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়েছিল কি না আমরা জানি না। কবিতাগুলির দ্বারা তাঁর অর্থলাভের আশা পূর্ণ হয় না বটে কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা শিশু-সাহিত্যের কবিতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর চরিতকার যোগেন্দ্রনাথ বসুর মতে :

> নীতিমূলক কবিতাগুলি মাইকেল ১৮৭০ খৃস্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। ...নীতিমূলক কবিতাগুলি ঈসপস্ ফেবলসের আদর্শে বাঙ্গালা কথামালার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। নিজের অর্থাভাব ক্লেশ দূর করিবার আশায়, বিদ্যালয়ে পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্য, মধুসূদন তাহা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার অনেকগুলি সুন্দর। বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি সাধারণের সুপরিচিত হইয়াছে।

আমাদের মতে তাঁর সর্বাপেক্ষা পরিচিত শিশুপাঠ্য নীতি-কবিতা 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'। তাঁর 'মেঘ ও চাতক' কবিতাটিও উদ্ধারযোগ্য। কবিতাটি এই :

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
ভাঙ্গে তরু মড়্-মড়ে ;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে ;
যেন ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও প্রভু করি এ মিনতি।"

বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—
কেহ আসে, কেহ যায় ;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায় ;
ত্রস্ত লোকে সবে ;
সে রূপে চাতক দল,
উড়ি করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে করি এ মিনতি ।"

রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;—
"অপরে নির্ভর যার, সে অতি পামর !
বায়ুরূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি ;—
ধরার এ ধার ধারি ।

এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা যায়,
অপরূপ রূপসুধা বাড়ে নিরন্তর ;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর ।

নিজে তিনি হীন-গতি ;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি ;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা ।—
তোমরা কাহারা ?

তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল ?
পাখা দিয়াছেন বিধি ;
যাও যথা জলনিধি ;
যাও যথা জলাশয় ;—
নদ-নদী তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীতকালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"
চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নিবাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।
যা চাহ, লভ তা সদা নিজ পরিশ্রমে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

মাইকেলের নীতি-কবিতাগুলির দু' বৎসর পরে ১৮৭২ খৃস্টাব্দে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রেরও একটি সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির দ্বারাও শিশু-সাহিত্যের কবিতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও শিশুপাঠ্য পুস্তকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটিরও উপজীব্য প্রভাত, কিন্তু গ্রামের প্রভাত। কবিতাটির কিয়দংশ এই :

রাত পোহালো ফর্সা হলো
ফুটল কত ফুল
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা
জুটল অলিকুল।

পূরব ভাগে অরুণ রাগে
উঠলো দিবাকর
সোনার বরণ তরুণ তপন
দেখতে মনোহর ···

তর্কালঙ্কারের প্রভাত-বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করলেই মিল ও পার্থক্য ধরা পড়বে। কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়। বঙ্গদর্শনে শিশুপাঠ্য সাহিত্য স্থান পেয়েছে, এটা অত্যন্ত শ্লাঘার কথা।

ব্লুমহার্ট কৃত 'ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগে' আরও কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্লুমহার্ট পুস্তকগুলির যে বিবরণ দিয়েছেন তা পাঠে আমরা জানতে পারি ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় হরিচরণ দে রচিত 'কবিতামঞ্জরী'। তার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ খৃস্টাব্দে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত হয় গোপালচন্দ্র দত্তের 'কবিতামঞ্জরী'। গ্রন্থখানি ছিল শিশুপাঠ্য ছোট ছোট কবিতার সংকলন। তারপর ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'জ্ঞানমঞ্জরী' নামে কবিতাগ্রন্থ। এখানিরও সকল কবিতা ছিল শিশুদের জন্য এবং নীতিমূলক। আবার এই বৎসরই কলকাতায় প্রকাশিত হয় মথুরানাথ তর্করত্নের শিশুপাঠ্য কবিতাগ্রন্থ 'কবিতামঞ্জরী'। এখানির কতকগুলি কবিতা ছিল নীতিমূলক এবং কতকগুলি বর্ণনাত্মক। গ্রন্থগুলির এই সামান্য বিবরণটুকু ছাড়া আমাদের আর কিছু জানবার উপায় নেই।

পূর্বে প্রসঙ্গত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি প্রথম কোন বৎসরে প্রকাশিত হয়, আমাদের জানা নেই, হয়তো জানার আর উপায়ও নেই। আমরা তাঁর পদ্যপাঠ গ্রন্থের ঊনত্রিশ সংস্করণের এক খণ্ড দেখেছি। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৮৭ খৃস্টাব্দ। মনে হয়, ঊনত্রিশটি সংস্করণ হোতে গ্রন্থখানির বিশ বৎসরের কাছাকাছি সময় লাগে। এই গ্রন্থে তাঁর সমস্ত কবিতা স্থান পায় নি। কারণ, আমাদের কৈশোরে তাঁর আরও যে দু'-একটি কবিতা সংকলিত গ্রন্থে পাঠ করেছি সেগুলি আলোচ্য গ্রন্থখানিতে নেই। মনে হয়, আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশকাল ১৮৭০-৭১ খৃস্টাব্দ। ঐ সময়ে তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর। যদুগোপাল

শিশুপাঠ্য কবিতা রচয়িতা হোলেও কবিতায় সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহারে তাঁর ঝোঁক দেখা যায় এবং শিশুদের জন্য ভাব-গম্ভীর কবিতা রচনার মধ্যেও যেন তিনি অসঙ্গতি দেখতেন না। কিন্তু তিনি নীতিশিক্ষা বিতরণের মোহজাল কেটে বিবিধ বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। তবে আমরা তাঁর কবিতাগুলিকে শিশুপাঠোপযোগী মনে করতে কুণ্ঠিত। তাঁর পদ্যপাঠে 'চন্দ্র' নামে কবিতাটির কতকগুলি স্তবক পাঠেই আমাদের কথা সমর্থিত হবে মনে হয়।

চন্দ্র

ভুবনমোহন রূপ ধর তুমি শশি!
তোমার কৌমুদী রাশি, তামসীর তম নাশি,
কেমন সাজায় তারে মোহিনী রূপসী!
পরায় সোনার হার নদীর গলায়,
সৈকত পুলিনে তার চুমকি বসায়!

নভ-নীল-হ্রদে তুমি সোনার কমল!
সুমন্দ প্রবাহ-ভরে, ধীরে ধীরে নীর 'পরে
ভাসিতেছে রূপে দিশি করিয়া উজ্জ্বল।
রবির তোমাতে দেখি বড়ই সোহাগ,
নিজ করে তাই ক'রে দেছে অঙ্গরাগ।

ললিত লাবণ্য তব জুড়ায় নয়ন;
উদিলে গগন-তলে শিশুগণে কুতূহলে
অনিমেষে তোমাপানে করে বিলোকন
আদরে প্রসূতি ডাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে,
মণির কপালে তার টিক দিয়ে যেতে।

সবাই তোমারে ভালবাসে শশধর।
নির্ম্মল চাঁদিনী রাতে, বাঁশরী লইয়া হাতে
রাখাল বাজায় কিবা সুললিত স্বর।
নীরব নিশায় ঐ বাঁশরীর স্বরে
অমিয়ের ধারা ঢালে শ্রবণ বিবরে।

প্রণয়ীর সখা তুমি বিদিত ভুবন,
মলয় মারুত মন্দ প্রফুল্ল কুসুম-গন্ধ
রজত-ধবল আর তোমার কিরণ।
একত্রিত কান্তকান্তা সেবা করে যবে
অমর বিভব তারা ভোগ করে ভবে। ···

অতঃপর দশ-বারো বৎসর আর কোনও নূতন শিশুপাঠ্য কবিতাগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, এমন কোনও নিদর্শন আমরা পাই নি। আমাদের কালে শিশু-সাহিত্যে অনেক নূতন নূতন উৎকৃষ্ট ছড়া রচিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কবিকণ্ঠ এ বিষয়ে নীরব। তার কারণ বোধ হয় তখনকার দিনে প্রাচীন ছড়াগুলির প্রাদুর্ভাব। সেকালে সকল ঘরেই রজনীতে বঙ্গললনাকণ্ঠে ঘুমপাড়ানী ও ছেলেভুলানো ছড়ার সুমধুর গুঞ্জনই হয়তো তাঁদের স্তব্ধ করে রেখেছিল। একালে সে সকল ছড়া লোককণ্ঠ পরিত্যাগ করে সাহিত্যের ইতিবৃত্ত সম্বলিত গ্রন্থের নীরস পৃষ্ঠায় বন্দিনী ও মরণোন্মুখী। বোধ করি নূতন ছড়ার সৃষ্টির অন্যতম কারণ তাই।

১৮৭৬ খৃস্টাব্দে আবার একখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির নাম 'হিতোপাখ্যানমালা, ২য় ভাগ'। আমরা এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণখানি দেখেছি, প্রথম দিককার তিনটি সংস্করণের সন্ধান পাই নি। সেকারণ গ্রন্থখানি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয় জানি না। ভূমিকায় অনুবাদক নিজ পরিচয় ও সে সকল কথা লেখেন নি। হিতোপাখ্যানের দুটি ভাগ ছিল এই গ্রন্থ থেকেই তা জানা যায়। প্রথম ভাগ 'গোলেস্তাঁ' থেকে ও দ্বিতীয় ভাগ 'বুঁস্তা' থেকে 'সঙ্কলিত'। গ্রন্থ দুখানি পারসিক কবি সাদীর এ সংবাদ সর্বজনবিদিত। কিন্তু 'সংকলন' ও 'অনুবাদ' এক নয়। অনুবাদক গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় ও ভূমিকায় 'সঙ্কলিত' বলে উল্লেখ করায় মনে হয় অবিকল অনুবাদ করা হয় না। পূর্বেও কোনও লেখক অবিকল অনুবাদ করেন না। তাঁরা তার কারণেরও উল্লেখ করেছেন।

অনুবাদক গ্রন্থ-ভূমিকায় গোলেস্তাঁ সম্বন্ধে সাদীর নিজ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সাদী বলছেন :

লোকের প্রীতি ও প্রফুল্লতার জন্য আমি গোলেস্তাঁ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারি। এই গোলেস্তাঁতে হৈমন্তিক বায়ুর অত্যাচার থাকিবে না, কাল চক্র তাহার বাসন্তী আমোদ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। এই উদ্যানের পাত্রপূর্ণপুষ্পে কি কার্য্য হইবে, আমার গোলেস্তাঁর এক পত্র গ্রহণ কর। এই পুষ্প পাঁচ কি ছয়দিনের অধিক থাকিবে না, আমার এই গোলেস্তাঁ চিরকাল থাকিবে।

কিন্তু বুঁস্তা সম্বন্ধে সাদীর নিজ মত কি তা ভূমিকায় নেই। যা হোক, বুঁস্তার একটি স্তবক এই :

বিনয়।

এক মধুরভাষী মধু বিক্রেতা ছিল। তাহার সহাস্য মুখের সুমধুর বিনম্র বাণীতে সকলের হৃদয় বিগলিত হইত। এজন্য তাহার নিকটে সর্ব্বদা ক্রেতাগণের ভিড় থাকিত। তাহার মধুর গ্রাহক মক্ষিকাকুল অপেক্ষা অধিক ছিল। সে বিষ দান করিলেও মধু বলিয়া লোকে তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিত। তাহার ব্যবসায়ের অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া একজন কটুভাষী গর্ব্বিতের ঈর্ষা হইল। সে একদিন মধুপূর্ণ ভাণ্ড মস্তকে করিয়া বিক্রয়ের জন্য নগরের পথে পথে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল। সমগ্র দিন ঘুরিয়া কটু কর্কশ নাদে মধু মধু বলিয়া চীৎকার করিয়া একটি মক্ষিকাকেও গ্রাহক পাইল না। যখন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া এক কপর্দ্দকও হস্তগত করিতে পারিল না, তখন মহাদুঃখে গৃহকোণে বসিয়া রহিল। অপরাধী দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে, কারাবাসী ইদোৎসবের দিনে যে প্রকার বিষণ্ণ ভাব ধারণ করে, সে তদ্রূপে বিরসমুখে উপবিষ্ট রহিল। ইহা দেখিয়া তদীয় সহধর্ম্মিণী কৌতুক-ভাবে তাহাকে বলিল, জান তিক্তভাষীর হস্তে মধুও তিক্ত হয়।

> যে ব্যক্তি বিরসমুখে অন্নপরিবেশন করে, তাহার অন্ন তোমার নিকটে অখাদ্য হইবে। বলি হে ভদ্রে? কটূক্তি অবিনয়ে নিজের অনিষ্টসাধন করিও না, উদ্ধত অপ্রিয়ভাষীর ভাগ্য কখন অনুকূল হয় না।

এই গ্রন্থের উপদেশগুলি মধুসম এবং রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হোলেও বালক-বালিকারা রস গ্রহণে সক্ষম হবে না বলে মনে হয়। তবুও গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য ছিল সেকালের বালক-বালিকাদের নীতিবিষয়ক উপদেশ দেওয়া, উৎকৃষ্ট সাহিত্যপাঠের আনন্দ দেওয়া নয়। উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠকচিত্তকে আনন্দ-রস ও জ্ঞানোলোক দুই-ই দান করে। কিন্তু সেকালের শিশু-সাহিত্যে আনন্দের স্থান ছিল গৌণ, শিক্ষাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। আর তাও ছিল পাঠ্যগ্রন্থের মাধ্যমে। তবে মধ্যে মধ্যে যে অল্প ব্যতিক্রমও ঘটে নি তাও নয়। এই গ্রন্থেই তার উদাহরণ আছে।

বিদ্যাসাগরোত্তর যুগের পথিকৃৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকার, এর প্রমাণ যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরও বারো-তেরো বৎসর পূর্বে শিশু-সাহিত্যকে বিদ্যায়তনের বাইরে কিঞ্চিৎ মুক্তি দেন কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাঁর রচিত 'জীবন-আদর্শ' নামে গ্রন্থের ভূমিকায় এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

> ···যাহাতে বালকগণ সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল হয়, তাহাই এই ক্ষুদ্রপুস্তকের উদ্দেশ্য। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি সাধনাভিলাষী হইয়া প্রশ্নচ্ছলে বালকের দৃষ্টি নানা ঘটনায় নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ···বিষয় দ্বিবিধ করিয়াছি। কতকগুলি গৃহে পাঠার্থ ও কতকগুলি শিক্ষকমহাশয়দিগের নিকট পাঠার্থ।

যোগীন্দ্রনাথও তাঁর 'হাসি ও খেলা'র ভূমিকায় গ্রন্থখানিকে 'গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদানযোগ্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থখানিতে উপদেশ ও তার উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি ছোট ছোট সুন্দর আখ্যায়িকা ছিল। আর ছিল একটি মহৎ প্রচেষ্টা—অন্ধ সংস্কার দূর করার। শৈশব থেকেই ঘরের ও বাইরের শিক্ষায় মানুষের মনে

কতকগুলি সংস্কার গড়ে ওঠে যা তার পরবর্তীকালের জীবনকে অধিকাংশক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানবে বিশ্বাস, হাঁচি-টিকটিকির শব্দে ও বিশেষ অবস্থায় কাক-চিলের ডাকে মঙ্গল-অমঙ্গলের আভাস ইত্যাদি বহু কুসংস্কার শৈশব থেকেই গৃহেই মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষাংশে প্রথম ভট্টাচার্য মহাশয়ই সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষাদানের চেষ্টা করে সাহস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। তাঁর পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে বিরোধিতা করেন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কঙ্কাবতী'* ও অন্যান্য রচনায়, আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্রূপের কষাঘাত করেন কবি সুকুমার রায়। কিন্তু কারও প্রচেষ্টাই ফলোৎপাদিকা হয় না এবং এখনও এই অস্বাস্থ্যকর শিক্ষা পূর্ণোদ্যমে প্রচলিত। ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচনা বিস্মৃতির অতলশায়ী, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা 'উদ্ভট রস' জ্ঞানে আজ হাসির উপাদান, আর সুকুমার রায়ের কবিতাবলী 'ননসেন্সিক্যাল রাইম' নামে অভিহিত হয়ে শিশুমহলে প্রচুর হাসি ছড়াচ্ছে। তাঁর অপরাপর রস-রচনারও তেমনি হাস্যকর দশা। আমরা বাঙালী হাসতে না জানলেও কিন্তু হাসাতে জানি!

ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচনাটির ভাষা পরিপাটী, সংযত ও সরল। ফলে সকল বয়সের পাঠকেরই উপযোগী। তার কিঞ্চিৎপাঠেই তাঁর প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাবে :

কুসংস্কার।

মনুষ্য যে পরিমাণে অজ্ঞ অবস্থায় থাকে, সেই পরিমাণে তাহার কুসংস্কার প্রবল থাকে। কারণ, যে স্থলে অজ্ঞতা সেই স্থলেই বিশ্বাসের আধিক্য। এবং বিশ্বাসের আধিক্যই কুসংস্কারের উত্তেজক। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কুসংস্কারের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

* অধুনা বিস্মৃতপ্রায় 'কঙ্কাবতী' পুস্তকখানি বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে।

…‘এই ঘটনাটি কেন ঘটিল’ ইহা প্রত্যেক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কারণ না জানিতে পারিবে, ততক্ষণ মনুষ্য তাহা অনুসন্ধান করিবে। এরূপস্থলে যদি কোন অসামান্য ঘটনা ঘটে, মনুষ্যের উপর তাহারই প্রভাব হয়।…

এতদ্ভিন্ন দুষ্ট প্রকৃতির লোকে আপনার কিছু সুবিধার জন্য ঘটনার যথার্থ কারণ গোপন করিয়া এমন একটি অসংলগ্ন কারণ দর্শাইয়া দেয় যে, বুদ্ধিমান মাত্রেই প্রথমে ইহা অবিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যাহারা বালক বা মূর্খ তাহারা অজ্ঞ অবস্থায় থাকাতে যথার্থ কারণ অনুসন্ধানে অপারগ হইয়া পরিতৃপ্তির জন্য উক্ত অবিশ্বাস্য কারণটি বিশ্বাস করিয়া লয়। এই কারণেই যে দেশের লোক অধিক মূর্খ, সেই দেশেই মন্ত্র, ডাইন, ভূত ইত্যাদির অধিক প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। (অজ্ঞ লোকে জ্যোৎস্না রাত্রিতেই ভূত দেখিতে পায় কেন? রাত্রিতে নির্জ্জন প্রদেশে একাকী পথ চলিলে পশ্চাৎ দিকে পদশব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চাৎদিকে কে আসিতেছে দেখিবার জন্য থামিলে আর তাহা শুনা যায় না কেন? বাঁশঝাড়ে ঘড়েল নামক নকুল জাতীয় একপ্রকার জন্তু বাস করে। রাত্রিতে কোন ভীত ব্যক্তি তথায় গমন করিতে করিতে একটি বাঁশ যদি তাহার সম্মুখে নত দেখে, বা তাহার গায়ে জল পতিত হয়, তবে সে কি মনে করে?) যে সকল দ্রব্য সস্তুতলভ্য (?) তাহার দ্বারা কোন রোগ আরোগ্য করিলে পাছে কেহ তাহা অগ্রাহ্য করে এই জন্য মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন পীড়ায় কেবল জল মহৌষধ। কিন্তু কেবল জল ব্যবস্থা করিলে পাছে লোকের অভক্তি হয়, এই জন্য জলপড়া ব্যবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। গাত্র দগ্ধ হইলে সর্ষপ তৈল মহোপকারী। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোকে আত্মসুবিধার্থ তৈলপড়া ব্যবস্থা করিয়াছে। ধূলা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সর্পের চক্ষে ফেলিয়া দিতে পারিলে, সর্পের চক্ষের পাতা না থাকায়,

উক্ত ধূলিতে তাহার চক্ষু বুজিয়া যায়, সুতরাং সর্প নড়িতে পারে না, কিন্তু প্রতারক ব্যক্তি উহা প্রকাশ না করিয়া ধূলাপড়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে সর্ষপ তৈলমর্দ্দনে আরোগ্য হয়। কিন্তু আত্মগর্ব্ব প্রকাশার্থে কত মন্ত্রই না উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। ...

... যে দেশের লোক যত আলস্যপরায়ণ, সেইদেশের লোকমধ্যেই 'অদৃষ্ট' অধিক পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গবাসীদিগের 'কপাল' ও মুসলমানদিগের 'নসিব' উন্নতির কুঠার। 'অদৃষ্ট' কথাটি উদ্ভাবিত না হইলে অলসদিগের বিষম বিপদ উপস্থিত হইত। ...

সেকালে কুসংস্কারের প্রাবল্যই সম্ভবত প্রবন্ধটি রচনার মূল।

এই গ্রন্থখানির পরে চার বৎসরের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত আর কোনও গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই না। এই থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এই সময়ে কোনও নূতন গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয় নি, বরং তার বিপরীতই ঘটে থাকবে। কিন্তু পূর্বের ও পরের গুলি দেখে অনুমান করা যেতে পারে, তখন নীতিবিষয়ক সাহিত্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছিল। কেন না ১৮৮২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থখানির নামই 'নীতিমালা'। এ মালা শীঘ্র ছিন্ন হয় না, বালক-বালিকাদের কোমল-কণ্ঠে বৎসর কতক ফাঁস হয়ে থাকে। কারণ এর পরের গুলিও নীতি-শিক্ষার কঠোর দায়িত্ব বহন করে শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। সে কথা ক্রমশ প্রকাশ্য। তবে নীতিমালার এক বৎসর পূর্বে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতাগ্রন্থ 'শিশু-কবিতা'।

একালে কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম বাঙালী বিস্মৃত, কিন্তু সেকালের বাংলায় বাঙালী রঙ্গমঞ্চে তাঁর রচিত নাটক দেখেছে, গ্রামে তাঁর রচিত যাত্রাগান শুনেছে, পত্রিকায় কবিতা পাঠ করেছে। রঙ্গমঞ্চের জন্যই তিনি সর্বস্বান্ত হন ও অকালে পরলোকগমন করেন। সেকালের শিশু-সাহিত্যে মাঝে মাঝে দুটি-চারিটি করে সুন্দর কবিতা-কুসুম প্রস্ফুটিত হোতে দেখা যায়। রাজকৃষ্ণ রায়ও তরলবুদ্ধি বালক-

বালিকাগণকে প্রথম কবিতা শিক্ষা দিবার যোগ্য করে 'শিশু-কবিতা' রচনা করেন। পুস্তকখানি সচিত্র ও ত্রিশটিরও অধিক ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। পুস্তকখানিতে বই, কাগজ, দোয়াত, কলম, পাঠশালা, গুরুজন, ভালবাসিবার লোক, পশু ইত্যাদি সম্বন্ধে কবিতা আছে। একটি কবিতাপাঠেই সমগ্র গ্রন্থখানি কতটা শিশু-সাহিত্যোপযোগী হয়, বোঝা যাবে :

কলম

খাঁকড়া, বাঁখারি, শর, হাঁসের পালকে।
কলম তোয়েরি করে যত ছেলে লেখে॥
লোহার কলমে আমি তোমাদের তরে।
এ 'শিশু-কবিতা' বই লিখি ধরে ধরে॥
তা বলে তোমরা তাই করোনা এখনি।
ছেলেবেলা ভাল নয় লোহার লেখনী॥
খাঁকড়া, বাঁখারি, শরে কলম কাটিয়ে।
বাঙলা আঁখর লেখো, বড় টান দিয়ে॥
তারপর সরু থতে সরু সরু লেখো।
কি করে কলম কাটে চেয়ে চেয়ে দেখো॥
বগলী, বাঁশের চোঙে, দোয়াতদানীতে।
কলম রাখিতে হয় মুছিয়ে কালিতে॥
ভাল কলমের লেখা বড় ভাল হয়।
ভাঙা কলমের লেখা কিছু ভাল নয়॥
ইংরিজি আঁখর লেখা শিখিবে যখন।
হাঁসের পালক পেনে লিখিবে তখন॥

এটিও নীতিমূলক কবিতা। তবে কিছুটা বর্ণনাত্মক। কিন্তু শব্দ-চয়নের ও গাঁথনির গুণে এবং ছন্দে সুখপাঠ্য। কবিতাটিতে ভাব নেই, কিন্তু ছন্দরস আছে এবং বালক-বালিকাদের উপযোগীও বটে। নীতিমালার 'বিজ্ঞাপনে' অনুবাদক মহাশয় লিখছেন (গ্রন্থে অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না) :

'নীতি ও ধর্ম বিষয়ক প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থ কিমিয়াসদতের উর্দু অনুবাদ আকসির হেদায়েত নামক পুস্তক হইতে এই

প্রথম ভাগ নীতিমালার প্রবন্ধ সকল গ্রহণ করা গেল। ইহা অনুবাদমাত্র, কিন্তু সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণ অবিকল। অনুবাদ নহে। অপিচ মূল প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।… ইহার প্রায় প্রবন্ধই কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সুলভ সমাচার পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। …নীতিশিক্ষার অভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছে। আশা করি এ পুস্তক চরিত্র সংশোধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে। বালক-বালিকার সুখ বোধের জন্য পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল করিতে বিশেষ প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাক পুস্তকখানিতে কিরূপ নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দুটি নীতি এই :

সাধারণ মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য।

সাধারণ মনুষ্য জাতির প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য, ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। মনুষ্য যাহা নিজের সম্বন্ধে ভাল না বাসেন, তাহা যেন অপর লোকের সম্বন্ধে মনোনীত না করেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, মনুষ্যজাতি একটি দেহস্বরূপ। দেহের এক অংশের ব্যথা হইলে যেমন অপরাপর অংশেও আরাম থাকে না, সেইরূপ এক মনুষ্যের দুঃখ হইলে অপর মনুষ্যেরও ক্লেশ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, 'অন্যে যে প্রকার ব্যবহার করিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও, তুমিও অন্য লোকের প্রতি সে প্রকার করিও না।' মুসা নিবেদন করিয়াছিলেন, 'প্রভো! তোমার দাসের মধ্যে সুবিচারক কে?' ঈশ্বর বলিলেন, 'যে ব্যক্তি আপনাকে দিয়া বিচার করে।'

২। কাহারও নিকট অহঙ্কার করিবে না। যেহেতু পরমেশ্বর অহঙ্কারীর প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, আমার পরমেশ্বরের এইরূপ আদেশ আছে যে,

'তুমি বিনীত হও, তাহা হইলে তোমার দৃষ্টান্তে কেহ অন্যের প্রতি গর্ব্বিত হইবে না। ...'

গ্রন্থখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য ছিল কি না, আর এর দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশিত হয় কি না জানা যায় না। তবে উপদেশগুলি যে কার্যকরী হয় না তা পরবর্তী পুস্তকগুলি থেকেই জানা যায়। ভাষা আদৌ প্রাঞ্জল নয়, অনুবাদও আড়ষ্ট। এমন গ্রন্থ বিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য করেই পড়ানো চলতে পারে।

যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনি ভূদেববাবুও দু'-একজনকে বালক-বালিকাদের জন্য গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং নিজেরা তাঁদের পাণ্ডুলিপিও সংশোধন করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা, ভূদেববাবুর কথামতই 'আত্মোৎসর্গ' বা 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি রচনার অনেকদিন পরে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ, গ্রন্থের মুখবন্ধের কাল ১৮৮০ খৃস্টাব্দ, এবং প্রকাশকাল ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ। তবে এই সময়ের মধ্যে দু'-একটি সংস্করণও হওয়া সম্ভব। কিন্তু গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় সংস্করণের উল্লেখ দেখা যায় না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুখবন্ধে লিখছেন, 'যে যে মহাত্মার চরিত্রের যে যে অংশ পাঠ করিলে 'আত্মোৎসর্গ' শিক্ষা হয়, সেই সেই অংশ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি।' কিন্তু রচনায় উজ্জ্বলতা নেই ভাষার উচ্ছ্বাস আছে বটে, যাকে 'নভেলিয়ানাও' বলা চলে। কিঞ্চিৎ পাঠেই তা বোঝা যাবে :

জন হ্যামডেন।

পাঠক, চল একবার শ্বেত দ্বীপে যাই। স্বাধীনতার আবাসভূমি ইংলণ্ডে কোন বীর সন্ন্যাসী জন্মিয়াছিলেন কি না, চল গিয়া সংবাদ লই। এই যে সম্মুখে এক পাষাণময়ী প্রতিমা রহিয়াছে, এ কোন দেবতার প্রতিকৃতি? কে যেন উত্তর দিল, 'এ দেবমূর্ত্তি নয়, নররূপী দেবতা জন হ্যামডেনের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি। ঐ দেখ পাঠপীঠ-বক্ষে কি খোদিত রহিয়াছে।'

একবার পড়িয়া দেখি। ইহা তাঁহার জীবনের ইতিহাস। যাহা লিখিত আছে তাহার মর্ম্ম ও তৎসমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৫৯৭ খৃস্টাব্দে এই মহাপুরুষ লণ্ডন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন প্রথম চার্লসের অত্যাচারে গ্রেট ব্রিটেন আলোড়িত হইতেছিল, যখন কেহই সাহস করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, সেই সময়ে এই রাজনৈতিক সন্ন্যাসী জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।···

তখনকার দিনে জীবনচরিত রচনা করতে গেলেই ইউরোপের, বিশেষত ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের চরিত্রকে গ্রহণ করা হোত। আর এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই ছিল অনুবাদ। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চরিত্রগুলি বিদেশী হোলেও রচনা তাঁর নিজস্ব এবং শিশুপাঠ্য গ্রন্থে 'পাঠককে' সম্বোধন করার রীতিও একান্ত তাঁরই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আরও কয়েকখানি শিশুপাঠ্য বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

সখা সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' প্রকাশের এক বৎসর পূর্বে ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তাঁর 'মহৎজীবনের আখ্যায়িকাবলী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির দুটি খণ্ড ছিল। প্রথম খণ্ডে ছিল 'থিওডোর পার্কার' ও 'ভগিনী ডোরার' চরিতকথা। আখ্যায়িকা দুটি প্রথমে যথাক্রমে 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি 'সর্ব্বসাধারণ পাঠকদিগের জন্য প্রকাশিত' হয় একথা গ্রন্থকার গ্রন্থ-সূচনায় লিখেছেন। আবার সেই সঙ্গে এই কথাগুলিও লিপিবদ্ধ করেছেন :

···যশোহর সম্মেলনী সভা তাঁহাদের নীতিশিক্ষা বিভাগে এবং কলিকাতা রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ে এই পুস্তকখানি পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।···

বয়স্কগণপাঠ্য পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা বালক-বালিকাদের পাঠ্য হোতে ইতোপূর্বেও দেখা গেছে। সেকালের শিশু-সাহিত্য এই ভাবেই

গঠিত হয়। কাজেই এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানিকে ভাষা, বিষয়, রচনাপদ্ধতি ও গ্রন্থকারেরও সম্মতির কারণে আমরা বিদ্যাসাগর-যুগের শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। মার্কিন ধর্মযাজক থিওডোর পার্কার দাস-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেন মহাশয় লিখছেন :

> এই সুযোগে দক্ষিণ প্রদেশের অনেক দাস স্বাধীন হইয়া গেল,—দক্ষিণ প্রদেশবাসী আপামর সাধারণের, বিশেষতঃ দাস-ব্যবসায়ীদিগের আর ক্রোধের সীমা রহিল না।
>
> অচিরকাল মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল ; তখন উত্তর প্রদেশ নিবাসী সুবিখ্যাত ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ, থিওডোর পার্কারের পরম প্রিয় বন্ধু ডানিয়েল ওয়েবষ্টারের উদ্যোগে এই মর্ম্মে একটি রাজবিধি প্রণয়ন করা হয়, যে অতঃপর যে ব্যক্তি দক্ষিণ প্রদেশের পলাতক দাসকে আশ্রয় দিবে, তাহাকে দুই সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড এবং ছয়মাস কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। থিওডোর পার্কার যখন এই কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে জলধারা দেখা দিল, ধীরে ধীরে স্বীয় পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়া, পার্কার প্রাচীর-সংলগ্ন প্রিয় ওয়েবষ্টারের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তিখানি অবতারিত করিলেন,। এবং খেদপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'ডানিয়েল ওয়েবষ্টার যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে এই হৃদয় খুলিয়া দেখাইতাম, তাহাতে এতদূর পর্য্যন্ত কতদূর প্রণয়ের সহিত তোমাকে পোষণ করিয়াছি। আজ হইতে তুমি আর আমার বন্ধু নও। আজ বুঝিলাম, স্বর্গের সিংহাসন অপেক্ষা প্রেসিডেণ্টের সিংহাসন তোমার নিকট অধিক প্রার্থনীয় মনে হইয়াছে। যাও, যে ক্রীতদাস প্রথার পক্ষপাতী, তাহার সহিত আমার বন্ধুতা সম্ভবে না।' এই বলিয়া পার্কার বিষণ্ণ হৃদয়ে চিত্রখানি চুম্বন করিলেন এবং তাহাকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দিলেন। পরদিন রবিবারে তিনি তাঁহার উপাসক মণ্ডলীর সকলকে এই উপলক্ষে বিশেষ ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং উপসংহারে বলিলেন, 'আমি, তোমাদের

ধর্ম্মাচার্য্য, তোমাদিগকে ঈশ্বরের নামে এই আদেশ করিতেছি যে, তোমরা এই নিরীশ্বর রাজবিধি কেহই গ্রাহ্য করিও না। সুবিধা পাইলেই এই অমানুষিক রাজবিধিকে পদে দলিত করিতে ছাড়িও না। ...

ধর্মযাজকের বেদী থেকে অন্যায়ের বিরোধিতার জন্য রাজবিধি অমান্যের উপদেশ দান, পরোক্ষে জনতাকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন থিওডোর পার্কার। সেই ঘটনা উদাহরণস্বরূপ বাংলার বালক-বালিকাগণের, নৈতিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্মুখে স্থাপন করার মতো সৎসাহস উনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য রচয়িতাগণের মধ্যে কারও কারও ছিল এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও যে এ বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না, তাও এই থেকে দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তো তাঁর 'আখ্যান মঞ্জরী' ২য় ভাগে 'দস্যু ও দিগ্বিজয়ী' নামক আখ্যানটিতে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়েছেন! সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য লোকহিত ও সত্যপ্রতিষ্ঠা।

অতঃপর রজনীকান্ত গুপ্ত বিলাতী চরিত্র বর্জন করে তাঁর চরিত-কথা রচনার ভিত্তি করেন ভারতীয় চরিত্র। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'আর্য্যকীর্ত্তি' এ বিষয়ে একটি কীর্তিস্বরূপ। গ্রন্থখানি একালের বালক-বালিকারা পাঠ করে না সত্য কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষ করে শিশু-সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। গ্রন্থের রচনাগুলি সকল দিকেই মৌলিক ও মুক্ত, তবে সংস্কৃত শব্দবহুলতায় গুরু-গম্ভীর। রজনীকান্তের বৈশিষ্ট্যই ছিল এটি। কিন্তু এতখানি গাম্ভীর্য শিশু-সাহিত্যে অচল। পাঠক-পাঠিকাগণের অন্তরে মহৎ 'আর্য্যভাব' জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই হয়তো তিনি গাম্ভীর্য ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা যে ফলবতী হয় না তার প্রমাণ কিছু পরেই দেওয়া হয়েছে।

'আর্য্যকীর্ত্তি'র তথা রজনীকান্তের ভাষার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। তবুও গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধটির কিয়দংশ উদ্ধার করা দোষের হবে না এবং গুপ্ত মহাশয়ের রচনা স্মৃতিপথে আবির্ভূত হবে।

লক্ষ্মীবাই।

লক্ষ্মীবাই এই উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রকৃত বীর রমণী। যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ব্রিটিশের বিজয়িনী শক্তি অতুল প্রভাবের মহিমায় গৌরবান্বিত, তখন লক্ষ্মীবাই বদ্ধমূল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া আপনার স্বাধীনতার গৌরব রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হন এবং আপনার লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় যেমন কমনীয় কামিনীজনোচিত মধুরতা ও স্নিগ্ধতায় আর্দ্র ছিল তেমনি স্থিরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার রেখাপাতে অটল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি কেহ মাধুর্য্যময় কোমল সৌন্দর্য্যের সহিত ভীম-গুণান্বিত ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাত-কমলের অঙ্গ বিলাসের সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণাধ্বনির সহিত লোকারণ্যের পর্ব্বতবিদারী ভৈরব রব শুনিতে স্পৃহাযুক্ত হন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাই তাঁহার নিকট অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয় আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এই লাবণ্যময়ী বীরাঙ্গনার বীরত্ব কাহিনী শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ...

এই গ্রন্থের এক বৎসর পরে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'শিশুরামায়ণ'। গ্রন্থখানি চন্দননগরে তিনকড়ি চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত হয়। আমরা যেখানি দেখেছি তাতে প্রচ্ছদ বা নামপৃষ্ঠা না থাকায় গ্রন্থকার কে জানতে পারি না। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সরল এবং রচনাটি সাবলীল। এই গ্রন্থের পূর্বে বালক-বালিকাদের জন্য কোনও রামায়ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এমন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। রচনাটির প্রারম্ভ এই :

অযোধ্যা নগরে দশরথ নামে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রানাম্নী তাঁহার তিন

মহিষী ছিল। মহারাজ দশরথের প্রথম বয়সে সন্তান হয় নাই। তিনি পুত্রার্থে যথাশাস্ত্র অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সর্ব্বসমেত চারি পুত্র হয়। কুমারেরা যেমন রূপবান কালসহকারে সদ্‌গুরুস্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া গুণবানও হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তেমনি সর্ব্বগুণেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চারি ভ্রাতারই বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ ছিল—তবে রাম ও লক্ষ্মণে এবং ভরত ও শত্রুঘ্নে কিছু বিশেষ স্নেহাধিক্য জন্মিয়াছিল। ···

এই গ্রন্থের সমসাময়িক অপরাপর শিশুপাঠ্য গদ্য বা পদ্য-গ্রন্থ হয়তো আরও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা সেগুলির সন্ধান পাই নি। তবে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'কবিতা-কণিকা' নামে একখানি ছোট গ্রন্থ দেখেছি। গ্রন্থে প্রকাশকের নাম আছে, রচয়িতার নাম উহ্য। প্রকাশকই মুখবন্ধে লিখেছেন :

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমার একটি বালকবন্ধুর রচিত কয়েকটি কবিতা দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম এবং সেই আনন্দ সাধারণকে অর্পণ করিবার জন্য কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে উৎসুক হই এবং সেই উৎসুক্যই আজ "কবিতা কণিকার" জীবনের ফল হইয়াছে।

···যদিও এই পুস্তকে অন্যান্য দুই একটি বন্ধুর কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু তাহাও বালক-রচিত। ···

গ্রন্থের ৩১টি কবিতার মধ্যে ২০টি সরলকুমারের। ইনিই সম্ভবত বালক-কবি। স্বয়ং প্রকাশকের দুটি কবিতা আছে। প্রকাশক মহাশয়ের নাম ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আছে অমরযশা শিশু-সাহিত্য রচয়িতা, বাংলার শিশু-সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তক যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের চারটি কবিতা। কিন্তু কবিতা চারটিতে যোগীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না এবং কবিতাগুলি কিছু আড়ষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে একদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, শেষ ভাগে

অপর দিকে যোগীন্দ্রনাথ সরকার, এই দুই জন পুরুষ শিশু-সাহিত্যে দুটি যুগের সূচনা করেছেন।

প্রকাশকের মতে কবিতা-কণিকার কবিগণ সকলেই বালক। তাঁরও দুটি কবিতা থাকায় তাঁকেও বালক বলা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। তবে কবিতাগুলি ভাবের দিক দিয়ে বালকোচিত রচনাও নয়, সরেসও বলা চলে না। সেকারণ উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। বালকের রচনা বিধায় গ্রন্থখানির উল্লেখ করা গেল মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় বীরেশ্বর পাঁড়ের নাম অত্যন্ত পরিচিত হয়। তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু সেকালটা অভিভাবক ও সরকারের পক্ষে বড় দুঃসময় ছিল বলতে হয়। কেন না তাঁরা বালকগণকে নিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, একথা পাঁড়েজীর 'আর্য্যপাঠে'র ভূমিকা থেকে জানা যায়। তিনি লিখছেন :

> আজিকালি আমাদের বালকবৃন্দের নীতিজ্ঞানের বড় অভাব হইয়াছে। নীতিজ্ঞানের অভাবে প্রায় কেহই পিতা-মাতাকে মানে না, বৃদ্ধ ও গুরুজনকে সম্ভ্রম করে না, অধিক কি, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার সদ্ভাব পর্য্যন্ত প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপনার, পরিবারবর্গের ও দেশের মহৎ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সকল অভিভাবকই এই অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া প্রতীকারের উপায় অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়াছেন। সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত এই মহানিষ্টের সংবাদ উপস্থিত হইয়াছে।··· সেইজন্য এডুকেশন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশন সরকার বাহাদুরকে পরামর্শ দেন যে, ভারতের ছাত্রবৃন্দকে নীতিশিক্ষা প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য, সরকার বাহাদুর সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।···

সারা ভারতবর্ষের মানবসমাজের রূপ এমন ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল কি না পাঁড়েজীর বক্তব্য থেকে তা না জানা গেলেও সরকার বাহাদুর যে 'ভারতের ছাত্রবৃন্দকে নীতিশিক্ষা প্রদানের' পরামর্শ দেন তা

জানা যায়। এই অপ্রীতিকর অবস্থার কারণ কি তা তখনকার বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার ইতিহাসবেত্তাগণের পক্ষেই বলা সম্ভব। কিন্তু আমরা দেখছি, বাংলার তখনকার শিশু-সাহিত্যকে পরিকল্পনা মতো নীতির নিগড়ে শৃঙ্খলিত করা হয় এবং খাদ্য ও বস্ত্রের মতো তার উৎপাদনও সরকারী পরামর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে বণ্টন ব্যবস্থার কথা জানা যায় না। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়গণ তাই শিশু-সাহিত্য রচয়িতাগণকে নীতিমূলক গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ জানান। মুদ্রিত গ্রন্থগুলি ডিরেক্টর বাহাদুরগণের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল কি না নামপৃষ্ঠায় তার কোনও উল্লেখ নেই। পাঁড়েজী সরকারী অনুরোধে ভারতীয় পুরাণোক্ত আদর্শ পুরুষগণের চরিতকথা রচনা করে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে 'আর্য্যপাঠ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আর 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্তৃকও সেই উদ্দেশ্যে দু'-একখানি সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হয়। তার একখানির নাম 'সুখপাঠ'। ঐ গ্রন্থগুলি ছাড়াও আরও কয়েকজন কয়েকখানি সাহিত্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় থেকেই শিশু-সাহিত্যে মৌলিক রচনার দিকেই ঝোঁক দেখা দেয় এবং তখনকার অধিকাংশ শিশু-সাহিত্য রচয়িতা সেই পথ অনুসরণ করেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র তো সাহিত্য রচনায় বরাবরই নিজস্ব পথে চলেন। তাঁর 'সুখপাঠে'র একটি রচনার কিঞ্চিৎ পাঠেই বোঝা যাবে তাঁর রচনা শিশু-সাহিত্যের কিরূপ উপযোগী ছিল :

> ··· একদা শাঁওতাল পরগণার দুইজন জমিদারের একখণ্ড ভূমি লইয়া বিবাদ হয়। উভয়েই ভূমিখণ্ড আপনার বলিয়া দখল করিতে চেষ্টা করেন। ইহা লইয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। একজন জমিদার মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহার এক শাঁওতাল প্রজাকে ধরিয়া আনিলেন। শাঁওতালের উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। একদিকে জমিদারের কথা না শুনিলে তিনি রুষ্ট হইবেন এই ভয় হইল, অপর দিকে তাহার অভ্যন্তর হইতে বিবেক বলিতে লাগিল, 'ছি! এমন কাজ করিস না।' ···

এ যাবৎ বাংলার শিশু-সাহিত্যে কোনও মুসলমান সাহিত্যিকের দেখা আমরা পাই নি। কিন্তু কবি মোজাম্মেল হক শিশুপাঠকগণের জন্য কয়েকটি কবিতা রচনা করে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'পদ্যশিক্ষা' নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে আরও দু'-একজনের কবিতা সংকলিত হয়, কিন্তু রচয়িতাগণের নামোল্লেখ না থাকায় কোনটা কার বোঝা দুঃসাধ্য। মনে হয়, সবগুলিই কবি মোজাম্মেল হকের রচনা। কিন্তু তিনিই বাংলার শিশু-সাহিত্যে প্রথম মুসলমান সাহিত্যিক। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি :

প্রাতঃ

রজনী হইল ভোর, দেখ শিশুগণ,
চারিদিকে নাহি আর আঁধার তেমন।
বাসা থেকে পাখিগণ বাহির হইয়া,
বিভুগুণ গান করে শাখায় বসিয়া।
ধীরে ধীরে বহিতেছে সুশীতল বায়ু,
সেবিলে জুড়ায় দেহ, বাড়ে পরমায়ু।
উপবন করি আলো ফুটিয়াছে ফুল,
মধুকর মধুপানে হতেছে আকুল।
পড়েছে শিশিরবিন্দু গাছের উপরে,
দেখিলে আনন্দ বাড়ে মনের ভিতরে।
লোহিত বরণ রবি উদয় হইল,
হরষে জগত যেন হাসিতে লাগিল।
পড়িল সোনার আভা গাছের পাতায়,
সরসে কমল দল কিবা শোভা পায়।
বিছানা হইতে জাগি উঠি নরগণে,
আপন আপন কাজ করে সযতনে।
অতএব শিশুগণ! এমন সময়,
আলস্যে শুইয়া থাকা উচিত ত নয়।
উঠ সবে এক মনে ঈশ্বরে স্মরিয়া,
বসে যাও পড়িবার পুস্তক লইয়া।

মন দিয়া লেখাপড়া শিখিলে এখন,
পরেতে আনন্দে কাল করিবে যাপন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত প্রভাতী কবিতাটির সঙ্গে আলোচ্য কবিতাটি তুলনীয়। তার সঙ্গে যতটা পার্থক্য আছে বর্ণনা ও ভাবের মিল আছে তার চেয়ে বেশি। গ্রন্থখানির এক অংশে কতকগুলি 'নীতি কবিতা'ও আছে। সম্ভবত ডিরেক্টর বাহাদুরগণের অনুরোধের ফলে সেগুলির জন্ম।

আবার এই সময়ে, ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে, স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত 'গল্পস্বল্প' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে নীতিশিক্ষা দান। জানি না ডিরেক্টর বাহাদুরগণ গল্পস্বল্পেও ভর করেছিলেন কি না! মনে হয়, করে থাকবেন। কারণ, গ্রন্থখানিতে পাঠ্যপুস্তকের মতো গদ্য-পদ্য উভয়ই ছিল। গদ্যগুলির রচনা মৌলিক, ভাষা স্বচ্ছ, জড়তাহীন। রচনার বিষয় সাধারণ, নিতান্ত ঘরোয়া। এই রকমের ঘরোয়া বিষয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রচনায়ও ছিল। সে তো প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। যা কাছের, যা ঘরোয়া, যা সরল তাই বালক-বালিকাগণের পক্ষে সহজগ্রাহ্য। গ্রন্থখানির একটি কবিতা বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য। এমন বর্ণনাত্মক কবিতা শিশু-সাহিত্যে অতি অল্পই রচিত হয়েছে। কবিতাটি পাঠকচিত্তে দ্বিপ্রহরের প্রশান্তি বিস্তার করে শেষ চরণটিতে উদাস করে দেয়। এর আবেদন সার্বজনীন।

দ্বি-প্রহর।

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক,
শ্রান্তিভরে অনিমিখ
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা।
রবির অনল কর,
শীতলিতে কলেবর
সরোবরে করিতেছে খেলা।

বায়ু বহে স্বন স্বন,
বিকম্পিত উপবন,
ঘুঘু ডাকে সকরুণ ডাক।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
কোথা হতে উঠে ডেকে
কঠোর গম্ভীরস্বরে কাক।

নীল নীলিমার গায়,
শাদা মেঘ ভেসে যায়,
চিল উড়ে পাতার সমান।
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখী
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি
মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।

মুকুলিত আম্র শাখে,
পল্লবিত তরু থাকে
কুহু কুহু কোকিল কুহরে।
হিল্লোলিত সরো-কায়া
ঘুমায় গাছের ছায়া
গাভী নামি জল পান করে।

এলোচুলে মেয়েগুলি
কলস কোমরে তুলি
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে
দূরে মাঠে গরু ফেলে
কুঞ্জবনে বাঁশরি বাজায়।

কবিতাটি কাল অতিক্রম করে এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বিশেষ করে শিশুপাঠ্য গ্রন্থে স্থান পায় ও পঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর-যুগের এ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ দেখা গেল তার অধিকাংশই গদ্য ও অনুবাদ। এই সময়ের মধ্যে যতগুলি শিশুপাঠ্য সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়েছে (শতাব্দীর শিশুপাঠ্য সাময়িক-পত্র

দ্রষ্টব্য) সেগুলিও গদ্যপ্রধান। কাজেই শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যে বিদ্যাসাগর-যুগ গদ্য ও অনুবাদপ্রধান যুগ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অমর লেখনীই গদ্যের উৎসপথ উন্মুক্ত করে এবং গদ্যে কলা-নৈপুণ্য প্রদান করে। সেই পথেই ও সেই আদর্শে তা ক্রমে স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীলতা লাভ করে মুক্ত প্রবাহিনীর মতো প্রবাহিত হয় একথা বললেও সব বলা হয় না। এই যুগেই জীবনচরিত, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ইতিহাস ও ছোটবড় গল্প রচিত হয়, যেগুলি বাংলার শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ এবং পরবর্তীকালের শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি দৃঢ় করেছে। আবার এই যুগেই কতকগুলি শাশ্বত কবিতার জন্ম। তবুও পত্রিকার ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় আর সবই ছিল বিদ্যায়তনের চৌহদ্দীর মধ্যে সংযত এবং নিছক শিক্ষামূলক। তার কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। পাঠ্য-পুস্ত কর নিগড় মুক্ত করে শিশু-সাহিত্যকে মুক্তপথে স্বেচ্ছায় চালানো ও চ ার পথ করে দেওয়া কম শক্তি, সাহস এবং প্রতিভার প্রয়োজন নয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন তদুপযোগী সামাজিক পরিবেশ। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ তদুপযোগী না হোলেও শিশু-সাহিত্যকে নূতন পথে পরিচালিত করেছিলেন বাংলার এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিশু-সাহিত্য রচয়িতা, যাঁর কথা যথাস্থানে বলা হয়েছে।

তবে একটা কথা এই যে, বিদ্যাসাগর-যুগে এখনকার মতো বিদ্যালয়ের কোনও সরকারী পাঠ্যক্রম ছিল না, গ্রন্থ রচয়িতাগণ শিক্ষাদানোদ্দেশ্য সত্ত্বেও রচনা বিষয়ে ছিলেন স্বাধীন। কাজেই রচনা ছিল কিছু পরিমাণে বাঁধাধরা পথমুক্ত। আর, বিশেষ করে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই মুক্তপথের পথিক।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ পৃষ্ঠা ১৯৭ ॥
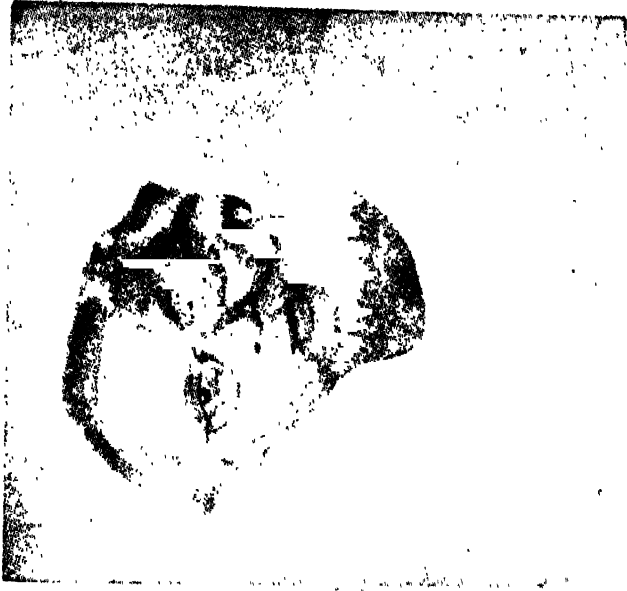
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ॥ পৃষ্ঠা ২২৫ ॥

॥ গ্রন্থ-প্রসঙ্গ ॥

তিন

বিদ্যাসাগরোত্তর যুগ

॥ ১৮৯১ খৃঃ অঃ—১৯১৮ ॥

বিদ্যাসাগরোত্তর যুগ বাংলার শিশু-সাহিত্যে কবিতা ও গল্প-সাহিত্যের যুগ। আর এই যুগের প্রারম্ভ যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত 'হাসি ও খেলা' নামে গ্রন্থখানি থেকে। গ্রন্থখানির প্রকাশকাল, ১৮৯১ খৃস্টাব্দ জানুয়ারি। গ্রন্থভূমিকায় রচয়িতা লিখছেন :

> আমাদের দেশে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কারপ্রদান-যোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে, শীঘ্রই 'ছবি ও গল্প' নামে আরও একখানি সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।…

স্কুল-বুক সোসাইটি গোড়ার দিকে 'পুরস্কার প্রদানযোগ্য' গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা করেন। কিন্তু তা পূরণ হয় না। আবার, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'জীবন আদর্শ' (১৮৬৯ খৃঃ) নামে পুস্তকখানি রচনা করেন গৃহে ও বিদ্যালয়ে পাঠোদ্দেশ্যে। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ যা রচনা করলেন তা সাহিত্যশ্রেণীর অন্তর্গত এবং গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদান-যোগ্য। গ্রন্থখানির রচনা, সজ্জা, বিষয়, সমস্তই বিদ্যাসাগর-যুগের বালক-বালিকাপাঠ্য সাহিত্য পুস্তক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দীর মধ্যে এমন গ্রন্থের স্থান হয় না, সেদিনও না আজও না।

গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার সাধনায় লিখছেন :

> …বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই ; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।…
>
> …আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে ; নতুবা বাঙ্গালীর ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টি-সাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।
>
> হাসি ও খেলা বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।…

কিন্তু তখনকার বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাকেই আদর্শ-রূপে গ্রহণ করে যোগীন্দ্রনাথ গ্রন্থে কবিতা, ছড়া, গল্প, জীব-জন্তুর বিবরণ সম্বলিত প্রবন্ধ, ধাঁধাঁ, অঙ্ক ও চিঠিপত্র সন্নিবেশিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল একরঙা মোটা রেখায় আঁকা কতকগুলি ছবি। কাজেই দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা-গুলিই তাঁর পথ সুগম ও ক্ষেত্র রচনা করেছিল। তথাপি তিনিই বিদ্যাসাগরোত্তর যুগের পথিকৃৎ। এই গ্রন্থে উপেন্দ্রকিশোর, প্রমদা-চরণ, রাজকৃষ্ণ রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও যোগেন্দ্রনাথ বসুর গদ্য ও পদ্য রচনা আছে, যেগুলির কয়েকটি আজও বালক-বালিকারা সানন্দে পাঠ করে। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত হোল :

সোনামণির রাগ।

যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ী যায়,
মায়ের উপর রাগ হয়েছে থাকবে না হেথায়
দিন রাত দুরন্তপনা
করে' করে' ঘুরবে সোনা,

বল্‌তে কিছু পাবে না ক তোমরা তবু তায়—
যায় রে যায় সোনামণি মামার বাড়ী যায়।

এই কবিতাটি ঘুমপাড়ানী ছড়ার মতোই মায়েদের মুখে মুখে এক সময়ে ঘুরেছে এবং এর গুঞ্জন আজও একেবারে স্তব্ধ হয় নি যদিও একালে শহুরে মায়েদের মুখে ছড়া আর শোনা যায় না। তবে ঐ ছড়াটি মুখে মুখে কিছু অদল-বদল হয়েছে।

বাংলার লোকসাহিত্য বিরাট। এ যাবৎ তার অতি সামান্য অংশই উপকথা, রূপকথা, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প ইত্যাদি নামে সংগৃহীত, লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বালক-বালিকাদের জন্য কোনও রূপকথার বইএর সন্ধান আমরা পাই না। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে যেখানি প্রকাশিত হয় সেখানি বাংলার কথা-সাহিত্যে একখানি সম্পদস্বরূপ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতেই এই 'হাসি ও খেলা'য় যোগীন্দ্রনাথ বালক-বালিকাগণের জন্য প্রথম একটি উপকথা রচনা করেন। সেটি বিখ্যাত 'সাতভাই চম্পা'। সেই গল্পটির কিঞ্চিৎ উদ্ধারযোগ্য :

…ফুলগুলি দেখিয়া মালীর বড়ই আনন্দ হইল ; কিন্তু সে যেই হাত বাড়াইয়াছে, অমনি পারুল ফুলটি চাঁপা ফুলগুলিকে বলিয়া উঠিল :—

সাত ভাই চম্পা জাগ রে !

চাঁপারা উত্তর করিল :—

কেন বোন পারুল ডাক রে ?

পা। রাজার মালী এসেছে,
ফুল দিবে কি না দিবে ?

চাঁ। না দিব না দিব ফুল,
উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজা,
তবে দিব ফুল।

ফুলগুলির কথা শুনিয়া মালী তো একেবারে অবাক ! সে রাজাকে গিয়া সকল কথা বলিল।…

উপেন্দ্রকিশোরের 'মজন্তালী'ও উপকথা শ্রেণীর গল্প। এই গ্রন্থের পূর্বে চলিত-বাঙলায় রচিত গল্প-প্রবন্ধ দেখা যায় না ; গল্পের সংলাপেও তখনকার কেতাবী বাঙলা ব্যবহৃত হোত। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথই প্রথম বালক-বালিকাপাঠ্য গ্রন্থে চলিত বাঙলা ব্যবহার করেন। গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় গদ্য রচনাটির ভাষা কথ্য। প্রথমটির কিয়দংশ এই :

ও কি খোকাবাবু, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে 'ভুলোকে' মারতে যাচ্ছ! ছিঃ, অমন কুকুরটিকে কষ্ট দিতে আছে? তাই বুঝি সেদিন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লে, 'ভুলো' তোমাকে কামড়াতে এসেছিল। তা আসবে না কেন! তুমি তাকে মারবে, আর সে তোমাকে ভালবাসবে? ···

উপেন্দ্রকিশোরও তাঁর গল্পটির মধ্যে সংলাপে মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন :

···নদীর ওপারে প্রকাণ্ড বন, তাহাতে খুব বড় বড় জন্তু থাকে। বাঘিনী বলিল, "মজন্তালী মশাই, এ পারের ছোট জানোয়ারে আপনার মত বীরের পেট ভরবে কেন? চলুন, ওপারে যাই, বড় বড় জন্তু মেরে খাবেন!" মজন্তালী বলিল, "ঠিক বলেছিস্—চল্।"

বাঘিনী তাহার বাচ্ছা লইয়া খুব স্ফূর্ত্তির সহিত নদী পার হইল, কিন্তু ডাঙ্গায় উঠিয়া আর মজন্তালীকে দেখিতে পায় না। সে বেচারা নদীতে নামিয়াই তলাইয়া গিয়াছিল! ···

আমরা গ্রন্থখানির প্রথম দিককার কোনও সংস্করণ দেখতে পাই নি। একবিংশ সংস্করণের একখানি গ্রন্থ দেখেছি এবং মনে হয়, যোগীন্দ্রনাথ গ্রন্থে কিছু অদল-বদল করেছিলেন। কারণ, তাঁর 'চিঠি-পত্রে' পিতাকে খোকার পত্রে—

আনবে তুমি মোটর গাড়ী,
ধোঁয়ার মাঝে চাকা নাড়ি,
চলবে কলে ছুটে,

এই চরণ কয়টিতে ১৮৯১ খৃস্টাব্দে ইংরেজ-শাসিত ভারতের রাজধানী খাস কলকাতা শহরের রাজপথের দৃশ্য অঙ্কিত হয় নি। এ হোল এখনকার দৃশ্য ও আবদার। কারণ তখন গাড়ি-পালকির যুগ। ট্যাক্সির বদলে ছ্যাকরাগাড়ি, সুদৃশ্য মোটরের বদলে জমকালো চৌঘুড়ি, রিক্সার বদলে ডুলি-পালকি সওয়ারি বইতো। আর মানুষ এখনও যেমনি ভারবাহী পশুর কাজ করে তখনও করতো তেমনি। তার বদলেছে মাত্র বহনের আধার।

১৮৯১ খৃস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ'। কিন্তু গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ঠিক জানুয়ারি কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কারণ, গ্রন্থখানির ভূমিকার তারিখ 'শক (?) ১৮৯২' এবং নামপৃষ্ঠায় তারিখ '১৮৯৪'। আর গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাপত্রের তারিখ, '২৫শে জানুয়ারি, ১৮৯১'। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যেখানি দেখেছি তাতে ঐ রকমই আছে। আবার সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় গ্রন্থখানি প্রকাশের তারিখ, 'জানুয়ারি, ১৮৯১'! সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা-পত্রের তারিখই গ্রন্থের প্রকাশকাল ধরা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারকে লিখছেন :

> তোমার প্রণীত শিশুরঞ্জন রামায়ণ দেখিয়া প্রীত হইলাম। কিন্তু ইহা বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত না হইলে, "প্রীত হইলাম" বলা সার্থক হয় না। এখনকার শিশুরা রুসিয়ার পিটর বা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ইতিহাস বেশ জানে, কিন্তু দশরথ বা জনক রাজার নাম শুনিলে আকাশ হইতে পড়ে। যাঁহারা বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করেন, তাহাতে তাঁহারা ক্ষতি বোধ করেন না। না করুন, কিন্তু রামায়ণে যে উচ্চনীতি আছে, তাহার শিক্ষায় যে বালকেরা বঞ্চিত হয়, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। ভরসা করি, তোমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে সে অভাব মোচন হইবে। ইহা বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী বটে। ...

গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে পাঠ্য হয় কি না আমাদের জানা নেই। নবকৃষ্ণ

রামায়ণের বিশেষ ঘটনাগুলি পদ্যে গ্রথিত করে গ্রন্থখানি রচনা করেন। তার একটি এই :

সীতার বাল্মীকি আশ্রমে অবস্থান।

কানন মাঝার শুনি হাহাকার,
তপস্বিকুমারগণ,
হইয়া বিস্মিত আইল ত্বরিত
আগ্রহ-পূরিত মন।
দেখিল কামিনী, ভুবন-মোহিনী,
বসি একাকিনী বনে,
শোকাকুল মন, আনত আনন,
কাঁদেন আপন মনে,
সবে তা দেখিয়া, চলিল ছুটিয়া,
বাল্মীকি বসিয়া যথা,
বিষাদে বিকল, তাঁরে অবিকল,
কহিল সকল কথা।
শিশুদের ভাষে, বুঝিয়া আভাসে,
সীতার সকাশে গিয়া,
মুনি মহামনা, ঘুচাতে বেদনা,
কহিলা সান্ত্বনা দিয়া,
"জানি গো মা সতী ! কেন যে সম্প্রতি
বন-মাঝে গতি তোর,
যে ব্যথা মরমে, যাবে কি জনমে,
আয় মা ! আশ্রমে মোর।"
এইরূপে তাঁর লঘু দুঃখ-ভার,
করিয়া সুধার ভাষে,
যতনে লইয়া গেলেন চলিয়া
আপন কুটীর বাসে।

কবিতাটিতে কয়েকটি কঠিন শব্দের ব্যবহার থাকলেও বিষয়টির মধ্যে জটিলতা ও ভাবের নিগূঢ়তা নেই, আছে শান্ত করুণ রস, পাঠ

করতে করতে যা স্বতঃই অন্তরে সঞ্চারিত হয়। সমগ্র গ্রন্থখানিতেই একটি স্নিগ্ধ মধুর রসধারা বহমানা। সেজন্য এখানি সত্যকারের সাহিত্য গ্রন্থ। এই ভাবে বিদ্যাসাগরোত্তর যুগের শিশু-সাহিত্য বহু সাহিত্য গ্রন্থে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'কঙ্কাবতী' নামে উপন্যাসখানিকে কেউ কেউ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বলার পক্ষে হোলেও আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হোতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় (দ্বিতীয় বর্ষ—প্রথম ভাগ—ফাল্গুন, ১২৯১) কঙ্কাবতীর যে সমালোচনা করেছেন তাতেও গ্রন্থখানিকে স্পষ্টত বালক-বালিকাদের পাঠ্য বলেন নি। সমালোচনার একস্থানে মাত্র এইটুকু বলেছেন :

> আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরল গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই লিখিতে পারেন। ···

বাংলার লোকসাহিত্যে 'কঙ্কাবতী'র যে করুণ গল্পটি আছে তা বালক-বালিকারা অনেকেই গৃহে শুনে থাকে। তার সুন্দর সকরুণ ছড়াও অনেকেই জানে। গল্পটির মধ্যে অসম্ভাব্যতা থাকায় অবিশ্বাস্য; যা সম্ভব ও বিশ্বাস্য ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থের উপজীব্য তাই এ কথা তিনি প্রারম্ভেই ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থখানি দু' ভাগে বিভক্ত কিন্তু আমাদের মতে কোনও ভাগই বালক-বালিকাদের উপযোগী নয়। ত্রৈলোক্যনাথ তাদের জন্যও এই সামাজিক উপন্যাসখানি রচনা করেন নি। প্রথম ভাগে সোজাসুজি এবং দ্বিতীয় ভাগে কতকটা রূপকথার মাধ্যমে বাংলার তদানীন্তন যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তা বয়স্কদেরকেই নিজদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে। ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী'র ভূমিকায় ক্ষোভের সঙ্গে লিখছেন :

...বাঙ্গালা দেশের পিতামাতারা নিজেদের জীবনবৃত্তান্তকে ভূত-ভূতিনীর গল্প মনে করিয়া নিরতিশয় অবজ্ঞার সহিত আপন আপন পুত্র কন্যার হাতে সমর্পণ করিলেন। কাজেই উহা শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ হইয়া রহিল। এবং অনতিকাল পরে শিশু ও বয়স্ক কাহারও পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না।

দেখা যাচ্ছে, ডক্টর ভট্টাচার্যের মতেও গ্রন্থখানি বালক-বালিকাদের নয়, তাদের পিতামাতার জন্য। প্রায় বিশ বৎসর পরে কবি সুকুমার রায়ও ব্যঙ্গের কষাঘাতে বাঙালীকে নিজ বেদনাদায়ক অবস্থা সম্বন্ধে এমনি সচেতন করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁর রচনার রূপ ছিল শিশু-সাহিত্যের এবং রচনাগুলি প্রকাশিত হয় শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকায়। সেগুলির পাঠকও ছিল শিশু ও কিশোর। কাজেই সেগুলি শিশুসাহিত্য-রূপেই বাঙলা সাহিত্যে রয়ে গেল :

যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থখানির তিন-চার বৎসর পরে বালক-বালিকাদের জন্য রচিত যে কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই সেগুলির মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের ১৮৯৪-৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'ছেলেদের রামায়ণ' এবং অবনীন্দ্রনাথের ঐ বৎসরেই প্রকাশিত 'শকুন্তলা' আজও সানন্দে পঠিত হয়। গ্রন্থগুলির প্রথম দিককার কোনও সংস্করণ আমাদের হাতে আসে নি। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা ও 'নব্যভারতে'র সমালোচনার উপর প্রকাশকালের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে। প্রায় ঐ সময়েই, ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে (?) তিন-চারখানি চরিতকথাও প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'চরিতমালা' (১ম ও ২য়) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কেবল দেশীয় গুণী ব্যক্তিগণের জীবনকথা অতি সহজ ভাষায় রচনা করা হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় যেমন প্রারম্ভে তেমনি শেষ দিকে বরাবরই শিশুসুলভ সারল্য ও মধুরতা দেখা যায়। রচনাকালে আত্ম-তৃপ্তির চেয়ে সুকুমারমতি পাঠকমহলের চিত্তরঞ্জনের দিকে দৃষ্টিই যেন তাঁর অধিক ছিল। সেজন্য প্রত্যেকটি রচনা আনন্দরসে পরিপূর্ণ শিশুপাঠ্য সাহিত্য। একটি বয়সের বালক-বালিকারাই এই সাহিত্যের
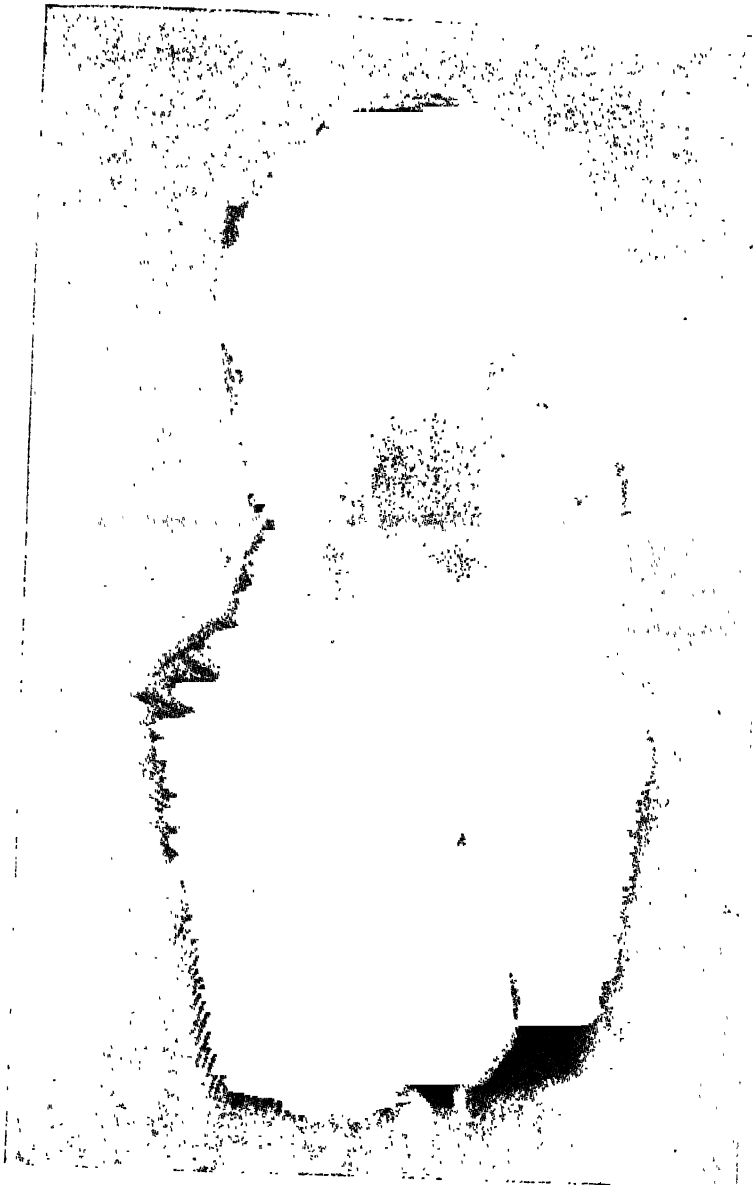
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠক। যোগীন্দ্রনাথ, নবকৃষ্ণ, পরে দক্ষিণারঞ্জনও এই স্তরের অনবদ্য শাশ্বত সাহিত্য রচনা করেছেন। জীবন ও জগতের পরিচয় যারা সবে লাভ করছে, যাদের অপরিণত মন কল্পনার লঘু পাখায় ভর করে সম্ভব অসম্ভবের রাজ্যে বিচরণ করে, সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের আনন্দ ও শিক্ষাদান সুকঠিন কাজ। কিন্তু এঁরা সকলেই সফলকর্মী। এঁদেরই সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নামও যুক্ত না করলে মস্ত ফাঁক থাকে। কিন্তু 'রাজকাহিনী'তে তিনি বয়সের সীমা অতিক্রম করেছেন। তবে 'রাজকাহিনী' বাংলার শিশু-সাহিত্যে অদ্বিতীয় এবং স্বয়ং রচয়িতারই এমন কোনও রচনা নেই যার সঙ্গে একে সমস্তরে রাখা চলে।

উপেন্দ্রকিশোর 'ছেলেদের রামায়ণে' যে ভাষা ও রচনাশৈলী ব্যবহার করেন তা শিশু-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তিনি লিখছেন :

> …কৈকেয়ী রাণীর একটি দাসী ছিল, তাহার নাম মন্থরা। মন্থরার পিঠ কুঁজো, শরীর বাঁকা ও দেখিতে যতদূর বিশ্রী হইতে হয়। তার মনটাও আবার তেমনি হিংসুক। রাম যেদিন রাজা হইবেন, সেইদিন ভোরবেলা মন্থরা ছাতে উঠিয়াছিল। ছাতে উঠিয়া সে দেখিল যে, চারিদিকে লোকেরা ভারি আনন্দ করিতেছে। ঘর দুয়ার সাজাইয়াছে। গানবাজনা হইতেছে। সকলেই ভাল ভাল পোষাক পরিয়াছে। এ সব দেখিয়া মন্থরা একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গা ও সব কিসের গোলমাল?' সেই দাসী বলিল, 'তাও জান না? আজ যে আমাদের রাম রাজা হবেন।' এ কথা শুনিয়া মন্থরার বড় হিংসা হইল।…

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ মুখের ভাষাকে একেবারে সাহিত্যের আসরে ছড়িয়ে মাতিয়ে দিলেন। তিনি গোটা 'শকুন্তলা'ই লিখলেন মুখের ভাষায়। যোগীন্দ্রনাথ যতখানি বাকি রেখেছিলেন তিনি তা সম্পূর্ণ করলেন। তিনি ছবি লিখতেন আবার লিখেও ছবি আঁকতেন। তাঁর রচনাগুলি লেখা-চিত্র। প্রতি পদে, প্রতি বাক্যে রস ও শ্রী! সকল রচনাই রূপকথার ছাঁচে গড়া।

শকুন্তলায় কণ্বমুনির তপোবনে :

…মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, এর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে, 'হা শকুন্তলা! যো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোনও বনে পড়ে আছে। রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে।

আর শকুন্তলা কি করছে ?—

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে আর ভাবছে—এইবার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কি হল ?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখী ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হল ?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কি হল ?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দুজনে মালাবদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।…

অতঃপর ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'। ক্ষীরের পুতুল মৌলিক রচনা, বাংলার শিশু-সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। এই গ্রন্থখানির পূর্বে এমন কোনও গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই না যেখানির উপজীব্য ও চরিত্রগুলি নূতন সৃষ্টি। কোনও বাস্তব ঘটনা, ঐতিহাসিক চরিত্র বা পৌরাণিক কাহিনী এই গ্রন্থের ভিত্তি না হোলেও এতে রামায়ণের ছাপ স্পষ্ট। দুঃখিনী সীতাকে উদ্ধারের পরম

সহায় ছিল হনুমান। আর ক্ষীরের পুতুলের দুয়োরানীর দুঃখ দূর করলে 'মুখপোড়া বানর'। নির্বাসিতা সীতাকে রামচন্দ্রের পুনর্গ্রহণের অন্যতম কারণ, সীতার সন্তান লবকুশ, আর অনাদৃতা, একান্ত নির্বাসিতা দুয়োরানীকেও পুনর্গ্রহণের মূলে তার পুত্র, ক্ষীরের পুতুল। এই পুতুলটিকে ষষ্ঠীঠাকুরণ ভক্ষণ করে বানরকে দান করলেন, একটি সুন্দর ছেলে। পুত্রলাভ করে রাজা রানীর ওপর খুশী হয়ে তাঁকে ঘরে নিলেন। আর, 'হিংসেয় ছোটরাণী বুক ফেটে মরে গেল।' ক্ষীরের পুতুল রূপকথার ছাঁচে তৈরী তাই উপসংহারে মিলন ও আনন্দ, যে নির্যাতিত তারই জয়। কিন্তু গোড়ার দিকে সুয়োরানীর প্রতি রাজার সোহাগ ও দুয়োরানীর প্রতি অবহেলার চিত্রখানি ও সংলাপ কৈশোরোত্তীর্ণ যারা তাদেরই উপযোগী। দুয়োরানী রাজাকে বললে···'তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল··· মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।' এই অভিমান ও দুঃখ সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ নয় বলেই মনে হয়। অবিশ্যি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ আপন খেয়ালেই সৃষ্টি করতেন। তাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। সেই আনন্দরস সঞ্চারিত হোত পাঠকদের মনেও।

'বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে।' ছেলেদের বর্ণনা দিয়ে রাজ্যটিকে যে বিচিত্র রঙে এঁকেছেন, তা সকল বয়সের বাঙালী পাঠকের পরম উপভোগের। রাজ্যটি আগাগোড়া ঘুমপাড়ানী ও ছেলে ভুলানো ছড়া দিয়ে গড়া বাংলার ছবি—কিন্তু বাংলার শিশু-সাহিত্যে :

> সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো ; সেখানে পাঠশাল নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল তার ধারে শর বন, তেপান্তর মাঠ তারপরে আমকাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়ালমাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে

বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীলে ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ুর পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলে ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে ডুলি চাপিয়ে, কমলাপুলীর দেশে পুঁটুরাণীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলীর দেশ গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোটে, গাছে বসে কেঁচমেচ করে, আর সে-দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ—সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিকচিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে। কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদ মুখে কালি পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে—এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ পাড়ায় কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে—এক কন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দুপাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরু ঠাকুর নিলেন, আর একটি

নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, 'ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।' এ হোল বাংলার ছেলে ভুলানো ঘুম-পাড়ানী ছড়া দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের গড়া বিচিত্র দেশ।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' প্রকাশিত হয়, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে। অবনীন্দ্রনাথ 'বালকসম্পাদিকা'র 'সাতভাই চম্পা' নামে নাটিকাখানির ভূমিকায় লিখছেন :

> ···সেই বালকের আমলের একদল আমরা বড়ো হয়ে আর একদফা বাল্যগ্রন্থাবলী লিখতে সুরু করে দিলুম।
>
> রবিকা লিখলেন নদী, আমি ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, রাজ-কাহিনী, এই সব লেখা চলল। মেজমাও লিখলেন সেই সময় ছেলেদের জন্য সাতভাই চম্পা, টাক ডুমাডুম এই সব বই।···

কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকায় শকুন্তলার প্রকাশকাল ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ এবং ক্ষীরের পুতুলের ১৮৯৬ খৃস্টাব্দ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'সাতভাই চম্পা' ও 'টাক ডুমাডুম ডুম' এই দুই গ্রন্থের প্রকাশকাল যথাক্রমে ৬ই জুন ১৯১০ খৃস্টাব্দ ও ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯১০ খৃস্টাব্দ। কিন্তু উভয় গ্রন্থই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের, রচনা-তালিকাটি পাঠে এইরূপই ধারণা জন্মে অথচ তিনি ছিলেন গ্রন্থ দুখানির প্রকাশক মাত্র। 'সাতভাই চম্পা' এই গ্রন্থ দুখানির পূর্বে প্রকাশিত হয় কি না জানা যায় না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কথায় জানা যায়, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ও তিনি বালকের আমলে উপরোক্ত রচনাগুলির কাজে হাত দেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যে তাঁর ঐ গ্রন্থগুলির পূর্বে বালক-বালিকাদের জন্য আরও গ্রন্থ রচনা করেন এমন ধারণা জন্মে তাঁর 'আমরা বড়ো হয়ে আর এক দফা বাল্যগ্রন্থাবলী লিখতে সুরু করে দিলুম' এই উক্তি থেকে। সে গ্রন্থগুলি কি কি এবং কোথায় গেল? বালক প্রকাশিত হবার পর মাত্র এক বৎসর স্বতন্ত্র ছিল। তারপর

'ভারতী'র সঙ্গে যুক্ত হয়। তাহলে অবনীন্দ্রনাথের 'সেই বালকের আমলে' এই উক্তি থেকে এই কথাই মনে হয়, তাঁরা তিনজনে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে রচনাগুলি লেখেন, কিন্তু রাজকাহিনীর কতক প্রকাশিত হয় 'ভারতী'তে এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় পরে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে কেবলমাত্র মেবারের কয়েকজন রাজার কাহিনী নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'নদী' তাঁর 'শিশু'র অন্তর্গত একটি দীর্ঘ কবিতা। কিন্তু শিশু প্রথমে মোহিতমোহন সেনের রবীন্দ্ররচনা সংকলনের অন্তর্গত একটি অংশরূপে ঐ রচনাতেই ১৯০৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে 'শিশু' নামে স্বতন্ত্র কোনও কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয় না। শিশুর কবিতাবলীও নানা পত্রিকা ও গ্রন্থের সংকলন। তবে এগুলির কতক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা'র পূর্বের রচনা, কিন্তু পরে প্রকাশিত। তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা, এই কারণে আমরা অবনীন্দ্রনাথের গ্রন্থ দুখানির সঙ্গেই আলোচনা করার পক্ষে।

'রাজকাহিনী' রাজস্থানের রাজাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী হোলেও অবনীন্দ্রনাথ রূপকথার ঢঙেই গল্পগুলি রচনা করেছেন, যার ফলে ভাষায় ওজঃ গুণের চেয়ে স্নিগ্ধতাই অধিক। অবনীন্দ্রনাথ গ্রন্থখানিতে বালকের আমলে হাত দেন, এই কারণে আমরা ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে আলোচনা করলাম। গ্রন্থ হিসাবে এখানি অবিশ্যি বিংশ শতকের গোড়ার দিকের। রাজকাহিনীর 'পদ্মিনী'তে পদ্মিনীর সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> ...একদিন রাণা লক্ষ্মণসিংহের কাকা ভীমসিংহ সিংহল দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল করে ক্রমে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনি কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুতরাণী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে-দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ করলে! কি দীন দুঃখীর সামান্য কুটির, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ—এমন সুন্দরী, এ হেন গুণবতী কোথাও নেই।

এই আশ্চর্য্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের একধারে সাদা-পাথরে বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ-অন্তঃপুরে শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময়ে একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান বাদশা আলাউদ্দিন, খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে সরবতের পেয়ালা-হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গজল গাইছিল! বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন—'কি ছাই আরবীগজল! হিন্দুস্থানের গান গাও!' তখন পিয়ারী বেগম নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল—'হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল—তার দোসর নেই, তার জুড়ি নেই। সে কি ফুল! সে কি ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল—চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জ্জন করছিল! কার সাধ্য সে সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য সে রাজার বাগিচার সে ফুল তোলে! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!' আলাউদ্দিন বলে উঠলেন—'আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোন রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোন দেবতাকেও ভয় করি না। পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!' বাঁদী আবার গাইতে লাগল··· 'কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল?—মেবারের রাজপুত বীরের সন্তান—রাণা ভীমসিংহ—নির্ভয়, সুন্দর!···'

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'সাতভাই চম্পা' এবং 'নাপিত ও শেয়ালে'র উপকথা দুটি নাট্যাকারে রূপায়িত করে সম্ভবত ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন ভূমিকা দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। সাতভাই চম্পার সংলাপ তেমন জোরালো নয়, ভাষা কিছু গুরুগম্ভীর। কিন্তু

টাক ডুমাডুমের (নাপিত ও শেয়ালের গল্প—নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমাডুমডুম) রচনা, সংলাপ ও ভাষা শিশুদের উপযোগী বটে। তার :

প্রথম দৃশ্য

…শেয়াল। নাপিত ভায়া! নাপিত ভায়া! ঘরে আছ গো? (ব্যথায় ছটফটানি ইঃ) ও নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া, ওঠো না গো, শিগগির দুয়োর খোলো, শিগগির খোলো—ও—ওঃ!

নাপিত। এত রাত্রে কে ডাকাডাকি করে রে—কে রে তুই?

শেয়াল। ওগো আমি শেয়াল—উ—উ—উঃ, আ—আ—আঃ, গেলুম রে, বাপ্ রে!

নাপিত। তোর কী হয়েছে, এত রাত্রে ডাকাডাকি চেঁচামেচি ঠোকাঠুকি করছিস কেন?

শেয়াল। আমি বেগুন-ক্ষেতে বেগুন খেতে গিয়েছিলুম, আমার নাকে মস্ত একটা কাঁটা বিঁধে গিয়েছে গো, ও—ও—ওঃ!…

কিন্তু পঞ্চম দৃশ্যে বর কর্তৃক শেয়ালকে নিজ বধূদান এবং পরদৃশ্যে শেয়ালে ও ঢুলিতে ঢোলক ও বধূর বিনিময় করার ব্যাপারটা প্রভুর অস্থাবর সম্পত্তি দান ও বিনিময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পত্নীকে অস্থাবর ও ভোগবস্তু রূপে ভাবা বহুকালের সামন্ত-যুগীয় শিক্ষার ফল। তবে রূপকথাগুলিও প্রাচীন। অবিশ্যি বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের দেশে এর বিপরীত বিধিরই কিছু ব্যবস্থা হয়েছে।

এই ভাবে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর (পত্রিকা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বালক-বালিকাদের জন্য ছোট ছোট নাটিকা রচনা করেন, যেগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আনন্দদান।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, 'শিশু' প্রথমে কোনও স্বতন্ত্র কবিতাপুস্তক ছিল না। গ্রন্থখানির কতকগুলি কবিতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত হয়। কিন্তু শিশুর অনেকগুলি কবিতা শিশুদের চেয়ে তাদের জননী ও অভিভাবকগণকেই তৃপ্তি দান করবে। এই সকল কবিতা ঘুম-পাড়ানী-ছেলেভুলানো ছড়াগুলির ঢঙে রচিত। তবুও অর্থবোধ না হোলে শিশুমন কেবল ছন্দ ও শব্দধ্বনিতে মুগ্ধ হোতে পারে না। যেমন :

(ক) তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙিন আঙিয়া। —খেলা

(খ) খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল তাপ-নাশা—
জান কি কেউ কোথা হতে যে
করে সে যাওয়া-আসা? —খোকা

(গ) কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া?
মা তখন জল নিতে ওপাড়ার দীঘিটিতে
গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া। —ঘুমচোরা

(ঘ) বাছারে তোর চক্ষে কেন জল?
কে তোরে যে কি বলেছে
আমায় খুলে বল! —অপযশ
ইত্যাদি।

আর, 'জন্মকথা' কবিতাটিকেও

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?

শিশু-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কবিতাটির অর্থ পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণেরই বোধযোগ্য। মাতৃত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা শিশুমনের উপলব্ধির বিষয় নয়।

শিশু সম্ভব-অসম্ভব বোঝে না। বাইরের জগৎকে সে দেখে, এবং তার ইচ্ছামতো ভোগ করতে ও জানতে চায়। তার মনের মতো করে সে মনোজগৎ গড়ে, বাইরের জগৎকেও ইচ্ছামতো গড়তে উন্মুখ। তার কল্পনা এমনি বিচিত্র যে সে নিজে তো তাতে আনন্দ ভোগ করেই, পরিণত বয়স্ক যারা তারাও তার আভাসে আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করে থাকে। শিশুর কল্পনা দিয়ে রচিত কবিতা 'শিশু'র কবিতাগুলির পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেউ রচনা করেছিলেন, এমন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। রবীন্দ্রনাথের এই বিবিধ ছন্দের রচনাগুলির অনুসরণেও কেউ ১৯১৮ খৃস্টাব্দের পূর্বে সমর্থ হন নি। পরবর্তীকাল আমাদের আলোচ্য নয়। বাংলার শিশু-সাহিত্যে এই অতুলনীয় কবিতাগুলিতে খান কয়েক পল্লীচিত্র আছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার পল্লীদৃশ্যও আছে। 'নদী' কবিতাটি নদীর মতোই বেগময়ী, দীর্ঘ ও বর্ণনাত্মক। এর পরে একদা প্রভাতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়। বহুজনপঠিত এই গ্রন্থখানির অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথও শিশু-সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং এর কবিতা-সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার ও পুষ্টিদান করেছিলেন। মানবসমাজে, শিশু ও বাংলার শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' চিরকালের।

সেকালের কলকাতার একটি পল্লীচিত্র :

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
    আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
    ফেরি-ওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চা-ই চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুসি,
যখন খুসি যায় সে বাড়ি গিয়ে
    নাই কো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে শেলেট্ ফেলে দিয়ে
    অম্‌নি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।

আবার, একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমারে ঘুম পাড়াতে চায়।
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি পরে পাহারা-ওলা যায়।
আঁধার গলি লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিটমিটিয়ে জ্বলে,
লাণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়।
রাত হয়ে যায় দশটা এগারোটা
কেউ ত কিছু বলে না তার লাগি!
ইচ্ছে করে পাহারা-ওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি! —বিচিত্র সাধ

গ্রামের ছবি :

আমার যেতে ইচ্ছা করে
নদীটির ঐ পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকা
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে,
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধ্যে হ'লে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে;
শুধু রাত দুপুরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার পারে।
মা, যদি হও রাজি
বড় হ'লে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি! —মাঝি

আবার, কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দুবেলা সকালে সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাই-মাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট ;
নৌকা ভরিয়া রয়েছে ঘাট ;
মাঠে কলাই শরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ ;
কোথাও নিবিড় আমের বনে
শালিখ্ চরিছে আপন মনে।
কোথাও ধুধু করে বালুচর
সেথায় গাঙশালিখের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারাদিন বকাবকি।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।
কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে
ঘন আমকাঁঠালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে। —নদী

এই নদীর পর একদা প্রভাতবেলায় হঠাৎ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়। উনবিংশ্ শতাব্দীর শেষাংশেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার আবার একখানি গ্রন্থ রচনা করে শিশু-সাহিত্য ও শিক্ষাজগতে যুগান্তকারী কীর্তি স্থাপন করেন। এই গ্রন্থখানি হোল, 'হাসিখুসি' (১ম ভাগ)। গ্রন্থখানির

প্রকাশকাল ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ। এরই এক বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁরই রচিত 'রাঙ্গাছবি'। কিন্তু রাঙ্গাছবি তাঁরই হাসি ও খেলার চমৎকার প্রতিচ্ছবি। এই গ্রন্থের সকল রচনাই সরকার মহাশয়ের, আর কারও নয়। রাঙ্গাছবির গদ্য, পদ্য, চিত্র সমস্তই শিশুদের উপযোগী। যেমন অরুণ উষার তরুণ দীপ্তিতে অবশিষ্ট দিবসের আভাস পাওয়া যায়, তেমনি গ্রন্থখানির একটি কবিতা পাঠেই সমগ্র গ্রন্থখানি কি ধরনের তার পরিচয় লাভ হবে। সেকারণ মাত্র একটি কবিতা উদ্ধৃত হোল :

বনের পাখী

বনের পাখী, ডাকাডাকি
করছ কেন বনে ?
সোনার খাঁচায় এস তুমি
রাখব সযতনে !
পাকা পাকা মিষ্ট ফল
তোমায় দেব খেতে
সন্ধ্যাবেলা ঘরে তুলে
বিছানা দেব পেতে !
কচি কচি কোমল গায়ে
বুলিয়ে দেব হাত,
আদর করে সাথে সাথে
রাখব দিন রাত।
মা বলেছে, কারো প্রাণে
কষ্ট দিতে নাই,
বাসতে ভাল তাই ত পাখী
তোমায় আমি চাই।

কবিতাটি ছড়ার ঢঙে রচিত।

হাসিখুসির পূর্বে বর্ণ পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত দেব, পাদ্রী বোমএচ, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু ছড়ার সাহায্যে বর্ণপরিচয় করানোর চেষ্টা যোগীন্দ্রনাথের পূর্বে এঁরা

বা আর কেউই করেন নি। বলতে গেলে ছড়া-সাহিত্যকেই সরকার মহাশয় অক্ষর পরিচয়ের উপায়রূপে গ্রহণ করেন। শিক্ষাবিদের কাছে এই উপায় গ্রাহ্য না হোতে পারে কিন্তু ছন্দ-ধ্বনি ও সুরপিপাসু শিশুর চিত্তে ছড়াটি এমন মায়া রচনা করেছে যে, দীর্ঘ একষট্টি বৎসরেও এর ধ্বনি বাঙালীর ঘরে একদিনও নীরব হয় নি, বরং এর বহু অক্ষম অনুকরণ হোল! 'অ-অজগর আসছে তেড়ে, আ-আমটি আমি খাবো পেড়ে' ইত্যাদি বাঙালী শৈশবে প্রথম শিক্ষার দিনে মাতৃক্রোড়ে বসে মহানন্দে আবৃত্তি করেছে এবং সংখ্যা গণনা-শিক্ষার জন্য 'দশটি ছেলে' নামক ছড়াটি আবৃত্তি করে হারাধনের নয়টি সন্তান-বিয়োগে প্রচুর আনন্দ ও কৌতুকরস উপভোগ করেছে। আবার, ছড়াটি একালে রাজনৈতিক খেলায়ও প্রতিপক্ষীয় দলকে কখনও কখনও ব্যঙ্গ করারও উপায়রূপে গ্রহণ করা হয়। শাশ্বতকালের শিশুচিত্ত গ্রন্থখানির ছড়া-গুঞ্জনে সাড়া দেয়। কাজেই এই গ্রন্থের বিলোপ ঘটা সহজ নয়।

অতঃপর ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় যোগীন্দ্রনাথেরই 'খেলার সাথী'। খেলার সাথীতেও রূপকথা আছে। বাংলার শিশু-সাহিত্যের একাংশ যোগীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ক রচনাবলীতে সমৃদ্ধ, যা থেকে নানা বয়সের বালক-বালিকা অনাবিল আনন্দ ও শিক্ষালাভ করে। যোগীন্দ্রনাথের আর একটি মহৎ কর্ম, বাংলার ছড়াসংগ্রহ।

এই সঙ্কলন গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮৯৯ খৃস্টাব্দ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর গ্রন্থভূমিকায় লিখছেন :

> ···বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।···

রামেন্দ্রসুন্দর ভূমিকায় ছড়াকে 'শিশু-সাহিত্য বা ছড়া-সাহিত্য' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ছড়াকেই আমরা শিশু-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলার পক্ষে নই। এগুলি রচয়িত্রীর দুঃখ, সুখাদি

মনোভাব প্রকাশের উপায় বলেই আমাদের ধারণা হয়। গ্রন্থখানির নাম 'খুকুমণির ছড়া' হোলেও খোকনমণিকে নিয়েই ছড়ার ছড়াছড়ি, খুকুমণির ভাগ্যে দু'-চারটি মাত্র। সেগুলির মধ্যেও একটি এই :

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল ;
শ্যামলা গেল হাটে ;
শ্যামলাদের মেয়ে দুটি
পথে বসে কাঁদে।

আর কেঁদো না, আর কেঁদো না,
ছোলা ভাজা দেবো ;
আবার যদি কাঁদো তবে
তুলে আছাড় দেবো।

খোকনমণির কান্না থামাবার উপায় কিন্তু বিপরীত। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, সেকালে সমাজে ও গৃহে খুকুমণিদের আদর এক রকম ছিল না। তবে সোনার খোকনমণিদের জন্যে রাঙা বৌয়ের চাহিদা ছিল খুব বেশি বটে। বাংলার এই সব ছড়া রচনার কাল নির্ণয় করা সুকঠিন কাজ। মনে হয়, সবই সামন্ত-যুগের রচনা। এই ছড়াগুলি মুখে মুখে কিছু পরিবর্তিতও হয়েছে। এগুলির মধ্যে দুটি-চারটি মুসলমান ও দুটি-চারটি কোম্পানির আমলে রচিত এমন প্রমাণ আছে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম 'শিশু-সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর পূর্বে উনবিংশ শতকে শব্দটি আর কেউই ব্যবহার করেন নি। অন্তত আমরা জানি না।

এই গ্রন্থের পর উনবিংশ শতাব্দীর আর কোনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই না। তাই বলে শিশু-সাহিত্যের উৎসারিত ধারাটির বেগ মন্দীভূত বা শীর্ণকায়া হয় না, বরং অনেকের দানে তা আরও বেগবতী ও পুষ্ট হোতে হোতে জাতীয় চিত্তপথে অগ্রসর হোতে থাকে।

বিংশ শতাব্দী

॥ ১৯০১ খৃঃ অঃ—১৯১৮ খৃঃ অঃ ॥

উনবিংশ শতকে প্রাণিবিদ্যা-সম্বন্ধীয় বালক-বালিকাপাঠ্য গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হোলেও রচয়িতাগণের লক্ষ্য ছিল সেগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা। কিন্তু বিংশ শতকের প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু সে পথ পরিত্যাগ করেন। যোগীন্দ্রনাথ যে পথ প্রদর্শন করেন, তিনিও সেই পথে অগ্রসর হয়ে তাঁর 'জীবজন্তু' নামে প্রাণিবিদ্যা-বিষয়ক সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পদাঙ্ক আরও কেউ কেউ অনুসরণ করেছেন বটে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষা সাবলীল ও অত্যন্ত সহজ ছিল। গ্রন্থের চিত্রগুলিও ছিল উৎকৃষ্ট এবং তদ্দৃষ্টে সহজেই শিশুচিত্তে কৌতূহল ও আনন্দের উদ্রেক হয়। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০১ খৃস্টাব্দে। গ্রন্থে মেরুদণ্ডী প্রাণিগণের বর্ণনা করা হয় এবং প্রাণীটির প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হয় দেশীয় গল্পের সাহায্যে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যথার্থ বৈজ্ঞানিক, কোথাও কিম্বদন্তী বা জনসমাজে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত গালগল্পের তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। গরিলা সম্বন্ধে তিনি লিখছেন :

বনমানুষ

গরিলা।

…গরিলারা দুই তিনটির বেশী এক সঙ্গে থাকে না। এক এক পরিবারের স্ত্রীপুরুষ দুই তিনটি ছানা লইয়া এক একটি দলে বিভক্ত হইয়া বেড়ায়। অন্যান্য বানরের ন্যায় অনেকগুলি একত্র দল বাঁধিয়া বেড়ায় না। আফ্রিকার বনে কলা, পেঁপে, বাদাম ও কুলের মত ফল জন্মে, গরিলারা তাহা খাইয়া জীবনধারণ করে। সমস্ত দিন ইহারা আহারের খোঁজে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রিকালে গাছের উপর দুই তিনটা ডাল বাঁকাইয়া একত্র করিয়া, লতাপাতা দিয়া ঢাকিয়া ঘরের মত তৈয়ার করে।

তাহাতে স্ত্রী-গরিলা আপন ছানার সহিত নিদ্রা যায়। পুরুষ গরিলা সেই গাছের তলায় বসিয়া পাহারা দেয় এবং চিতা বা কেন্দুয়া হইতে নিজের পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকে।...

গরিলার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ অলীক গল্প অনেক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।...

বিদ্যাসাগর-যুগ থেকে বাঙলা গদ্যের ভাষা ইংরেজী-ঘেঁষা হয় এবং ক্রমে তা বহু দেশী-বিদেশী শব্দে পুষ্ট হয়ে নিজপথ তৈরি করে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত হোতে থাকে। আবার, সেই কালেই শিশু-সাহিত্যের ভাষায়ও ক্রমে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় এবং রচয়িতাগণ সেই স্বাতন্ত্র্যই রক্ষা করে চলেন। এজন্য অনুশীলন ও কৌশলের প্রয়োজন হয়। বালক-বালিকাপাঠ্য যে গ্রন্থে বা রচনায় তাদের বোধগম্য, স্বতন্ত্র ভাষার অভাব, তা অনাদৃত হোতে দেখা যায়। অবশ্য রচয়িতার নিপুণতা ও উপজীব্যের চিত্তাকর্ষকতাও সেই সঙ্গে বিবেচ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে বালক-বালিকাপাঠ্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও লেখকের রচনাবলী গ্রন্থকারে প্রকাশিত হোতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু বিংশ শতকের প্রারম্ভে এই দিকে প্রথমে অগ্রসর হন সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তাঁর 'আষাঢ়ে গল্প' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০১ খৃস্টাব্দে। নামটি 'আষাঢ়ে গল্প' হোলেও গ্রন্থের সকল গল্প অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত নয়। ভাষায়ও সকল সময়ে শিশু-সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নি। যা হোক, তাঁর পরই দেখা যায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে। মাত্র তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজগৎ সম্বন্ধে বালক-বালিকাগণকে জ্ঞান-দানের চেষ্টা তিনিই প্রথম করেন। তবে জগতের বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ গ্রন্থভূমিকায় তিনি নিজেই লিখছেন :

অবসরকালে পড়িয়া বালক-বালিকাগণ শিক্ষা ও আনন্দ

লাভ করিবে, এই আশায় এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক হইলেও, সে হিসাবে তাহার কোনরূপ চর্চ্চার চেষ্টা হয় নাই। বালক-বালিকাদিগকে প্রাচীনকালের কাহিনী শুনাইবার জন্যই এই পুস্তক লেখা; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ছেলেদিগকে যেরূপ করিয়া জানোয়ারের গল্প শুনাইলে তাহারা আমোদ পায়, সেইরূপ সহজ কথায় সরলভাবে এই পুস্তকখানি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং সকল কথাই বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে মাপিয়া বলা সম্ভব হয় নাই।···

গ্রন্থখানির নাম ছিল 'সেকালের কথা' এবং প্রকাশকাল ১৯০৩ খৃস্টাব্দ। গ্রন্থের সমস্ত চিত্রই উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা। 'সেকালের কথা' প্রথমে 'মুকুলে' প্রকাশিত হয়। 'আষাঢ়ে গল্পে'রও কতকগুলি গল্প প্রথমে প্রকাশিত হয় 'মুকুলে'। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর রচনাটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে গ্রন্থখানি তৈরি করেন। উপেন্দ্র-কিশোর সহজ ভাষায়, শিশুর মনের মতো করে তাঁর সাহিত্য রচনা করতেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়েও তার ব্যতিক্রম ছিল না। গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পাঠেই তা বোঝা যাবে :

···প্রথমে যে হস্তীজাতীয় জন্তুর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, পণ্ডিতেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন, ডাইনোথীরিয়ম্, অর্থাৎ ভয়ানক জন্তু। ছবিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অন্ততঃ চেহারায় জন্তুটি নিতান্তই ভয়ানক। এতবড় স্থলচর জন্তু পৃথিবীতে বেশী হয় নাই। এই জন্তুর একটা মাথা পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় তিন হাত লম্বা, আর দুই হাতের বেশী চওড়া। ইহার দাঁত দুটা কেমন অদ্ভুত ছিল, দেখ। এ রকম দাঁত দিয়া উহার কি কাজ হইত, তাহা বলা একটু কঠিন। উহা-দ্বারা গুঁতাইবার সুবিধা খুব কমই দেখা যাইতেছে। তবে গাছের পাতা খাইবার সময় শুঁড় দিয়া বড় বড় ডাল বাঁকাইয়া ঐ দাঁতের দ্বারা তাহা আটকাইয়া রাখার সুবিধাটা বেশ ছিল বোধ হয়। তাহাছাড়া এখনকার মহিষগুলির ন্যায় এই জন্তুও

হয়ত জলে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসিত। ওরূপ অবস্থায় ঘুম পাইলে দাঁতগুলিকে কোন জিনিসে আটকাইয়া নিদ্রা যাওয়া মন্দ ছিল না। নইলে স্রোতে ভাসাইয়া নেওয়া আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, নামটি এবং চেহারাটি ভয়ানক হইলেও ইহার স্বভাব হিংস্র ছিল না। গাছপালাই ইহার একমাত্র আহার ছিল।...

বাংলার বেহুলা, লহনা ও খুল্লনার উপাখ্যান বঙ্গ-সাহিত্যে অক্ষয়। এগুলি বাঙালীর জাতীয় জীবনের চিত্র। এতে কিছু সামাজিক চিত্রও পাওয়া যায়। মহাকাল বস্তুজগতে সকল কিছুই বিনষ্ট করে, কিন্তু মানবমনের সৃষ্ট কাহিনী অক্ষয়। লোক-পরম্পরায় তার কিছু পরিবর্তন ঘটলেও অন্তর্নিহিত সত্য পরিবর্তিত হয় না। খুল্লনা ও লহনার কাহিনী নিয়ে বালক-বালিকাদের জন্য প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খৃস্টাব্দে।

মনোমোহন সেনের স্থান বাংলার শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট হোলেও তাঁর নাম ও সুন্দর কবিতাগ্রন্থ 'খোকার দপ্তর' একালে লোকে বিস্মৃত, অথচ তাঁর রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

'খোকার দপ্তরে'র প্রকাশকাল ১৯০৭ খৃস্টাব্দ; গ্রন্থখানি দুটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। প্রথম খণ্ডের কবিতাগুলি ছিল যুক্তাক্ষরবর্জিত, দ্বিতীয় খণ্ডের কবিতায় যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় কিছুকাল পরে। প্রথম খণ্ডের দুটি কবিতা উদ্ধৃত হোল:

(ক) আঙিনার রোদে বসে মণি চুণী হীরা
তিন বোনে মিলে মিশে খায় গুড় চিঁড়া।

মণি বলে বেশ চিঁড়া, চুণী বেশ গুড়
কচ্ কচ্ মচ্ মচ্ দাঁতে বাজে সুর।

হীরা কেঁদে বলে, 'মাগো, চিলা লাখো তুলি,
আল চিলা খাব না মা, মোলে দাও মুলি।

(খ) গৌরদাস ভৌমিকের চৌচালার ঘরে
মৌমাছিরা লাখে লাখ আছে চাক ধরে।
চুপি চুপি গৌরদাস ঢিল মেরে দৌড়,
চৌদিকে মৌমাছি ধায় ধরিতে সে চৌর।
থাক তার মৌ খাওয়া হুল খেয়ে মরে,
মাটিতে পড়িয়া গৌর গড়াগড়ি করে।

দ্বিতীয় খণ্ডের একটি কবিতা এই :

হলধর তর্কতীর্থ বলে দর্পভরে,—
আমি ভিন্ন সব মূর্খ পৃথিবী ভিতরে।
বর্ণে বর্ণে কত অর্থ আমার কথায়,
দীর্ঘটিকি অনর্থক ধরি নি মাথায়।

কবিতাগুলিতে বানান শিখানোর চেষ্টা স্পষ্ট হোলেও ছন্দ ও বিষয়ে আনন্দের সুর ধ্বনিত। সেজন্য শিশুমন সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং কবিতাগুলি স্মৃতিতে দীর্ঘকাল গুঞ্জন তোলে।

সেন মহাশয়ের 'মোহনভোগ' নামক গ্রন্থখানি আরও পরের রচনা হোলেও এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ ও একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধার অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। কবিতায় গল্প বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অল্পই রচিত হোত। আর, যাও রচিত হোত, তা-ও হাস্যরসাত্মক। মোহনভোগের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিও সেইরূপ :

নাসিকা কহিল, 'চশমা আমার,'
চোখ বলে, 'কভু নয়,'
চশমা লইয়া নাকে আর চোখে
বিষম বিবাদ হয়।
চোখ মনে করে আমারই চশমা,
আমিই তা দিয়ে দেখি,
নাক মনে করে আমারই চশমা
আমি তারে ধরে রাখি।

রাগ করে চোখ হইয়াছে রাঙা,
নাসা ডাকে ঘড়্ ঘড়্,
চশমা আমার, চশমা আমার,
ঝগড়া পরস্পর।
এ চায় উহারে খুব ধরে মারে
কেটে করে খান খান,
অবশেষে দোঁহে করিল নালিশ,
বিচারক হলো কান।
একজন মাত্র উকিল তথায়
আছিল রসনা নামে,
ওকালতনামা গছাইল দোঁহে
বেজায় আক্রা দামে।

১৯০৫ খৃস্টাব্দ বাংলার জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। ইংরেজ শাসনের স্বার্থরক্ষার্থে বাংলাকে তখন দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তার ফলেই বাংলার বিংশ শতকের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত ও স্বদেশী যুগের আরম্ভ। এই ঘটনার এক বৎসর পরে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে (২০শে ভাদ্র, ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'বাঙ্গলার কথাসাহিত্যে'র ভূমিকা রচনা করেন। তাতে লেখেন :

ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের Fairy Tales আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউলে।...

...দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা

দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

ভূমিকাটি রচনার এক বৎসর পরে ১৯০৭ খৃস্টাব্দে (ভাদ্র, ১৩১৪) গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। যে ঢঙে রূপকথাগুলি দক্ষিণাবাবুর কাছে কথিত হয় তিনি সেই ঢঙই বজায় রেখে ভাষাকে কিছু সাধুবেশ পরিয়েছিলেন। এমন কি কথোপকথনেও তা বদল করে তাকে আট-পৌরে করেন নি। যেমন :

> এমনি করিয়া দিন যায়। অরুণ, বরুণ ব্রাহ্মণের সকল বিদ্যা পড়িলেন। কিরণমালা ব্রাহ্মণের ঘর-সংসার হাতে নিলেন।
>
> তখন একদিন তিন ছেলে-মেয়ে ডাকিয়া, তিনজনের মাথায় হাত রাখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'অরুণ, বরুণ, মা কিরণ, সব তোদের রহিল, আমার আর কোন দুঃখ নাই—তোমাদিগে রাখিয়া এখন আমি আর এক রাজ্যে যাই ; সব দেখিয়া শুনিয়া খাইও।' তিন ভাই-বোনে কাঁদিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ স্বর্গে চলিয়া গেলেন।
>
> মনের দুঃখে দিন যায়,—রাজার রাজপুরী অন্ধকার। রাজা বলিলেন,—'না! আমার রাজত্ব পাপে ঘিরিয়াছে। চল, আবার মৃগয়ায় যাইব।' আবার রাজপুরীতে মৃগয়ার ডঙ্কা বাজিল!···

গ্রন্থখানি দক্ষিণারঞ্জন স্ব-অঙ্কিত চিত্রে সজ্জিত করেন। গ্রন্থের কয়েকখানি চিত্র ছিল রঙিন এবং বাঙলা গ্রন্থে এই প্রথম রঙিন চিত্রের ব্যবহার।

দক্ষিণারঞ্জন বিবিধ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর 'আমাল বই', 'চারু ও হারু', 'ছেলেদের আনন্দমেলা', 'আনন্দ গান', 'দাদামশায়ের থলে' (১৯১৪ খৃঃ) ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি বা বাঙ্গালার গীতকথা' ঠাকুরমার ঝুলির মতো পাঠকসমাজে প্রচলিত হয় নি। প্রথমে যোগীন্দ্রনাথ ও পরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ রূপকথা রচনার সূত্রপাত করলেও বাংলার রূপকথাগুলিকে অধিক সংখ্যায় কলমবন্দী করেন দক্ষিণারঞ্জনই। তাঁরই পন্থানুসরণ করে পরে নানাজনে রূপকথা

সংগ্রহ ও নিজস্ব ভাষায় সেগুলিকে রচনা করে বাংলার শিশু-সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন সত্য, কিন্তু ঠাকুরমার ঝুলির আসনখানি অবধি কেউই পৌঁছতে পারেন না। সে-আসন আলপনায়, পদ্মফুলে, মণিমুক্তা-সোনাদানায় ছাপিয়ে কান্নাহাসির সাগরজলে দোতুল। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁরই 'ঠাকুরদাদার ঝুলি বা বাঙ্গালার গীতকথা'। এই গ্রন্থেরই ভূমিকায় দক্ষিণারঞ্জনও 'শিশু-সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন রূপকথা, শিশু-সাহিত্য। কিন্তু ছড়া ও রূপকথায় শিশু-সাহিত্যকে যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তার প্রমাণ এই গ্রন্থেও আছে, বাংলার শিশু-সাহিত্যেও অভাব নেই। বস্তুত শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য নানাজনের প্রচেষ্টায় ততদিনে সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে তা আর সীমাবদ্ধ নয় এবং কারও অনুমোদনেরও অপেক্ষা রাখে না। পাঠকসমাজের রুচির উপর তা প্রভূত পরিমাণে নির্ভরশীল। তারই ফলে বহু গ্রন্থ অনাদৃত, বহু রচনা সমাদৃত ও স্মরণীয় হয়। দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরদাদার ঝুলি পাঠের নয়, কথকের মুখে শোনবার। গীতেই তার রস। কিন্তু সে রস পরিবেশন করতে পারে কয়জনে? কাজেই তার প্রচলন অধিক হোল না।

দক্ষিণারঞ্জনের পূর্বেই বাংলার 'কথাসাহিত্য'কে কলমবন্দী করেন আরও একজন—তিনি পাদ্রী লালবিহারী দে। তাঁরও 'ফোকটেলস্ অফ বেঙ্গল' পাঠকসমাজে, ইঙ্গবঙ্গ পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীকে বাংলার লোকসাহিত্য-সমুদ্রের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় করানো। লোকসাহিত্য শিশু-সাহিত্য নয়। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ফলে তার একাংশ, উপকথাশ্রেণীর সাহিত্য, শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বালক-বালিকারাই তাতে আনন্দ পায়। পরিণতমন পাঠক তাতে আর তৃপ্ত হয় না। এ ঘটনা সকল সভ্য দেশেই স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে। বাঙালীর কাছে লালবিহারী দে-র গ্রন্থের আদর ছিল তার ইংরেজী ভাষার জন্য। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য তা এক সময়ে প্রয়োজনীয় হয়, সাহিত্য

পাঠের আনন্দ রস পানের জন্য নয়। ফোকটেলস্ অফ বেঙ্গল বর্তমানে অধিক সংখ্যক পাঠক পড়েন না, কিন্তু বাংলার রূপকথা চিরসবুজ।

ঠাকুরমার ঝুলি কেবল পাঠকসমাজে আনন্দের রসভাণ্ডার খুলে দেয় নি, লেখকসমাজেও রূপকথা রচনার অনুপ্রেরণা দান করেছে। নতুবা তারপরই তিন-চারখানি উপকথা বা রূপকথা শিশু-সাহিত্যে প্রকাশিত হয় কেন? এইরূপ একখানি গ্রন্থ শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী রচিত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দুস্থানী উপকথা'। গ্রন্থখানি অবশ্য কোনও মৌলিক রচনা নয়, শ্রীশচন্দ্র বসুর 'ফোকটেলস্ অব হিন্দুস্থানে'র বঙ্গানুবাদ। কিন্তু ভাষা এমন স্বচ্ছ ও সাবলীল যে, মনে হয় মৌলিক রচনা। ভাবানুবাদেই রচনার এমন গুণ থাকা সম্ভব। প্রথমেই :

দুই বোকার কথা

একদিন দুই বন্ধু রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তাহারা কিছুদূর গিয়াছে এমন সময় এক বুড়ী তাহাদিগের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিল। বুড়ী কাহাকে সেলাম করিয়াছে এই লইয়া দুই বন্ধুতে ঝগড়া বাধিয়া গেল এবং অনেক তর্ক-বিতর্কের পরেও যখন তাহারা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, তখন তাহারা ঝগড়ার মীমাংসার জন্য বৃদ্ধার নিকট যাওয়াই স্থির করিল। তাহারা বৃদ্ধার পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো বাছা, তুমি একটু দাঁড়াও, আমাদের সন্দেহ দূর করে দাও।" সে তাহাদের চীৎকার শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার? তোমরা এত চীৎকার করছ কেন?"...

গল্পটির আরম্ভ কতকটা আরব্যোপন্যাসের মতো—দুই বোকা একে একে তাদের বোকামির গল্প বলে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বালক-বালিকাদের জন্য একখানি 'আরব্যোপন্যাস' প্রণয়ন করেন। অশ্লীলতার কারণে আরব্যোপন্যাসের সকল স্থান শিশুদের

পাঠোপযোগী নয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গ্রন্থে সে সকল অংশ বাদ দেন। সেজন্য গল্পের অঙ্গহানি হয় না। গ্রন্থখানি এই সময়ের কাছাকাছি এক সময়ে প্রকাশিত হয়।

১৯০৮ খৃস্টাব্দের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কতকগুলি বিদেশী উপকথার একটি ক্ষুদ্র সঙ্কলন করেন। গ্রন্থখানির নাম ছিল 'উপকথা'। গল্পগুলি অ্যানডারসেন ও গ্রিমের উপকথার ভাণ্ডার থেকে সঙ্কলিত হয়। গ্রন্থের উপর যদিও 'শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক অনুবাদিত' মুদ্রিত আছে, তথাপি গল্পগুলি অবিকল অনুবাদ নয়। গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য ছিল নীতিশিক্ষা-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নীতিশিক্ষা ও আনন্দ দান। একটি গল্পের ভাষা নিম্নরূপ :

কাঠুরের মেয়ে।

পাহাড়ের কাছে জঙ্গলে এক কাঠুরে ও তাহার স্ত্রী এক কুঁড়ে ঘরে বাস করিত। ছেলেপিলের মধ্যে তাহাদের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়েটির বয়স যখন ছয় সাত বৎসর, তখন সে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রে মেয়েটি খাইতে না পাইয়া পেটের জ্বালায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; আর তাহার পিতামাতা কাছে বসিয়া বলাবলি করিতেছে, "এখন কি করি, কি করে আপনারা বা বাঁচি, আর মেয়েটিকেই বা কি করে বাঁচাই, মেয়েটা না থাকিলে যে দিকে দুই চক্ষু যায়, দুজনে চলে যেতাম।"···

এই বৎসরেই প্রকাশিত হয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সচিত্র 'জাপানী মানুষ' নামক গল্পপুস্তক। জাপানী মানুষও উপকথা। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গল্পগুলি অনুবাদ করেন না, 'কতকগুলি জাপানী গল্পের ছায়া অবলম্বনে এই গল্প সকল' রচনা করেন। তাই তাঁর মতে 'গল্পগুলিকে সম্পূর্ণ মৌলিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।···' আমাদের মতে তবুও গল্পগুলি 'জাপানী'। প্রথমেই :

উরশিমার গল্প।

উরশিমা—জেলেদের ছেলে—সমুদ্রে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল ; নীলজলের ঢেউয়ে তার নৌকাখানা হেলছে দুলছে আর উরশিমা চুপটি করে বসে ছিপ ফেলে মাছ ধরে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে রেঁধে খায়। কিন্তু সেদিন হল কি না, মাছ না উঠে বঁড়শির মুখে উঠল প্রকাণ্ড একটা কাছিম।···

এই গ্রন্থের দু'বৎসর পরে ১৯১০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় মণিলালেরই 'ঝুমঝুমি'। এই গ্রন্থখানিও সচিত্র ও গদ্যে রচিত ছিল। লেখকের ভাষায় 'ইহাকে জাপানী ফানুসের আর এক পাট বলিলেও চলে'। কিন্তু গ্রন্থখানিতে 'ইঁদুরের মোকর্দ্দমা' নামে পদ্যে একটি গল্প আছে। গল্পটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পদ্যে অনুবাদ করে দেন। বাংলার শিশু-সাহিত্যে সেই তাঁর প্রথম অবদান। তিনি ছান্দসিক ছিলেন, তাই গদ্যকে পদ্যে অনুবাদ করেন। তার কিঞ্চিৎ এই :

···কহে যমরাজ বিড়ালের কথা শুনি,
"বিড়াল খালাস ! ছেড়ে দাও এখখুনি।
যাও পুষি ! তুমি মর্ত্ত্যে বিরাজ কর,
ক্ষেত্রে খামারে অবাধে ইঁদুর ধর।
নেংটি বেটারে রাখ্ তো তুড়ুং ঠুকে,
মিথ্যা নালিশ ! ধর্ম্মের সম্মুখে !"

এত বলি সভা ভঙ্গ করিল যম,
ইঁদুরের পিঠে লাঠি পড়ে দমাদম ;
বিড়াল আবার মর্ত্ত্যে আসিল ফিরে,
গর্ত্তে লুকাতে হ'ল ফের নেংটিরে ;
সে অবধি লোকে বিড়ালে যতন করে,
ইঁদুর বেচারা আঁধারে হাঁপায়ে মরে।

কিন্তু এই সকল গল্প বিদেশী। অবশেষে ১৯১০ খৃস্টাব্দে শরৎকালে, বাঙালীর শারদীয় উৎসবের পূর্বে প্রকাশিত হয় বাংলার

লোকসাহিত্যের আর একটি নূতন সংকলন 'টুনটুনির বই'। গ্রন্থ-ভূমিকায় রচয়িতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখছেন :

কিন্তু সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চাহে, তখন পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোনও স্থানের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই সকল গল্প বলিয়া তাহাদিগকে জাগাইয়া রাখেন। সে সকল শিশু বড় হইয়াও এই গল্পগুলির মিষ্টতা ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকার নিকটেও এগুলি মিষ্ট লাগিবে।···

গল্পগুলি কেবল পূর্ববঙ্গে নয় পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত। গল্পগুলির উপজীব্য বাংলার কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের নয়। রচনায় উপেন্দ্রকিশোর নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করেছেন বলেই মনে হয়। সাজপোশাক নেই, ছিমছাম আটপৌরে সাজে উপজীব্যকে সাজিয়েছেন তিনি। শেষ গল্পটি এই :

পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর কথা।

এক পিঁপড়ে আর তার পিঁপড়ী ছিল। পিঁপড়ী বল্ল, 'পিঁপড়ে, আমি বাপের বাড়ী যাব নৌকা নিয়ে এস।'

পিঁপড়ে একটি ধানের খোসা ভাসিয়ে নিয়ে এল। পিঁপড়ী তা দেখে বল্ল, 'কি সুন্দর নৌকা! এস পিঁপড়ে আমাকে বাপের বাড়ী নিয়ে চল।'

পিঁপড়ে আর পিঁপড়ী ধানের খোসার নৌকায় উঠে বসে নৌকা ছেড়ে দিল। খানিক দূর গিয়ে সেই নৌকা চড়ায় আটকে গেল। তখন পিঁপড়ে বল্ল,

'পিঁপড়ী, আমিও ঠেলি, তুমিও ঠেল!'

আমার কথাও ফুরিয়ে গেল!

'টুনটুনির বই'য়ের গল্পগুলির উদ্ভব পল্লীবাংলায় এবং রচয়িতাগণ ছিলেন সাধারণ ঘরের মানুষ। সেজন্য সাধারণ গৃহস্থ ও চাষী-মজুরের

চিত্র এতে সহজভাবে অঙ্কিত। মনে হয়, এগুলি শিশুদের জন্যই রচিত হয়। সম্ভবত এই সময়ের কাছাকাছি প্রকাশিত হয় জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তের দেশীয় উপকথার সংকলন, 'উপকথা'। কিন্তু রূপকথার বিশেষ ভাষা সকলের আয়ত্তে আসে না। গুপ্ত মহাশয়ের গ্রন্থখানি সেজন্য সমাদৃত হয় না।

১৯১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শিশুপাঠ্য পত্রিকায় দু'-একখানি নাটক প্রকাশিত হোলেও সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয় এবং কোথাও যে অভিনীত হয়েছে, এমন প্রমাণ আমরা পাই না। তখনকার দিনে নাটক-যাত্রা তো দূরের কথা, গানবাজনা করাই বালক-বালিকাগণের পক্ষে দোষের ছিল। এমন অবস্থা মুসলমানী শিক্ষার বা গায়ক-বাদক-অভিনেতার চারিত্রিক অপযশের ফলে ঘটেছে কি না ঠিক বলা যায় না। কাজেই শিশুদের জন্য নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভূত হোতে দেখা যেত না। নাটক অভিনীত না হোলে তার সার্থকতা কোথায়? তবুও রবীন্দ্রনাথ 'মুকুট' রচনা করেন এবং ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। মুকুটের সংলাপের সবটুকুর অর্থই যে বালক-বালিকাগণের বোধগম্য হয় এমন কথা বলা না গেলেও, শিশুনাট্য হিসাবে মুকুট উৎকৃষ্ট ও আদর্শস্থানীয়। কিন্তু এই আদর্শ পরবর্তী-কালেও গৃহীত হয় না। তবে শিশুরা গল্পটির মর্মগ্রহণে সক্ষম মনে হয়। সেটাও মস্ত কথা। নাটকের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দদান নয়, শিক্ষাদানও। 'মুকুটে'র বিস্তারিত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বাল্মীকি-রামায়ণ অবলম্বন করে বাংলার শিশুদের জন্য পদ্যে রচনা করেন 'টুকটুকে রামায়ণ'। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, ১৯১০ খৃস্টাব্দে। পরে ১৯১৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে আরও দু'-একখানি শিশুপাঠ্য রামায়ণ রচিত ও প্রকাশিত হোলেও 'টুকটুকে রামায়ণে' বাংলার শিশুচিত্ত মুগ্ধ হয়। গ্রন্থখানি শিশুপাঠ্য এক কাব্যবিশেষ। প্রারম্ভটি এই :

যায় বয়ে সরযূ—কালো কাকের চক্ষুজল।
তায় ভাসে আকাশের ছায়া সুনীল সুবিমল॥

শাদা শাদা পাল তুলে তায় নৌকা সোঁ—সোঁ চলে।
হর্ষে যেন রাজহংস, খেলা করে জলে ॥
নদীর তীরে শ্যামল তরু পাশে সবুজ মাঠ।
বসুমতীর বক্ষে যেন শোভে শোভার হাট ॥
অযোধ্যা নগরী ছিলো এই সরযূর তীরে।
শোভা কি তার! দেখলে পরে নয়ন নাহি ফিরে ॥
বাগান পুকুর অট্টালিকার শোভা বলিহারি।
সুন্দর পথ—পথের পাশে বৃক্ষ সারি সারি ॥
ধর্ম্মশালা, চতুষ্পাঠী, রম্য দেবালয়।
দোকান পসার শোভায় ভরা নানা দ্রব্যময় ॥
ধনধান্যে পূর্ণ পুরী—সবাই থাকে সুখে।
শিল্পী চাষী ব্যবসায়ী হাসি সবার মুখে ॥

১৯১০ খৃস্টাব্দের পর থেকে ১৯১৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে ঢাকা ও কলকাতায় বিভিন্ন লেখকের নানাবিষয়ক অনুবাদ ও মৌলিক রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সকল গ্রন্থের অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য। তখনকার সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনের উপর নামের জন্য নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নেই। এই সকল লেখকের মধ্যে ছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়, বরদাকান্ত মজুমদার, বিনোদিনী দেবী, সত্যচরণ চক্রবর্তী, শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি। দীনেন রায়ের 'ছেলেদের মজার গল্পের বহি' ও 'দানোর দান', রামকমল বিদ্যাভূষণের 'সরল রামায়ণ', দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগীর 'কৌতুক কাহিনী', অবিনাশচন্দ্র গুপ্তের 'মজার বই', শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'রবিনসন ক্রুশো' সেকালে আদৃত হয়, একথা বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায়।

বরদাকান্ত মজুমদার যেমন পত্রিকাদ্বারা তেমনি ক্ষুদ্রায়তন চরিতকথা, উপাখ্যান ও রামায়ণ-মহাভারত রচনা করে শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর 'সতীকথা গ্রন্থাবলী'—ভারতের দুখানি মহাকাব্যোক্ত মহীয়সী নারী-চরিত্রকাহিনী নিয়ে রচিত। বেহুলার উপাখ্যান যেমন তিনি, তেমনি শতদলবাসিনী বিশ্বাসও বালক-বালিকাগণের জন্য রচনা করেন। বিনোদিনী দেবীর 'খুকুরাণীর

ডায়েরী' নামক গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ছাপার পূর্ব্বে পড়িয়াছি ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। ছাপার অক্ষরে পুনরায় পড়িলাম ও প্রীতিলাভ করিলাম।' বরদাকান্তের পূর্বে সম্ভবত 'প্রকৃতি'র কর্তৃপক্ষই ক্ষুদ্রায়তন চরিতকথা রচনা ও প্রকাশ করেন। মনে হয়, এদিকে তাঁরাই পথপ্রদর্শক। তাঁদের 'ভারতগৌরব গ্রন্থাবলী'তে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, অশোক, শিবাজী, রাণা প্রতাপ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, আকবর, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত চরিতকথা লিপিবদ্ধ হয়।

হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সেকালে হাস্যরসাত্মক কবিতায় শিশুপাঠকের আসর মাত করতেন। তাঁর মজাদারী কবিতা পুস্তক 'রঙ্গিলা' প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খৃস্টাব্দে। কিন্তু এখনকার মতো সে সময়ে কিশোরপাঠ্য কোনও মৌলিক উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হয় না। অন্তত আমাদের হাতে আসে নি।

দেখা গেল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই নানা মৌলিক রচনায় শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। তাই বলে বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ বন্ধ হয় না, বরং তা পূর্বের চেয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। তবে সেগুলির অধিকাংশই ভাবানুবাদ। এদিকে কুলদারঞ্জন রায়ের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁর সকল রচনাই বিদেশী ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। তাঁর 'টমকাকার কুটীর', 'ওডিসিউস ও ইলিয়ড', 'ডনকুইকসট' ১৯১৫ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি প্রকাশিত হয়, মনে হয়। এই সময়েই প্রকাশিত হয় প্রিয়ম্বদা দেবীর পিনোক্কিও-র অনুবাদ 'পঞ্চুলাল'ও। আবার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও শিশু-সাহিত্যের আসরে নেমে মনে হয় ঐ সময়েই একে একে 'ঈশপের গল্প' ও 'রবিনসন ক্রুশো' রচনা করেন। তবে এগুলি অনুবাদ নয়। তাঁর 'ভাতের জন্মকথা'ও ছড়ায় রচিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ধানের চাষ থেকে চাউলের রন্ধন পর্যন্ত চমৎকার ছড়ায় তিনি শ্রম ও শস্যের রূপান্তর বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থখানির পূর্বে বালক-বালিকাদের জন্য কোনও ভোগ্য পণ্যের উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে সুন্দর ছড়ায় কেউই গ্রন্থ

রচনা করেছেন, এমন নিদর্শন আমাদের হাতে নেই। এক বা একাধিক মানুষের জীবনধারণের সামগ্রী বহুর অক্লান্ত শ্রমে উৎপন্ন হয়েছে, সে-কারণ তা মূল্যবান, এ কথা এই গ্রন্থে সহজ কথায় বুঝানো হয়েছে। মনে হয় এঁদেরই চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয় অমৃতলাল গুপ্তের 'দ্বীপের কাহিনী'—মাস্টার ম্যানরেডীর অনুবাদ।

এই সময়েই ১৯১৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দুখানি গল্পের বই। একখানির রচয়িতা ছিলেন, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর গ্রন্থের নাম 'হাতে চাঁদ কপালে সূর্য্যি'। অপরখানির নাম ছিল 'আলুপোড়া'। আলুপোড়া রচনা করেন, সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৎসরেই প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপতরীর দেশ' এবং পরবৎসর, ১৯১৬ খৃস্টাব্দে তাঁরই 'নালক'। আর ১৯১৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সুখলতা রাও-র 'আরো গল্প' এবং এর কিছু কাল পরেই তাঁর 'গল্পের বই'। 'আরো গল্পে'র উপজীব্য বিদেশী গল্প। তবে ভাষার সাবলীলতা ও লালিত্যগুণে এবং পাত্র-পাত্রীকে কখনও কখনও দেশীয় করায় গ্রন্থখানি পাঠকমহলে সমাদৃত হয়। 'গল্পের বই'ও তদ্রূপ।

এই সময়ের মধ্যে বাংলার শিশু-সাহিত্যে সৃজনী প্রতিভার দান খুব বেশি না হোলেও, যা হয়েছে তা সার্থক ও শাশ্বত সৃষ্টি। কিন্তু কেবল সুকুমার-সাহিত্য ও চরিতমালাই এ সময়ে রচিত হয় না, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও নূতনের আবির্ভাব হয় জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ-নক্ষত্রে'র দ্বারা। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, ১৯১৫ খৃস্টাব্দে। জগদানন্দবাবুও দক্ষিণারঞ্জনের মতো শিশুপাঠ্য বিজ্ঞান-সাহিত্যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন। তিনি পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পক্ষিবিদ্যা, কীট-পতঙ্গবিদ্যা বিষয়ক নানাগ্রন্থ অতি সহজ ভাষায় রচনা করে নূতন রচনাশৈলী গঠন করেন। কিন্তু ১৯১৮ খৃস্টাব্দের পূর্বে 'গ্রহ-নক্ষত্র'ই বালক-বালিকাদের জন্য তাঁর প্রথম পুস্তক। তিনি যথার্থ বিজ্ঞানীর মতো বস্তুজগৎ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে তার ফল লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর 'গ্রহ-নক্ষত্রে'র পূর্বে শিশু-সাহিত্যে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তকই

ছিল না। তিনিই এই গ্রন্থে তাদের নক্ষত্র চিনবার উপায় প্রদর্শন করেন। তিনি গ্রন্থ ভূমিকায় লিখছেন :

…অল্প বয়সে জ্যোতিষের গল্পে বড়ই আনন্দ পাইতাম। ইচ্ছা হইত, সমবয়স্ক দুই-চারিজন ছেলেকে ডাকিয়া জ্যোতিষের গল্প বলি ‥বাল্যের সেই সাধটি প্রৌঢ় বয়সে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।…

এইরূপ সুমিষ্ট সহজ ভাষার ব্যবহার সমগ্র গ্রন্থেই।

নক্ষত্রদের আলো বাড়ে-কমে কেন ?

…আকাশে মেঘ নাই, অথচ নক্ষত্রদের আলো হঠাৎ কমিয়া গেল, এই রকমটি তোমরা দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় দেখ নাই, কিন্তু প্রাচীনকালের জ্যোতিষীরাও শত শত নক্ষত্রের আলো এই রকমে বাড়িতে কমিতে দেখিয়াছেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যখন-তখন ঐ-রকমে নক্ষত্রদের আলো কমে। কিন্তু তাহা নয়, এক একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাড়া-কমা হয়। কোনও নক্ষত্রে এই পরিবর্তন দেখিবার জন্য সত্তর বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনও কোনওটির পরিবর্তন আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বৎসরেই দেখা যায়।

পারস্যুস রাশিতে 'আলগল্' নামে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল তারা আছে, সেটির আলো প্রায় তিন দিন অন্তর ভয়ানক কমিয়া আসে। তখন তাহাকে একেবারে মিট্ মিট্ করিতে দেখা যায়। অদ্ভুত নয় কি ? আরবদেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই পরিবর্তন দেখিয়া নক্ষত্রটিকে 'দৈত্য তারা' বলিতেন।…

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেকস্পীয়ারের নাটকের গল্পাংশ ল্যামবের গল্প-গ্রন্থ থেকে সংকলন করে একখানি গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু সে-গ্রন্থ ছিল সাধারণ পাঠকের জন্য ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ভ্রান্তিবিলাস'ও

সেই শ্রেণীর। বালক-বালিকাদের পাঠের জন্য উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কেউ শেকস্‌পীয়ারের নাটকের গল্প নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমন কোনও প্রমাণ আমরা পাই না। কিন্তু ১৯১৫ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রামে 'সুদখোর ও সওদাগর' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি এমন অবস্থায় আমাদের হাতে আসে যে, তা থেকে গ্রন্থকারের নামোদ্ধার করা যায় না। কিন্তু ভূমিকাটি পাওয়া যায়। তাতে গ্রন্থকার লিখছেন :

> সুদখোর ও সওদাগর—Merchant of Venice নামক নাটকের Bond story অবলম্বনে বালক-বালিকাদের জন্য এই আখ্যায়িকাটি রচিত হইল।...

গ্রন্থকার গল্পটিতে কিঞ্চিৎ অভিনবত্বও দেখিয়েছেন। তিনি এতে সাম্প্রদায়িক চিত্র অঙ্কিত করেছেন। গল্পটির প্রারম্ভটুকু থেকেই সমগ্র গল্পটি বোঝা যাবে :

> রতন দাস জাতে বেণে, থাকে পত্তন শহরে। ব্যবসাটি তার—সুদখুরী। সুদ খেয়ে খেয়েই লোকটা বেজায় ফেঁপে উঠল।
>
> পত্তন শহরে অনেক মুসলমান সওদাগরের বাস—রতন তাঁদের টাকা ধার দেয়। সুদটাও কিনা বেজায় চড়া, তাতে আবার রেয়াৎ সেয়াৎ নেই—কড়ায় গণ্ডায় আদায়—কাজেই ক্রমে তার টাকা খুব বেড়েই চলতে লাগল।...

এতে আর যাই হোক শেকস্‌পীয়ারের নাটকের চমৎকারিত্ব বিষয়ে বালক-বালিকারা কোনও জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তবুও বালক-বালিকাদের সাহিত্যের আসরে শেকস্‌পীয়ারকে আনার প্রথম প্রচেষ্টা বলে গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য।

এইভাবে দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বাংলার বালক-বালিকাদের জ্ঞান বা আনন্দবৃদ্ধিকল্পে নানাজনে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও সাংবাদিকও ছিলেন, যাঁদের নাম বাংলার সংস্কৃতি-জগতে আজও উজ্জ্বল। এঁদের

মধ্যে কেউ কেউ শিশু-সাহিত্য রচনায়ই জীবনপাত করেছেন। তখন ইংরেজ আমল, দেশ পরাধীন। সে-সম্বন্ধে বালক-বালিকাগণকে সচেতন করার প্রয়াস কিন্তু কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। আর, মাতৃভাষা, স্বদেশী ভাষা শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ জাগানোর চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয় না। তবুও এই সময় থেকে শিশু-সাহিত্যের ধারা পুষ্ট ও বেগবতী হয় এবং ক্রমে নূতন নূতন বিষয়ের যোগে তা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু এই সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মতোই ইংরেজীর আদর্শে রচিত, ইংরেজী থেকেই ভাব, অনেক সময়ে বিষয়ও গ্রহণ করে। তবে এ সাহিত্য ইংরেজ আমলের বাংলার বিরাট জাতীয় সাহিত্যেরই একটি অংশ, যার সমৃদ্ধির ফলে সমগ্র জাতীয় সাহিত্যই লাভবান হয়েছে।

১৯১৮ খৃস্টাব্দের পর থেকে বর্তমানকাল অবধি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে কারণ আমরা এখানেই নিরস্ত হোলাম।

পরিশিষ্ট

১। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র আলোচনা থেকে জানা যায় কামাখ্যাচরণ ঘোষ 'রত্নসার সংগ্রহ' নামে বালক-বালিকা-পাঠ্য একখানি পদ্যগ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশকাল ১৮৫৯ খৃস্টাব্দ। ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকায় জানা যায় গ্রন্থখানির চারিটি সংস্করণ হয়। অন্তত দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২৪ পরগনার হরিনাভি গ্রাম থেকে। গ্রন্থখানি আমাদের হাতে আসে নি।

২। 'কিশোর' দৈনিকের প্রথম প্রকাশকাল ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল। সম্পাদক ছিলেন, বর্তমান গ্রন্থকার, খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পত্রিকাখানি প্রায় ৮ মাস তাঁর সম্পাদনায় পরিচালিত হয়। পরবর্তী চারমাস পত্রিকাখানি বালক-বালিকাপাঠ্য থাকে না। পত্রিকাখানি মাত্র এক বৎসর জীবিত ছিল।

কলিকাতা সংস্করণ

আশুতোষ লাইব্রেরী
ঢাকা, এলাহাবাদ, কলিকাতা

পূরবী পাবলিশার্স লিঃ

১ম বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা] বৃহস্পতিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৩৫৫ — ৬ই মে, ১৯৪৮ [দাম—দু' পয়সা

বিদেশে ভারতীয় | ডাঃ বিধান রায়ই প্রধানমন্ত্রী | সাম্য ও মানবপ্রেম

॥ নির্ঘণ্ট ॥

[লেখক, শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান]

॥ নির্ঘণ্ট ॥

[গ্রন্থ ও পত্রিকাদি]

শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮	সন্দে	সন্দেশ
৭৪	পত্রিপ্রসঙ্গ	পত্রিকা-প্রসঙ্গ
৮৩	সংস্কৃতিগুলি	সদ্বৃত্তিগুলি
১৪০	এসাইক্লোপিডিয়া	এনসাইক্লোপিডিয়া
১৫৬	মাংশাসী	মাংসাশী
১৬১	বিজ্ঞান-গ্রন্থেরই	গ্রন্থেরই